মণি বেগম

শক্তিপদ রাজগুরু

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপরিকল্পনা :
শ্রীপূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ—১৩৬৭

সুসাহিত্যিক

শ্রীবিমল মিত্র

বন্ধুবরেষু

Burke's Speech on Impeachment of Warren Hastings-এর মূল দুই খণ্ড থেকে এই কাহিনীর মোটামুটি তথ্য এবং তত্ত্ব সংগ্রহ করি ; পরে Bolt's Indian History, নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী, বেগমদের ইতিহাস, মহারাজ নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ, এবং বিভিন্ন সংগ্রহ থেকে মূল্যবান কয়েকটি চিঠি, কাগজপত্র দেখে এই উপন্যাস লিখতে প্রবৃত্ত হই। ইতিহাসকে বিকৃত না করে তার তথ্যের উপরই গুরুত্ব দিয়ে চরিত্র চিত্রণ করবার চেষ্টা করেছি--সার্থকতার বিচার পাঠকদের উপরই। কোন চরিত্রের উপর যদি বিন্দুমাত্র কোন কটাক্ষ থাকে তার জন্য ইতিহাসই দায়ী, লেখক এখানে উপলক্ষ্য মাত্র।

এই প্রসঙ্গে নবাব এস্টেট, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মাধব স্মৃতি পাঠাগার এবং আরও যাঁরা তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

মণিবেগম

দূরে অবলখ কে কম্ দীদা মোজুদ্
মগর চশ্‌মে-বুতানে অশক্ আলুদ।

—জেবউন্নিসা

এই লেখকের—

কেউ ফেরে নাই ॥ কাজল গাঁয়ের কাহিনী ॥ মায়াদিগন্ত ॥
বনমাধবী ॥ মনের মানুষ ॥ স্বপ্নময়ী ॥ শালপিয়ালের বন ॥
অমৃতের স্বাদ ॥ পথ বয়ে যায় ॥ অবাক পৃথিবী ॥ দেবাংশী ॥
মেঘে ঢাকা তারা ॥ কুমারী মন ॥

উটের কারোয়া আর ঘোড়ার সারি চলেছে। ধু ধু মাঠ আর ঝুপিঝাপি জঙ্গল, মাঝে মাঝে মাথা তুলে রয়েছে দু-একটা টিবিটাপি পাহাড়। আব-হাওয়া ক্রমশ বদলাচ্ছে। বাতাসে তেতে ওঠা ঝাঁজ, চিনচিনে তাপের জ্বালা নেই, কেমন একটা ঠাণ্ডা আমেজ. আগ্রা জাহানাবাদের মত লু ছোটে না, আঁধি ঝড়ও নামে না আকাশ ছেয়ে। একটা স্নিগ্ধ আমেজ-মাখা এই বাতাস। পাহাড়গুলো ক্রমশ মাথা নামাচ্ছে, ঝুপি বনগুলো বড় হয়ে রূপ নিচ্ছে শাল মহুয়ার জঙ্গলে, স্নিগ্ধ বাতাসে মহুয়ার মিঠে সুবাস। নিঃস্ব গেরুয়া মাটি সবুজ শ্যামল হয়ে উঠেছে; জাহানাবাদ থেকে ওরা আসছে মুর্শিদাবাদের দিকে—ঊষর মরুপ্রান্তর থেকে আসছে শ্যামলিমাপারে বাংলা মুলুকে।

তিন পাহাড় ছাড়িয়ে বাংলায় ঢুকেছে তওফাওয়ালী বিশুবেগের দল।

আকাশে সন্ধ্যার ছায়া। অজানা অচেনা পথ। বেলা থাকতেই আশ্রয় খুঁজে নেয় তারা। সঙ্গে নবাবী ফৌজ মেহমানদলকে তোয়াজ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। খট খট শব্দে তাঁবু পড়ছে প্রান্তরে।

তাঁবুতে মণি বাঁদীর পাত্তা নেই, দিঘির ধারে ঝোপের আড়ালে পাথরের উপর সালোয়ার পাঞ্জাবি রেখে কালো গহিন জলে গলা অবধি ডুবিয়ে কি এক আবেশে মগ্ন হয়ে পড়েছে সে। শান্ত একটি নিবিড় স্পর্শ। সেকেন্দ্রা-জাহানাবাদের চারপাশেও এমন মিঠে জলভরা নীলুফর ফুলে ভর্তি দিঘি দেখেনি। চারিদিকে সবুজ পাতার মাঝে মাথা তুলে আছে বড় বড় লাল পদ্ম, কি যেন মিষ্টি আবেশ বাতাসে। গুন্‌গুন্ করে হাজারো মৌমাছির ঝাঁক উড়ছে। শান্ত নিথর আমবাগানে ডাকছে কলকণ্ঠে পাপিয়া, আরও কত নাম না জানা পাখির দল। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় উন্মুক্ত প্রান্তরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, নীল আকাশ লাল গোলাবী রংএর নেশায় মেতে উঠেছে। এ কোন এক স্বপ্ন দেখা জগৎ!

সব দুঃখ ভুলে যেতে চায় মণি। অতীতের দিনগুলো তবু ভিড় করে আসে মনে। সেকেন্দ্রার কাছে মরুভূমির বালুস্তরের ফাঁকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ছোট বসতি বালকুণ্ডা। মুজ-বাবলা গাছ দু-একটা আছে, আর ছিটকে পড়ে টিকে আছে একটা নিম গাছ। মাকে অস্পষ্ট মনে পড়ে, আবছা একটা মুখ। মনে পড়ে এক একদিন শুধু জল খেয়েই কাটত তাদের, তন্দুরের বাজরার পোড়া রুটিও মিলতো না। কোন কোনদিন কারও বাড়ি থেকে চেয়ে আনতো একমুঠো ভাঙা মকাই, না হয় জই। তাই সিদ্ধ করে মেয়ে আর বুড়ী মা খেত। পেটের জ্বালা থামতো না, দ্বিগুণ বেড়ে উঠতো তার ছোঁয়ায়; অসহ্য সে জ্বালা। সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন বালিয়াড়িতে বসে কাঁদতো সে।

ওর মা একদিন বলেছিল—জাহানাবাদ যাবি? কত রকম খানা। নিত্য নূতন ঘাগরা, পেশোয়াজ।

মায়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মেয়ে, মা চেয়ে থাকতো মেয়ের দিকে—এত রূপ তার! এই বয়সেই না খেতে পেয়েও সে রূপ চাপা থাকেনি। ছাই চাপা আগুনের মত উস্‌কে উঠছে বার বার, চোখের চাহনি তার বালিয়াড়ির হরিণের মত; চলাফেরাতেও তেমনি সাবলীল গতি। ছেঁড়া ঘাঘরা-বেওড়না হয়েও খুবসুরৎ সে। আসমানের তারার মত খুবসুরৎ রোশনীদার। এতরূপ বেফয়দা যাবে না।

জাহানাবাদের বিশুবেগই কিনে নেয় তাকে। কত টাকায় তা জানে না। তবে মনে পড়ে মা তাকে ছেড়ে চলে গেল। দুদিন কেঁদেছিল মণি, দুদিন দুরাত্তির অনবরত। জাহানাবাদে নতুন পোশাক, ভরপেট তন্দুরের রুটি ভাজি সে রোজই পেয়েছে কিন্তু বালকুণ্ডার সেই মুক্ত অবাধ জীবন তার হারিয়ে গেছে। ছুটতে মানা, হাসতে মানা, বুব্বুর কেনা বাঁদী সে। বিশুবেগের মেয়ে বুব্বুর মর্জিমাফিক তাকে চলতে হয়।

পান থেকে চুন খসলেই বিপদ। বুব্বুর হালকা চাবুক তীরবেগে এসে নরম পিঠের উপর পড়ে, কাঁচুলি ভেদ করে ওঠা কালো ছাপ এখনও মুছে যায় নি। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মোছে মুখ বুজে।

—এক-দো-তিন। পেশকার ত্রিতাল।

বিশুবেগ তালিম দিয়ে চলেছে বুব্বু বাঈকে। সেরা তওফাওয়ালী করে তুলবে সে নিজের মেয়েকে। তার খানদানী ঘরের নয়াচিজ সব বিলকুল দিয়ে

যাবে। এককোণে দাঁড়িয়ে থাকে মণি, ঠাণ্ডা পানি, গোলাব সরবৎ, রেশমী রুমাল নিয়ে। নাচের ফাঁকে ফাঁকে পায়ের জং খুলে ফেলতে হবে, হাওয়া দিতে হবে। তুবলচী বোল তুলছে—ধা ধিন্ ধিন্না, না তিন্ তিন্না—ত্রেক্রেটে ধিন্। বুব্বুর নিটোল শরীর নিপুণ গতিতে ঘুরে চলেছে। কার্পেটের উপর পায়ের শব্দ ওঠে না ; জং বাজছে মোটা মিহি সুরে ভিন্ন ভিন্ন তাল লয়ের সঙ্গে, উলসে উঠে ওই মিহিসুরও কোথায় মিলিয়ে যায়। নাচের যেন সংক্রমণ আছে। মণি অনুভব করে কোথায় তার রক্তে যেন আপনা হতেই ওই নেশা লেগে আছে। বালকুণ্ডার বালিয়াড়িতে হরিণের গতিবেগ আর চাহনিতে এই নাচের চেয়ে লাখো গুণ জৌলুস এর আগেই সে দেখেছে, নিজের অজানতেই তা রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে তার ধমনীতে।

সেদিন হঠাৎ কি করে ধরা পড়ে যায়। বাঁদী নাচছে মনিবানের জং পেশোয়াজ পরে তারই তালিমী ফরাসের উপর। ভাবতেও শিউরে ওঠে সে। চাবুকের তীক্ষ্ণ শব্দ অজ্ঞাতেই ভেসে আসে কানে। অনুভব করে মণি বুব্বু নির্দয়ভাবে তাকে মারছে, দাঁড়িয়ে দেখছে বিশুবেগ। বাঁদীর এতবড় দুঃসাহস অমার্জনীয়। খানদানী ঘরের নাচের বোল, চাল, তরকিফ বেহাত হয়ে যেতে কেউ দেবে না ওরা।

অজানা আতঙ্কে যেন বুক কেঁপে ওঠে। পা দুটো থেমে যায়।

এককোণে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে মণিয়া। বুব্বুর তালিমের পর একলাই সে কি খেয়ালবশে ওই সাজবেশ পরে বুব্বুর জংগুলো পায়ে বেঁধে নাচতে শুরু করেছে ; হ্যাঁ, অনুভব করে সেও নাচতে পারে, হালকা শরীর গতিবেগে কেঁপে ওঠে। মনের সব বাধা যেন দূর হয়ে যায়। স্বপ্ন দেখে, বালকুণ্ডার গরীবের ঘরের মেয়ে সে নয় ; হিন্দুস্থানের সেরা তওফাওয়ালীর সঙ্গে তার কোন দিকেই তফাত নেই। রূপ তার আছে, আগুন জ্বালা রূপ। চাহনি তার তীরের মত তীক্ষ্ণ।

হঠাৎ দরজার কাছে চোখ পড়তেই থেমে গেছে মণি। বীণকার ওয়াজিদ আলি। বিশুবেগের তনখাধরানো বীণকার। তরুণ, সবে সারেঙ্গী তবলায় হাত পাকিয়ে বীণ ধরেছে। নাচের তালিম দিতে তার জুড়ি নেই। তার নিখুঁত রাগ-রাগিণীর রূপ নাচিয়ের মনে কোন এক সুন্দর স্বপ্নময় পরিবেশ গড়ে তোলে।

—সাবাস্! ওয়াজিদ উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠে।

চমকে উঠেই থেমে গেল মণি। ওয়াজিদ আলি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। পরনে বাঁদীর পোশাক নেই, সাচ্চা সলমা জরির কাজকরা ঘাঘরা, ফিকে আসমানী র' এর ওড়না, নিটোল পুরুষ্ট দেহের ভাজে ভাজে চেপে বসেছে সাটিনের সালোয়ার। ঘামে কাচুলিটা বসে গেছে বুকের সঙ্গে। মাথায় জরির উষ্ণীষের ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়ছে সোনালী ফিতে জড়ানো দীর্ঘ বেণী, গতিবেগে সুঠাম ছন্দে দুলছে। এক নজরেই কি যেন মালুম হয়েছে ওয়াজিদ, মুগ্ধ আশাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে।

--ওকি! এগিয়ে আসে ওয়াজিদ।

ভয়ে কুঁকড়ে গেছে মণিবেগম। তার চুরি এতদিন পর ধরা পড়ে গেছে। বিশুবেগের প্রতিটি মুদ্রা, তাল, লয়, তরকিফ তার মনে গেঁথে বসেছে। সেও রেওয়াজ করে চলেছিল এতদিন। অকস্মাৎ ধরা পড়ে যেতেই আজ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিশুবেগকে বিশ্বাস নেই, সে মেয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। দরকার বোধ করলে সে মণিয়ার পাখানাকেই খোঁড়া করে দিয়ে জন্মের মত তার তওফাওয়ালী হবার শখ সাধ ঘুচিয়ে দিতেও দ্বিধা করবে না একথা ওয়াজিদ আলিও জানে।

মুখে হাসির আভা ফুটিয়ে তুলে বলে সে—ডরো মৎ।

কেউ জানবে না ওর নাচের তালিমের কথা। গোপনে সে সাধনা করবে নিজেকে বিকশিত করে তোলবার, যেমন করে নিভৃতে সাধনা করে কুঁড়ি নিজেকে ফুলের সৌরভে বিকশিত করে দেবার জন্য আগ্রহে উন্মুখ হয়ে। ওয়াজিদ তালিম দেয় পেশকার, ত্রিতাল, ঝাঁপতালের দুরুহ সাধনায়। ওর হাতে বীণ সজীব হয়ে ওঠে। যোগিয়া, কানাড়ার বিভিন্ন রাগের মূর্ছনায় নিজের মনের গোপন কান্নাকে ফুটিয়ে তোলে মণি নৃত্যের ছন্দে। এ তার ফুল ফোটানরই সাধনা।

পাখির ডাকে চমক ভাঙ্গে।

আবছা হয়ে আসছে আলোর আভা। নীল আকাশে কোথায় ডেকে গেল এক ঝাঁক পাখি কলরব করে; এমনি আবছা নীল পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে মন চায়, পদ্মফুলের বিভোর বাতাসে বার বার কাকে মনে আসে। ওয়াজিদ আলি!…ব্যর্থ দুঃখকালো জীবনে সেই-ই তাকে আলোর পথ

দেখিয়েছে। মনের সব দুঃখ সে উজাড় করে নিশ্চিন্ত হয়েছে ওই তরুণ যুবকের কাছে। একটা মিষ্টি স্বপ্ন, নিজেকে নিঃশেষে উধাও করে দিতে মন চায় আজ।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। পাতলা রেশমী সালোয়ার গায়ে ভিজে গিয়ে চেপে বসেছে। ওড়নাও গাছের আড়ালে। উঠতে গিয়ে হঠাৎ ঘাটের ধারে এক বিদেশীকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

প্রথমে বিদেশীও নজর করেনি। কয়েকজন অনুচর সঙ্গে করে ফিরছে তারা হিরণপুরের হাট থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে। দলের নেতা একজন তরুণ ইংরেজ, কোম্পানির কাজে গো-হাটায় গিয়েছিল, নিজের প্রয়োজনেও। হিরণপুরের হাট পাকুড় এলাকায়। বাংলা বিহারের বহু দুর্গম অঞ্চল থেকে এখানের হাটে আমদানি হয় গরু-বাছুর-বলদ।

বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই হাট, শ' হাজার দরুনে গরু বাছুর কেনা-কাটা হয়। কোম্পানির সৈন্যদের রসদ চাই, কামান টানবার জন্য বয়েলেরও দরকার; প্রয়োজন বোধে ইংল্যাণ্ডেও খাদ্যহিসাবে ওই বস্তুটির যথেষ্ট চাহিদা থাকায় কোম্পানি ঠিকাদার মারফত বহুপরিমাণ বলদও কিনে থাকেন। হাটের বড় খরিদ্দার সেই বিদেশী ঠিকাদাররা। শ দরুনে কেনে তারাই।

তরুণ ঠিকাদার একটু বিব্রত। এতদিন একচেটিয়া ব্যবসা চালিয়ে এসেছিল সে নিজে। বলদ পিছু কোম্পানির কাছ থেকে বারো টাকা হিসাবে দর নিয়েছে, হঠাৎ কোম্পানি কি করে জেনে ফেলেছে এর চেয়েও অনেক কম দামে বলদ পাওয়া যেতে পারে। অন্য ঠিকাদারও জুটে যায়, বাধ্য হয়ে নিজেও দর কমিয়ে তার ঠিকাদারি বজায় রেখেছে। তবে যে পরিমাণ মুনাফা হচ্ছিল, সেটা আর হবে না। একটু বিব্রতই হয়েছে সে। বারো টাকা থেকে সাত টাকা দর নামা বড় সোজা কথা নয়। বেশ মোটা লোকসান।

তাই নিজেই এসেছিল হিরণপুরের হাটে। বিচিত্র হাট! গরু-বাছুর, বলদ-মোষের ভিড়ে ভরে গেছে মাঠটা। কারবার মন্দ করেনি। সেখানকার কাজকর্ম চুকিয়ে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ফিরছে।

নির্জন প্রান্তরের মাঝে সন্ধ্যা নামছে। পথে চোর ঠ্যাঙ্গাড়ের উৎপাত না আছে তা নয়। হঠাৎ প্রান্তরের মাঝে আমবাগানে ফৌজী ছাউনি মনে করে তারাও রাত্রিবাসের জন্য থেমেছে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়।

প্রথমে বিদেশী তরুণ ঠিক বুঝতে পারে নি। চারদিকে ঘন সবুজ পদ্ম-পাতার ভিড়, ফুলগুলো জল থেকে মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে,

তারই মাঝে অন্য একটি জীবন্ত ফুলকে হঠাৎ উঠে আসতে দেখে সেও তাজ্জব বনে গেছে। হিন্দুস্থানে এসে রূপ দেখেছে অনেক, কিন্তু এ যেন ভিন্ন জাতের। মাখনের মত গাঢ় হলুদ রং, চোখের তারায় দিঘির অতল জলের ঘনকালো চাহনি, পিঠে ভেঙে পড়েছে একরাশ আঁধার কালো চুল, নীল অধঃবাস ফুটে কি যেন একটা দীপ্তি বের হচ্ছে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে যুবক—এ যেন জলপরী।

মণি চেয়ে রয়েছে তার দিকে, বলিষ্ঠ সুঠাম চেহারা, চোখের তারা ঘন নীল, সোনালী চুলগুলো বাতাসে এলোমেলো উড়ছে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। বাতাস ভরে উঠেছে মৌমাছির গুঞ্জনে, হঠাৎ হাবশী খোজাকে আসতে দেখে আবার জলেই গা ডুবিয়ে দিল মণি, মুখ ফিরিয়ে চেয়ে থাকে অন্য দিকে। বুকের ভিতর তখনও আলোড়ন চলেছে, ওর বলিষ্ঠ দেহ, ঘন নীল দুচোখের মুগ্ধ চাহনি বার বার মনে পড়ে।

বিদেশী তরুণও সরে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু রহমানের দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

—সেলাম সাব।

হিন্দুস্থানে এসে বিদেশীও শিখেছে কিছু কিছু এদেশী ভাষা। শিখতে হয়েছে। মণি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। ঠিক দেখা যায় না ওদের দুজনকে. কানে আসে রহমানের কথাগুলো।

—নবাবজাদার শাদিতে মুজরো চলবে। জাহানাবাদ থেকে সুবে বাংলার নবাবের ফার্মানে চলেছি আমরা। বাঁদী লেড়কীর ইজ্জতের জিম্মাদারী নবাবী ফৌজের হাতে জনাব।

—ইয়েস। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে তরুণ বিদেশী। নীরবে মাথা নীচু করে সরে গেল ওদিকে। রহমান দাঁড়িয়ে থাকে, নিজের দাপটের গর্বে ফুলে উঠেছে তার বুক। বিদেশী বার বার ভুলতে পারে না এই অপমান। নবাবের উপভোগ্যা এরা, সুবে বাংলার নবাব। আর সে সামান্য একজন কর্মচারী, কোম্পানির বেতনভুক কর্মচারী। সামান্য মুনাফার জন্য তাকে গরু-বলদের কারবার করতে হয়, পথে বিপথে ঘুরছে রাত্রি দিন। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার শখ।

চুপ করে চলে যাচ্ছে বিদেশী মাথা নামিয়ে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল তরুণ। প্রহরীর সঙ্গে কথা বলছে ওই মেয়েটি।

—দূর করে দিলি রহমান। একটু দাঁড়াতেও বললি না বিদেশী মাশুককে, আসনাই করতাম। কি সোনার‌ং‌এর চুল—তেমনি চোখ! চুঃ চুঃ!

বলে ওঠে প্রহরী—রঙ্গ রাখ। বাঈ দারুণ রেগে উঠেছে, এখুনি চল।

হাসছে মেয়েটি, খিল খিল করে লুটিয়ে পড়ছে যেন মাটিতে। গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিক নেই, ভিজে চুল বয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিন্দু বিন্দু জল।

বলে ওঠে মণি—ধ্যাৎ রহমান, তোর না হয় কোন আশা নেই, বিদেশী নাগর তো তোর ধাতের নয়। তার জ্বালা তুই কি বুঝবি আহাম্মুক। কি নাম রে তার? পুছ্ ভাল করলি না?

রহমান বিরক্তি ভরে বলে ওঠে -কে জানে, ওয়ারেন হেষ্টিংস নাকি বললো। কে চেনে ওকে? চল দিকি জোর তলব করেছে বিবি।

থমকে দাঁড়ালো বিদেশী তরুণ। অজানা অপরিচিত একটি নাম তার ওয়ারেন হেষ্টিংস। কে চেনে তাকে! ভাগ্যের হাতছানিতে বেপরোয়া জীবন নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে সাত সমুদ্দুর পারে। তারাজ্বলা রাতের অন্ধকারে দেখতে পায় চলে গেল মেয়েটি, রূপের আগুনে অন্ধকার যেন ভরে উঠেছে।

বাগানে ডাকছে সন্ধ্যার দু-একটা বাসাছাড়া পাখি।

কি লগ্ন, কোন মুহূর্ত কেউ জানে না, মনে হয় অতল ভবিষ্যতের মাঝে কি এক নির্দেশ বয়ে এনেছে একটি মুহূর্ত।

সে রাত্রে আর সেখানে দাঁড়াল না বিদেশীর দল। নির্জন প্রান্তরে বের হয়ে গেল তারা। পিছনে পড়ে রইল ক্ষণিকের দেখা মানসী, নবাবী ফৌজের আলো মাতাল ছাউনি। ওয়ারেন হেষ্টিংস চলেছে রাতের অন্ধকারে। বিতাড়িত, অপমানিত, অপরিচিত একটি নাম। মনে মনে জ্বলছে হেষ্টিংস।

তাবুতে আলো জ্বলছে। কানাতের সারি। লাল সালুর ঝালর দেওয়া তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল মণি, ভিতরে তবলার শব্দ উঠছে। বিশুবেগ মেয়েকে তালিম দিচ্ছে। দশ হাজার টাকার নবাবী আসরের মুজরো। বরাত জোর নাহলে এ আসর কেউ পায় না, রাহা খরচা সব নবাবের। নবাব সহবৎজঙ্গ দরাজদিলের লোক। ভাইপো ইক্রামৎদ্দৌল্লার বিয়েতে বায়না করেছে তার মেয়েকেই। বুন্বুর নাচের এতবড় তারিফদার সমঝওয়ালা আর নেই।

কানাতের বাইরে আবছা অন্ধকারে কি ভাবছে মণি, চোখের সামনে

তখনও জেগে রয়েছে ব্যাকুল বিদেশীর নীল তারার চাহনি, কি যেন নীরব আকুতি ফুটে উঠেছে তাতে। আজ মনে হয় তার জন্য অনেকেই পাগল। হঠাৎ ওয়াজিদ আলিকে দেখে এগিয়ে এল। পরিহাসতরল কণ্ঠে বলে ওঠে,

—নতুন মাশুক জুটেছে আমার। সমঝা?

—বিবি ডাকছে অনেকক্ষণ থেকে। গম্ভীর হয়ে উঠেছে ওয়াজিদ আলি। ওর পরিহাসতরল কণ্ঠে সাড়া দিল না। হাসছে মণি; আজ বিবিকেও যেন ডরায় না সে। বলে ওঠে,

—হিংসে হচ্ছে নাকি তাকে? বড খুবসুরৎ বিদেশী; সোনা-রং চুল, নীল আসমানী চোখের তারা।

কথা বললো না ওয়াজিদ, বীণ হাতে ভিতরে চলে গেল। কি ভেবে মণিও ঢুকলো পিছু পিছু।

একটি মুহূর্ত। তবলা, সারেঙ্গী থেমে গেছে। বুব্বুবাঈও সোমের মাথায় নাচ থামালো। এগিয়ে আসছে বিশুবেগ। গায়ের ওড়না খসে পড়েছে। কুর্তির ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ব্যর্থ কদর্য যৌবনভার, চোখে মুখে শ্বাপদ নিষ্ঠুরতা, কানাতের পাশ থেকে চাবুকটা তুলে নিয়ে সশব্দে বসিয়ে দিল মণির পিঠে। গর্জন করে—কোথায় ছিলি কসবী? সাড়া দেয় না মণি। সদ্য স্নানসারা দেহের নরম মাংসে কেটে বসে গেল চাবুকটা, বিন্দু বিন্দু তাজা রক্ত দেখা দেয়। কাঁদছে মণি, ওয়াজিদের পানে চোখ তুলেই নামাল সে। মুখ নীচু করে ওয়াজিদ বীণের ঘাটে মোচড় মারছে, আর্তনাদ করে ওঠে বীণ, একটি মুহূর্ত! ওয়াজিদ চেয়ে দেখলো তার বেদনাহত মুখের দিকে দরদভরা অসহায় চাহনিতে। বুব্বুবাঈ হেঁকে ওঠে—সরবৎ!

- কোথায় ছিলি বাঁদী এতক্ষণ? জবাব দে।

মণি দাঁত চেপে নীরবে এগিয়ে দিল তার দিকে মোরাদাবাদী মিনাকরা পানপাত্রে গোলাবী সরবৎ। আবার নাচের আসর শুরু হয়।

বার বার মনে পড়ে মণির ব্যাকুল, অসহায়, অপমানিত সেই নীল চোখের চাহনি। ওয়াজিদ মাথা নীচু করে চোখ বুজে সুর তুলছে বীণে, রাগ ললিতের সুর। বাতাসে কান্নার মত কেঁপে ওঠে সুরটা, কাঁদছে মণি অসহায় লাঞ্ছিত কোন নারী। চাবুকের জ্বালা সারা দেহমনে বেদনা এনেছে।

রাত্রি নেমে আসে ছাউনিতে। নীরব নিস্তব্ধ তারাজ্বলা রাত্রি। জেগে আছে প্রহরী, আর কানাতের নীচে একটি বেদনাহত ব্যর্থ নারী।

—ওয়াজিদ !

আবছা অন্ধকার নেমেছে গাছতলায়। দূরে প্রহরীর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ঘোড়াগুলো মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে পা ঠুকছে পাথরে খট্ খট্ শব্দে। বাতাসে ভেসে আসে উটের নিঃশ্বাস নেবার আঁক আঁক্ শব্দ ; কাকে যেন গলা টিপে ধরেছে, দম ফেলতে হাঁসফাঁস করছে সে। দীর্ঘ একটানা শব্দে উটগুলো দম ফেলছে। রাতের বাতাস কি এক আতঙ্কের ছায়ায় ভরে উঠেছে।

মণির কথায় ফিরে চাইল ওয়াজিদ। নীল তারার রোশনী তার বেদনাহত চোখে।

—এ আর সহ্য হয় না বীণকার !

কাঁদছে মণি। তার রূপ-যৌবন-গুণ বৃথাই যাবে ?

—চল, কোথাও পালাই দুজনে। মণি এই নিষ্ঠুর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায়।

—তা হয় না মণি। ওয়াজিদের কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

—কেন ? মণি এগিয়ে আসে ; তারার আলোয় ওর দুচোখে কি নিবিড় আর্তির সন্ধান পায়।

—নবাবী দরবারে তোমার পরিচয় পেশ না করে কোথাও যাওয়া হবে না। তোমার রূপ, গুণ, তালিম কোনটাই না থাকা নয়, বাকি ছিল সমঝদারের। বাংলা মুলুকেও তার অভাব হবে না। এতদিন সহ্য করেছো, আর ক'টা মাত্র দিন সবুর করো মণি। তোমার এ কান্না বৃথা যাবে না।

আজ তার কাছে মনে হয় বৃথা এ আশ্বাস।

ব্যর্থ মণি কাঁদছে, ওয়াজিদের বুকে মুখ ঢেকে কাঁদছে রাতের আঁধারে। চঞ্চল হয়ে ওঠে ওয়াজিদ। মণির নিঃশ্বাসে কি যেন মাদকতা আছে। পতঙ্গের মত আগুনের দিকে অন্ধ মোহে ছুটে যেতে চায় ওর সারা মন।

—মণি ! তার মনের সব বাধা বন্ধ খুলে আসছে। মণি ওর ডাকে অশ্রু-স্নাত চোখ মেলে চাইল। ব্যাকুল দুটো উষ্ণ ওষ্ঠ এগিয়ে আসে ওয়াজিদের পানে। ওর চোখের তারায় রাতের তারার রোশনী। ওয়াজিদ বলে ওঠে,

—তাঁবুতে যাও মণি, কেউ এসে পড়বে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। মণি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; ওয়াজিদও যেন আজ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। চিন্ চিন্ করছে চাবুকের জ্বালা। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল তাঁবুর দিকে।

আবছা অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি অদূরে গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল, চকিতের মধ্যে সরে গেল, সে রহমান। বুলবুবাঈ-এর খাস প্রহরী। অনেক দিন থেকেই কি যেন লক্ষ্য করছে সে দুজনের মাঝে, কি যেন চলেছে।

ওয়াজিদ একাই রাতের অন্ধকারে বসে থাকে। বীণ থেকে হাত নেমে গেছে। কি যেন আকাশ পাতাল ভাবছে সে! মণির কান্নার কথাই বোধ হয়। কাঁদলে যেন ওকে সব থেকে বেশি সুন্দর দেখায়। বুকের কুর্তিতে তখনও চোখের জল লেগে রয়েছে। মণি কাঁদে। ওয়াজিদ অসহায়।

সারা মুর্শিদাবাদে আজ উৎসব। গঙ্গার বুকের অন্ধকার আজ আলোয় আলোয় ভরপুর; শহরের পথ-ঘাট, প্রশস্ত রাজপথ, প্রাসাদমালা রোশনীতে নেয়ে উঠেছে। ব্যারা উৎসবের শোভাযাত্রা চলেছে। মহাসমারোহে জৌলুস বের হয়েছে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ থেকে। হাতীর মাথায় সোনার কল্কা জরির সাজ, হাওদা থেকে ঝুলছে রকমারি ঝুটো মুক্তোর ঝালর; কিংখাবের হাওদার উপর বসেছে সুসজ্জিত সোয়ারীরা; পিছনে চলেছে ঘোড়সওয়ার বাহিনী; লাল ঝকমকে পোশাক, হাতে বর্শা; ঝকমক করছে আলোয়। পিছনে পদাতিকদল। বিদেশী বাদ্যকরের দল জমকালো পোশাক পরে ব্যাণ্ড ব্যাগ-পাইপ কাঁধে চলেছে। গোরার বাজনায় কাঁপছে আকাশ বাতাস। ওদের পদভরে মুর্শিদাবাদ টলমলো। রাস্তার দুপাশের আলোঝলমল প্রাসাদ থেকে খাজা খিজিরের স্মরণে সাজান নিশানের উপর গোলাব-মল্লিকা-কেতকীর পাপড়ি ঝরে পড়ছে। ভাদ্রমাসের পূর্ণস্রোতা গঙ্গায় আলোক সজ্জাময় দোতলা তিনতলা সোলার প্রাসাদ কলার মাঞ্জাসের উপর তুলে ভাসিয়ে দেয়, স্রোতের টানে মুর্শিদাবাদের আলোকমালা পার হয়ে—অতল অন্ধকারে ভেসে যায় সেই আলোকের খেয়া, অতীতের অন্ধকার পারে তারা স্মরণের আলোকবর্তিকা পাঠায় মহাজ্ঞানী ইলিয়াসের উদ্দেশে।

শেঠ পাড়া, ইচ্ছাগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মতিমহাল ঘুরে হাজার দুয়ারীর ঘাটে এসে থামলো শোভাযাত্রা; পথ রুদ্ধ, জন-সমুদ্র আলোয় স্নাত হয়ে ওঠে; আকাশ-কোল বাজী হাউই-এর রং-বাহারে ছেয়ে যায়। চক বাজারের আর্মানী ব্যবসাদার, শেঠবাজারের গদিয়ানরা, ইংরেজ মহল্লার সাহেব-সুবোর দল ভিড় করেছে।

এমনি এক উৎসবমুখর রাত্রে এসে পৌঁছল বিশুবেগের দল মুর্শিদাবাদের চকে। চৌদল থেকে চেয়ে থাকে মণি; ওদিকে বিশুবেগ আর বুব্ব্ বাঈএর চোখে কি যেন স্বপ্নঘোর! উৎসবের শোভাযাত্রায় গঙ্গা বক্ষে হাজারো বজরা সাজান হয়েছে। রকমারি বজরা, হাতীমর্দন, গাড়ামর্দন, হংসমুখী মকরমুখী, ইত্যাদি নানা শ্রেণীর। নাচ গানের হররা চলেছে। গদিনাশীন বেগম, নবাব নাজিরদের প্রধানা মহিষী আজ এই উৎসবের প্রধান হোত্রী। তাঁর বজরায় সমারোহ চলেছে, গঙ্গার বুকে শ্বেতহংসের মত দুলছে তাঁর বজরা, সানাইএর রাগিণী কাঁপতে কাঁপতে স্রোতে উধাও; রাশি রাশি ফুলের মালা জরির চুমকি কল্কা দিয়ে সাজান বজরায় তিনি চলেছেন পুরোভাগে।

মণি বেগম স্তব্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বাঁদী সে। এ দৌলত, সম্পদের ছড়াছড়ি দেখে অবাক হয়ে গেছে। সে যেন স্বপ্ন দেখছে। হ্যাঁ, এখানে এসে ভালই করেছে সে। জীবনের স্রোতে ভাগ্যের গতি হয়তো বদলাতেও পারে। এখানে সবই সম্ভব।

সব তার চোখের সামনে থেকে মুছে গেছে। এই আনন্দ কলরব, বাজনার শব্দ, জনতা—বুব্বুর অত্যাচার। চোখের সামনে ভেসে ওঠে—দূরের ওই হংস-মুখী বজরায় সে যেন বসে আছে, চারিপাশে দাঁড়িয়ে আছে বাঁদীর দল। গোলাব-অগুরুর সৌরভে মেতে উঠেছে বাতাস; লাল কিংখাবের পর্দাঢাকা দরজার ওপাশে খাপখোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে হাবশী খোজা প্রহরী। তাকে ঘিরে উঠছে বীণের মিষ্টি স্বররেশ।

হঠাৎ তার চমক ভাঙলো। শোভাযাত্রা চলে গেছে। কৌতূহলী-জনতার ভিড় পাতলা হয়ে আসে। পথ পরিষ্কার, তাদের তাঞ্জামও চলেছে। এতক্ষণ কি এক বিচিত্র স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল সে! হাসি আসে স্বপ্নের কথা ভেবে। বাঁদী মণি আজ স্বপ্নেও বেগম হবার স্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছে। হাসে ওয়াজিদ—খোয়াব দেখছিলে নাকি?

—হ্যাঁ! বেগম হবার খোয়াব, স্বপ্ন। মণির দুচোখে হাসির আভা।

—স্বপ্ন সত্যিও হতে পারে অনেক সময়। ওয়াজিদ রহস্য করছে।

ওর দিকে চেয়ে থাকে ওয়াজিদ, ভাদ্রের গঙ্গার পূর্ণতা ওর নিটোল দেহে, চোখে শাওনমেঘের কালো বেদনা-ভরা চাহনি।

—হ্যাঁ, তবে দুঃস্বপ্নগুলো! একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে মণির বুক চিরে।

আজব শহর মুর্শিদাবাদ। রঙ্গ রঙ্গিলা দিলচশপী মুর্শিদাবাদ। হুরী পরীর আনাগোনা এর পথে বাগিচায়, হীরা জহরৎ দৌলত এখানে দিনের আলোয় ঝলসায়, সরাবী নেশায় বুঁদ হয়ে রাহী পথ চলে জান-মান সামলে। হিন্দুস্থানের সেরা শহর মুর্শিদাবাদ। দিল্লীর পতন ঘটেছে শাহী ইজ্জত খতম হবার সঙ্গে সঙ্গেই। ভারতবর্ষের সাতমুলুকের দৌলত লুটে শাহী শহর দিল্লী গড়ে উঠেছিল, ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলোই ধ্বসে পড়েছে, টুকরো টুকরো হয়ে শাহী মালা থেকে ফুলদল ঝরে গেছে একে একে। দিল্লী বর্তমানে মরুভূমির বুকে শুকিয়ে আমা বাগিচার গোলাপ গাছ, ফুল ঝরে গেছে, সর্বাঙ্গে ওর মরা কাঁটার জ্বালা। কনৌজ শহর খতম হয়েছে ওর আগেই।

অযোধ্যা, বেনারসও দেখেছে ওয়াজিদ, কিন্তু সেখানে ভোগবিলাসের এমন প্রাচুর্য নেই. দৌলতদারদের জিগির শোনা যায় না, বিদেশী বণিকদের রকমারি সওদা—রং-বেরংএর দিশী বিদেশী সরাবও নেই। পুরানো সেই মালাই সিদ্ধি আর দিশী সরাব সেখানকার আসর জমিয়ে রেখেছে। তওবা! বেনারস শহর তো এসব বিষয়ে বিলকুল বাতিল, থাক না রাজা বলবন্ত সিংএর প্রভূত অর্থ, কিন্তু নবাবী দিল কোথাও নেই তামাম হিন্দুস্থানে। মুর্শিদাবাদ তাই জেঁকে উঠেছে—শহরের এই লাস্যময়ী রূপ মুর্শিদকুলি খাঁও কল্পনা করেন নি।

বাংলার শ্যাম সজীবতার মাঝে মুর্শিদাবাদ, যেন ঘাসের শিষের উপর একটি আলো ঝলমল শিশির বিন্দু। চকবাজারের দুপাশে থরে থরে সাজান দোকান। বোখরার কার্পেট, সামোভার, হাতির দাঁতের তৈরি মুর্শিদাবাদের নানারকম খেলনা; ইতালীর, বেলজিয়ামের তৈরি কাট গ্লাসের নানানতর জিনিস, পলতোলা আলোর ঝাড়, নানা রকম বিদেশী দেশী মূল্যবান সম্ভারে সাজান আনানীর দোকান। দূর সাগর পার থেকে এসে ফলাও কারবার ফেঁদেছে। ওপাশে কিংখাব, সাটিনের পর্দার আড়ালে দেখা যায় রকমারি সরাব; সুন্দরী স্বল্পবাসা বিদেশিনীরা সেখানে বিক্রি বাণিজ্য করছে। মেওয়া-পট্টিতে এসে অবাক হয়ে যায় ওয়াজিদ; ফরক্কাবাদ, আগ্রা শহরের জ্ঞান তার খতম হতে বসেছে।

কাবুল, কান্দাহার, খিলাত থেকে আনা নানা ফল, কিসমিস, আঙ্গুর, খোবানি, আখরোট, আপেল, বেদানা তো আছেই, দিশী ফলের মধ্যে রকমারি আম, আনারসও রয়েছে। মেহেদি রং-করা দাড়ির আড়ালে

পাগড়ি ঢাকা পেশোয়ারী শেখজী বহাল তবিয়তে খুশমেজাজে বেগমমহলের বাঁদীদের সঙ্গে রসিকতা করে সওদা তুলে দিচ্ছে আরবী টাট্টু-টানা গাড়িতে। ওপারে কাপড় পট্টি, সারা ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে আমদানি হচ্ছে রকমারি কাপড়। বেনারসের বিখ্যাত কাতানিকাতের নাম শুনেছিল সে, আজ নিজের চোখে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তৈরি করতে অন্তত চারমাস সময় লাগে, যেমনি জরির নকশা তেমনি ফিল বুনোনি। থরে থরে সেই মহা-মূল্যবান শাড়ি, অন্ধ্রের কলম্‌করি, পাঞ্জাবের সূক্ষ্ম খৈস্‌, হায়দ্রাবাদের মুসলিম-শিল্পের বিখ্যাত অবদান হিমরু, ঢাকাই মসলিন—কোন কিছুই বাদ নেই; দোকানের মাঝে ঝাড় লণ্ঠনের রঙিন আলোর সারিগুলো কি এক মাদকতা আনে।

— ইয়া আল্লা! বাঁদী যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

মণি অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে। তামাম হিন্দুস্থানের সব বিলাস দ্রব্যই হাজির হয়েছে মুর্শিদাবাদে, যেমন সেও ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে নবাবী শহরে—বিলাস ব্যসনের পণ্যহিসাবে।

তেমনি জৌলুস উঠেছে জহুরী পটিতে; চারদিকে তলওয়ারধারী ভীষণা-কার হাবশী পাহারা দিচ্ছে। ঢাকাই কারিগর, বনপাশ কামারপাড়ার নিখুঁত ঢালাইকর; বিষ্ণুপুরের নকশাদার, মোরাদাবাদী মিনাকর সবাই এসেছে এখানে; সোনাগালাইএর তীব্র ধোঁয়ায় বাতাস ঝাঝালো।

মণিবাঈ সাজান দোকানের মধ্যে জ্বলন্ত হীরের তাজগুলোর পানে চেয়ে রয়েছে। পান্নার গায়ে আলো ঠিকরে পড়ছে, যেন লাল রক্তস্রোত বয়ে চলেছে। শুক্তির মধ্যে পড়ে রয়েছে দু'একটা আসল মুক্তা, শুক্তির ভিতর থেকে তুলে এখনও কাজে লাগায় নি তাকে, পাটনাই মটরের মত বড় সাইজ, সাদা নীলে মিশোনো একটা আভা ঠিকরে উঠছে।

—চাই নাকি? হাসে ওয়াজিদ মণির দিকে চেয়ে।

হালকা নীল একটা সুতির ঘাঘরা, পায়ে বুব্বুবাঈএর পুরানো একজোড়া বাতিল শেলিমশাহী নাগরা; সোনার গহনা বড় একটা পরেনি জীবনে, নাড়াচাড়া করেছে বাঈএর গুলোই, কে জানে হীরাজহরৎ বসানো গহনা পরলে কেমন খুবসুরৎ লাগবে তাকে।

—ওই দুধনীল আভা আনা মুক্তোর ঝাপটায় তোকে হুরীর মতই মানাবে।

ওয়াজিদের কথায় তার চমক ভাঙে। ওর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। স্বপ্ন চিরকাল স্বপ্নই থেকে যাবে। বাঈএর বীণকার আর কেনা বাঁদীর এসব শখ কেন ?

প্রাসাদের ফটকে সানাইএ সোহিনীর সুর বাজছে, গঙ্গার জলে সূর্যের শেষ আলো কেঁদে দিনের সন্ধানে উধাও হয়ে গেল। হাজার দুয়ারী, ইমাম-বাড়ার বাগিচায় বসরাই গোলাবের খোসবু জেগে উঠেছে। ওরা দুজনে শহরের বুকচাপা অন্ধকার পরিবেশে ফিরে এল, পিছনে ফেলে এল আলোজ্বলা নবাবী শহর, এখানে গোলামদের আস্তানা। এ রাস্তায় মশালচী আলো হাতে ছুটে বেড়ায় না পথের নিভু নিভু আলো জ্বালিয়ে দিতে; পাল্কি বেহারার চিৎকার, ডাক-হাঁক এদিকে ক্বচিৎ শোনা যায়। ইচ্ছা করেই এই অঞ্চলটাকে এমনি আবছা আলোআঁধার করে রাখা হয়েছে। এ যেন অন্য কোন এক অন্ধ নগর।

হঠাৎ অন্ধকার নিস্তব্ধতা চিড় খেয়ে যায় কার আর্তনাদে। অদূরে দেখতে পায় ওয়াজিদ কারা মুখ বেঁধে কাকে নিয়ে চলেছে, পিছু পিছু ছুটে গেল কয়েকটা ছায়ামূর্তি; অল্প আলোতে ঝকমক্ করে ওঠে কার হাতের তীক্ষ্ণ, ছোরা। শেওলাপড়া দেওয়ালের সঙ্গে দুজনে সেটে লেগে গেছে, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখছে তারা তাজ্জব শহরের রাতের রূপ, নগ্ন পৈশাচিকতা। এত আলো বিলাসের পিছনেই বোধ হয় জমাট বেঁধে থাকে পুঞ্জীভূত কালো বীভৎসতা।

—মণি! ওয়াজিদ চোখের সামনে মৃত্যুর কালো ছায়া দেখতে পায়। অজানা অচেনা শহরের অন্ধকার অতলের বীভৎস নিষ্ঠুরতা তাকে চমকে দিয়েছে।

হিমশীতল হয়ে আসছে মণির হাত পা, কথা কইবার সামর্থ্যটুকুও তার নেই। অদূরে রাস্তায় পড়ে আছে অজানা মৃতদেহটা; রক্তে কালো পাথর ভিজে গেছে। কে হত্যা করে গেল এখুনি, কেন ? এ খবর কেউ জানবে না। বেগমমহলের বাতিল বাঁদীর মোহাব্বতের লোককে কোন নবাবী ফৌজ অন্ধকারে খতম করে গেছে। বিবিমহলের আশেপাশে এই ঘটনা হামেশাই ঘটে।

ওয়াজিদের হাত ধরে কোন রকমে আবছা অন্ধকারে তারা তাদের মহালে এসে পৌঁছলো। দুঃস্বপ্নের মত দুজনের চোখের উপর ভেসে ওঠে রাতের রক্তাক্ত মৃত দেহটা। কানে বাজে কোন নারীর সকরুণ আর্তনাদ, হয়তো ওর বুক থেকে আশুককে ছিনিয়ে এনে হত্যা করেছে।

নিত্য সাজা শহর নতুন করে সেজে উঠছে শাদির জৌলুসে। মীরজাফর এখন সর্বেসর্বা ; বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবী তার হাতে। সারা শহরে সাড়া পড়ে গেছে। আমীর ওমরাহ, চোপদার রিসালদার সবাই ব্যস্ত সমস্ত। জাহানাবাদী বাঈএর নাচ হবে আজ। চবুতারায় নতুন ঝালর উড়ছে ; ইমামবাড়ার প্রাঙ্গণে সাদা মর্মরের মেঝেতে আসর বসেছে ; দেওয়ালে দামী সেজগিরির আলো গঙ্গার জোলো বাতাসে কাঁপছে। সোনালী পাতে মোড়া চারদিকের দেওয়ালে বেলজিয়ান আয়না বসানো। তওফাওয়ালীর সাজ, যৌবনের কোন টুকরোই বাদ পড়বে না মৌজী দর্শকদের চোখের সামনে থেকে।

ওয়াজিদ আজ সেজেছে। জরির ওয়াশকিট, কুর্তির হাতে সাচ্চা জরির কাজ করা কল্‌কা, কিস্তী টুপিতে মসলিনের কাজ। গিলেদার কুর্তি আলিগড়ি সালোয়ারে আজ তাকে ওস্তাদের মতই মানিয়েছে। ওপাশে বুব্বু কুনিশ করে দাঁড়াল। হল ভর্তি সম্ভ্রান্ত দেশী বিদেশী দর্শকের ভিড়। একটা চাপা গুঞ্জরণ ওঠে। সমস্ত আওয়াজই চাপা পড়ে যায় ওর পায়েলের সুরে ; বীণকার সুর তুলেছে। তবলায় জবাব দিচ্ছে, নিপুণ গতিতে বুব্বু বাঈ তোড় দিয়ে আবার জবাব রাখছে ; সঙ্গে টুকরো পেশ করছে।

—সাবাস !

গোঁফ চুমরিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসে ওমরাহের দল ; কেউ বা ওর উড়ন্ত ঘাঘরার দিকে চেয়ে থাকে লোলুপ দৃষ্টিতে, ফুটে উঠছে দেহের নিটোল ভাঁজ।

বিশুবেগ মেয়ের দিকে তারিফ-ভরা চাহনিতে চেয়ে রয়েছে। সে মুর্শিদাবাদের মন জয় করতে পেরেছে। নবাব নিজে প্রথম ইনাম দেন। তার পরই মোহর, আশরফি, জহরৎ উপঢৌকন আসছে দর্শকদের হাততালির মধ্যে থেকে। সালমা-সিতারা জরির সাজ বসানো পেশোয়াজের গতিবেগ থামলো ; একখানি বিদ্যুৎ যেন মেঘকে ঘিরে পরিক্রমা শেষ করেছে।

—সরবৎ !

বিশুবেগ হেঁকে ওঠে। বুব্বু ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে, ভাপসা গরমে ঘেমে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ।

মণি আজ গরহাজির ; অন্য বাঁদী সরবৎ নিয়ে এল। বিশুবেগ, বুব্বু বাঈ একটু অবাক হয়ে ওঠে। এত সম্মান কুড়িয়েছে মা মেয়েতে, সেই আনন্দে তারা সামান্য বাঁদীর গরহাজিরাটাকে আজ গোস্তাকী বলে ধরতেও চায় না। বেকসুর মাপ করে।

বীণকার মাথা নুইয়ে তসলিম জানিয়ে বলে ওঠে—তুসা কিসিমকা নাচ পেশ কিয়া জায়েগা। ফরমাইয়ে?

দর্শকদের দিকে মাথা নীচু করে অনুমতি চাইল সে। বুব্বু অবাক হয়ে গেছে। অন্য কোন অনুষ্ঠানের কথা ছিল না, এতক্ষণ পরিশ্রমের পর আর নড়বার সামর্থ্যও তার নেই, এই আসরে এ কি করে বসলো বীণকার! বিশুবেগ ওর দিকে চাইল। দর্শকরা মেতে উঠেছে নাচের নেশায়, আরও চায় তারা; অর্ধনগ্ন যৌবন উপচার তারা উপভোগ করতে চায়, গোলাবী সরাবের নেশায় মৌজ হয়ে নবাবজাদা হুকুম দেন,

—জরুর।

—বেশথ! তারিফ করে সিরাজী মাতাল ওমরাহদল। তাদের চোখে মনে নেশার গুলাবী আমেজ।

ওয়াজিদের কথামত রাশি রাশি আবীরের উপর সাদা রেশমী আস্তরণ পেতে দেওয়া হল। মীরজাফর অবাক হয়ে গেছে। এ যেন অতীতের কোন স্মৃতিভারাক্রান্ত দিন, সেদিনের সঙ্গী ছিলেন তরুণ সিপাহশালার মীরজাফর। চঞ্চল কিশোর রক্তে এমনি এক মাতন এনেছিল। মালবকৌশিক রাগে আলাপ চলেছে বীণে, ঝাঁপ-তালের বোল উঠেছে তবলায়, নিখুঁত সেই অতীতের ছবি।

বিশুবেগ, বুব্বুবাঈ সকলেই অবাক হয়ে গেছে। এ যেন তারা বিশ্বাসই করতে পারে না! নাচের আসরে এসেছে আজ পেশোয়াজ ওড়না, সলমার কাজকরা কুর্তি পরা বাঁদী মণি! যেমনি চটুল তার ভঙ্গী, তেমনি সাবলীল তার গতিবেগ। কালো ডাগর চোখের তারায় বালকুণ্ডার মরুপ্রান্তরের পথহারা হরিণীর নীরব আকুতি; উড়ছে ওড়না দোপাট্টা। মণি বাঁদী নাচ পেশ করছে। নিখুঁত নিপুণ ছন্দে লাস্যে। বুব্বুও অবাক হয়ে গেছে। উল্লাসধ্বনি ওঠে মেহমানদের মধ্য থেকে। জলদে চলেছে নাচ। পায়ের পাতা দেখা যায় না। ত্রিতালের জলদে। শুধু জংএর সূক্ষ্ম একটা নিক্কণের তান সৌরভের মত বাতাস ভরিয়ে দেয়। ফুলের কুঁড়ি একটা কে জোরে ঘুরিয়ে চলেছে। এ কোন ওয়াজিদ; নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে আলাপে; নাচ থামতেই বিস্মিত দর্শকরা অবাক হয়ে যায়, সাদা রেশমের আস্তরণ ভেদ করে নীচেকার আবীরগুলো ফুটে উঠেছে একটি শতদল বিকশিত পদ্মের আকারে। হাঁফাচ্ছে একপাশে দাঁড়িয়ে মণি; সুগৌর রং টকটকে

সিন্দুর রাঙা হয়ে উঠেছে, ঘামে ভিজে গেছে মসলিনের কাঁচুলি; দুহাত দুইয়ে সমবেত ওমরাহদের কুর্নিশ করছে।

—শোভনাল্লা!

অস্ফুট বিস্ময়ে আর্তনাদ করে ওঠে মীরজাফর।

মাথা নীচু করে বাঁদী দর্শকদিকে কুর্নিশ করে চলেছে। ওপাশে চোখ পড়তে দেখে বিশুবেগ আর বুব্বু বেগম চলে গেছে আসর ছেড়ে; কি এক ভয়ে চমকে ওঠে সে।

নাচের পর আবছা অন্ধকার দখলম দিয়ে ফিরে চলেছে মণি; ভাবছে বিশুবেগ আর বুব্বু এই অপমান নীরবে সহ্য করবে না। ওয়াজিদকেও এর জন্য ফলভোগ করতে হবে। হঠাৎ কার ডাকে চমকে উঠলো। বজ্র কঠিন কণ্ঠস্বর।

—খাড়া রও। দখলমে ওই গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

জুতোর শব্দ এগিয়ে আসছে। অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠে মণি; কাল রাত্রের সেই রক্তাক্ত মৃতদেহটার কথা মনে পড়ে, কে জানে কোন অশুভ দূত তার সামনে আসছে। হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসে তার, সামনেই মীরজাফর আলি খাঁ! স্তব্ধ সন্ধানী দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে অন্তর কাঁপানো দৃষ্টিতে। এক মুহূর্ত, চোখে চোখ রেখেই মাথা নীচু করলো মণি।

—তুমি ফৈজী! কণ্ঠস্বরে মনে হয় অন্তরে ঝড় উঠেছে তার।

ভীরু প্রকম্প কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে মণি—গোস্তাকী মাপ হয় জনাব, আমি মণি বাঁদী। ফৈজীকে আমি চিনি না।

—খামোশ! গর্জন করে ওঠে জাফর আলি খাঁ, সুবে বাংলার নবাব। মনে পড়ে অতীতের কথা, এ যেন তারই অপমান। সেদিন ফৈজীকে পায় নি সে। ফৈজীর বিদেহী আত্মা আজ অকস্মাৎ হয়ত আবার তার পথেই ফিরে এসেছে ভিন্নরূপে। সেই রূপের প্লাবন আর দক্ষতা নিয়ে।

চমকে ওঠে মণি, মীরজাফর আলি খাঁয়ের হাত দুটো তার কাঁধে এসে পড়েছে, নির্বাক নিষ্কম্প চাহনিতে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন দেখছে মীরজাফর, আকাশে কাঁপছে নীলতারা; একটি মুহূর্ত, সমস্ত পৃথিবী যেন গতিবেগ হারিয়ে ফেলে অসীম স্তব্ধতায় ডুবে গেছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল জানে না মণি; হঠাৎ কার ডাকে খেয়াল হল। সে যেন এতক্ষণ নিবিড় এক স্বপ্নে মগ্ন ছিল; ওয়াজিদ আলি তাকে কুর্নিশ করছে।

মীরজাফর আলি খাঁ কখন চলে গেছে মনে পড়ে না, এতবড় সৌভাগ্যে আজ বাঁদী বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। কে জানে—ফৈজী কে। হয়তো তার সঙ্গে কোথাও একটু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছে জাফর আলি, তাই হয়তো এই স্বপ্নবিলাস।

—বীণকার! মণির ডাকে এগিয়ে এল ওয়াজিদ।

—ফরমাইয়ে মণিবেগম। হাসছে ওয়াজিদ।

বেগম! চমকে ওঠে মণি। না-না, এ কি স্বপ্ন দেখছে সে? বীণকারের কি এক বিশ্রী রসিকতা। কথা আর বলা হোল না, এগিয়ে গেল মণি; নিস্তব্ধ অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আছে বীণকার। তার রাগিণীর জন্ম সফল হোক, এ কামনা সে চিরকালই করবে—যে কোন দামই তার জন্য দিতে সে প্রস্তুত।

স্বপ্নঘোরে প্রাসাদে ফিরে গেল মীরজাফর আলি খাঁ। অতীতের সেই স্মৃতিকাতর দিনগুলো, বিচিত্র সেই প্রথম অব্যক্ত প্রেমের অনুভূতি আজ তার সারা মনে ব্যাকুলতা আনে। আনে হারানো যৌবনস্বপ্নের তীব্র আকুতি।

ফৈজীকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদে তখন সাড়া পড়ে গেছে আমীর ওমরাহ মহলে। মীরজাফরও তাদের একজন, কিন্তু সিরাজের প্রতিপত্তির কাছে তারা সবাই ম্লান। ফৈজীকে প্রেমনিবেদন করেছিল মীরজাফর, কিন্তু সফল সে হয় নি।

মীরজাফরের সমস্ত কামনা ব্যর্থ হোল, প্রথম প্রেমের কোরক ধুলোয় মিশিয়ে গেল। সিরাজ নর্তকী ফৈজীকে নিয়ে গিয়ে তুলল হীরাঝিলের প্রমোদ প্রাসাদে।

তন্বী, সুন্দরী ফৈজী। ওজন মাত্র বাইশ সের; মুক্তাভস্ম মেশান তাম্বুলের গাঢ় লালিমা তার কণ্ঠদেশের নীল স্বচ্ছতা ভেদ করে গোলাবী আভা আনতো, পায়ের ছন্দে ছন্দে ফুটে উঠতো রক্ত কমল, চোখের চাউনিতে বিকশিত হতো কত হৃদয় শতদল। মীরজাফর সেই ফৈজীকে প্রথম নিবেদন করেছিল তার ভীরু প্রেম। সিরাজ সে স্বপ্ন ব্যর্থ করে দিয়েছিল নিঃশেষে।

ফৈজী বাঁচেনি। তার প্রথম প্রেমের জন্ম দিয়েই ফৈজীকে বন্দী হতে হয়েছিল হীরাঝিলে। ক্ষুব্ধ ফৈজীর তওফাওয়ালীর আদিম রক্ত সে বাঁধন মানে নি। সিরাজের কামনার সহচরী হতে সে নারাজ। বন্য কুরঙ্গী বাঁধন মানে না। একদিন সিরাজ আবিষ্কার করল তার নৈশ অভিসার। নিজের

ভগ্নীপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁয়ের সঙ্গে একটা অবৈধ যোগাযোগ তার আছে। তরুণ নবাব সেদিন উন্মাদ হয়ে ওঠে।

জানিয়ে দিয়েছিল ফৈজী—তওফাওয়ালীর এই পেশা। এক মন, এক দিল নিয়ে ঘর করতে তাদের মানা।

উন্মত্ত সিরাজ এর জবাব দিয়েছিল—এমন দিলের নিশানা আর কেউ কোন দিনই পাবে না ফৈজী। সেই ব্যবস্থাই আমি করবো।

সত্যই কেউ পায় নি। তারপর থেকে ফৈজীর সন্ধান কেউ পায় নি। শোনা যায় হীরাঝিলের কোন কক্ষের ভিতর পুরে তার সব জানালা দরজা গেঁথে তোলা হয়েছিল। বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠে ফৈজী মরে গেছে। সে আজ অনেক দিনের কথা।

কিন্তু ফৈজীর আত্মা অমর, সে চিরযৌবনা; তার আত্মাই আজ ফিরে এসেছে মীরজাফরের সামনে অফুরান জীবনের অমৃত সঞ্চয় নিয়ে—কি এক অপূর্ব পাওয়ার অসীম তৃপ্তিতে মন ভরে দিতে এই তওফাওয়ালীর বেশে।

সোনার পাতমোড়া খিলানের গায়ে গায়ে রূপোলী টবে মল্লিকা লতায় ফুল ফুটেছে, প্রকম্প সেজের আলোয় স্বপ্নময় সবুজের বুকে শ্বেতশুভ্র ফুলের হাসি। মীরজাফর আলি খাঁ কি যেন ভাবছে।

চন্দন ধূপে সৌরভময় হয়েছে ঘরখানা, জানলা দিয়ে গঙ্গার দক্ষিণ সীমাপারে হীরাঝিলের আমবাগান দেখা যায়। সবুজের গাঢ় আবরণ অন্ধকারে সূচীভেদ্য হয়ে ওঠে। বাতাসে ভেসে আসে সানাইএর সুর, বাগানের পাখিগুলো ডেকে ওঠে একসঙ্গে। আজ নতুন সাজে সেজেছে মণি, জাফর আলি খাঁর মনোমত করে। বাঁদী হয়ে প্রথম সেদিন চকবাজারে গিয়েছিল শুধু দেখতে। আজ সেই শেঠ বুলাকীপ্রসাদের দোকান থেকে তার জন্য এসেছে বেনারসের সলমা সিতারার কাজ করা হাজার টাকার কাতানিকাত শাড়ি। নিটোল গা থেকে কেবল খসে পড়ে। উদগ্র যৌবনকে পিষ্ট করবার বেদনায় শিউরে ওঠে শাড়িখানা; ও পাশে সোনার দাঁড়ে পোষা ময়না সুর তুলেছে। হঠাৎ সামনে কাকে দেখে চমকে ওঠে মণি।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে আগেকার দিনগুলো। জাহানাবাদের চাবুক-খাওয়া কত দিন রাত্রি, একখানা পোড়া তন্দুরের রুটির জন্য ওই শয়তান

রহমান পেশোয়ারীর বুকের নিবিড় কম্পনে বদ্ধ হতে হয়েছে। ওই আবার না পাওয়ার ব্যর্থতায় কঠিন চাবুকের আঘাতে ফালা ফালা করে দিয়েছে তার নরম গা, বুক পিঠ। সেই শয়তান রহমান আবার এসে হাজির হয়েছে আদিম লালসা নিয়ে এই সব-পাওয়ার স্বপ্নভরা দিনেও। ভাবী বেগমের কায়দা-কানুন, আদবগুলোও রপ্ত করতে পারেনি মণি; হাঁক পাড়লে আজ যে তার চারপাশে হাবশী খোজা প্রহরীর দল ছুটে আসবে এ কল্পনাও তার হয় না। দস্যুর মত এগিয়ে আসছে রহমৎ। কোণের ঝাড়বাতিগুলোকে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল, মণি দর্শকের মত ওর কাণ্ডকারখানা দেখছে। ভয়ে কাঠ হ'য়ে উঠেছে মণি। হাসছে রহমান! কুৎসিত মুখখানায় শয়তানীর ছাপ পরিস্ফুট।

—রহমান! বাধা দেবার চেষ্টা করে মণি।

উন্মত্ত পিশাচ এগিয়ে আসছে মৃত্যুদূতের মত নিশ্চুপ লালসাভরা চাহনিতে। ওকে জড়িয়ে ধরে পিষে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায় সে। বিশুবেগ আজ লেলিয়ে দিয়েছে তাকে। এতদিন যে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল রহমান, বিশুবেগই সেই সুযোগ তাকে দিয়েছে। আলো আঁধারির মাঝে বীভৎস চাহনিতে এগিয়ে আসছে সে—ফুটন্ত পদ্মের সজীবতা-মাখা মণির দিকে। হাতের কাছে একটা জয়পুরী ফুলদানি তুলে নিয়েই সজোরে ওর দিকে ছুঁড়ে দেয় মণি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মেজেতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল সেটা, আতঙ্কে ময়না পাখিটাও আর্তনাদ করছে; কোথায় যেন ঝড়ের গর্জন ভেসে ওঠে। শয়তান ধরে ফেলেছে মণিকে, প্রবল বেগে টেনে আনতে চায় তাকে। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে মণি; হঠাৎ দরজার কাছে কার দীর্ঘছায়া দেখা যায়।

এগিয়ে আসছে জাফর আলি খাঁ। পিছু পিছু ছুটে আসছে বিশুবেগ, বাঁদীর আসল পরিচয়ের সাবুদটা হাতে নাতে ধরিয়ে দেবে, কিন্তু হলো না। মণির চিৎকারে এগিয়ে যায় ওর দিকে জাফর আলি খাঁ, দুজন প্রহরী এগিয়ে এসে বন্দী করলো রহমানকে। চিৎকার করে ওঠে বিশুবেগ,

—বেইমান, বেসরমী কসবী। তোবা! তোবা!

—জনাব! মণি কি যেন বলতে গিয়ে পারলো না।

জাফর আলি খাঁ ওর মূর্চ্ছিত দেহটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ডিভানের উপর শুইয়ে বিশুবেগকেই ফরমাইস করে—ঠাণ্ডা পানি। জলদি।

ঘরে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে।

ময়নাটা তখনও চিৎকার করছে– শয়তান বেয়াদপ।

ফুলদানির ফুলগুলো ছিটিয়ে পড়েছে ঘরময়; কোথায় যেন মণির বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলেছে—এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে জাফর খাঁর কাছে। কি যেন ভাবছে জাফর খাঁ।

মণি একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল। একটা কালো দৈত্য তাকে আসমানে তুলে নিয়ে চলেছে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসে। সামনেই জাফর আলি খাঁ, বাতাস করছে বুব্বু বাঈ, বিশুবেগ দুজনেই।

বিশুবেগের দিকে চেয়ে থাকে মণি; বারবার ভুলতে পারে না মণি সেই শয়তানের শ্বাপদ লালসা-ভরা দুটো চোখ!

—কোথাও আঘাত লাগে নি তো?

বিশুবেগ দরদ-ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে। জবাব দিল না মণি।

দুঃসহ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলো। জাফর আলি খাঁ একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে মণির দিকে। ওদের দুজনের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা সংঘাত আছে এটাও বুঝতে পারে। এখানে মণিকে রাখা নিরাপদ নয়। বলে ওঠে জাফর আলি খাঁ,

—তাঞ্জাম আসবে, তুমি তৈয়ার থেকো মণি। হারেমে যেতে হবে তোমাকে।

—হারেমে!

বিশুবেগ, বুব্বু দুজনের মুখ চোখ সাদা বিবর্ণ হয়ে যায়। যেখানে নিজের মেয়েকে পাঠাবার স্বপ্ন দেখেছিল বিশুবেগ সেখানে সেই গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তারই বাঁদী। এত চেষ্টা করেও সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

মণি বলে ওঠে—একা ওই অপরিচিত ঠাঁইএ যেতে ভয় লাগে জনাব। যদি ওই বুব্বুকে আমার সঙ্গে থাকবার অনুমতি দেন!

মাথা নীচু করে অভিবাদন করলো মণি। বিস্ময়ে চমকে ওঠে মা, মেয়ে দুজনেই। বেগম মহালে মণি যাবে বেগম হয়ে, বুব্বু হবে তার বাঁদী! কিন্তু এ কথার প্রতিবাদ করবার সাহস তাদের নেই, প্রতিবাদ করা মানেই ওই রহমান পেশোয়ারীর মত গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দেওয়া। মাথা নীচু করে একটু ভেবে জবাব দেয় জাফর আলি খাঁ—মঞ্জুর।

বিশুবেগের মুখে এক পোঁচ কালি কে যেন বুলিয়ে দিয়েছে।

সেলিমশাহী নাগরার শব্দ তুলে জাফর আলি খাঁ নেমে গেল। আবছা আলো

ঢাকা ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ বিশুবেগ, বুব্বুবাঈ, সামনে মণিবেগম। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মণি, বুব্বুর মাথা নীচু হয়ে আসে অসহ্য অপমানে। মণির সর্বাঙ্গে ওর হাতের চাবুকের কালো দাগ এখনও মিলোয় নি, বাঁদীকে শায়েস্তা করবার রীতিটা সে বুব্বুর কাছে থেকেই শিখেছে।

—যাও, তৈয়ার থেকো বুব্বু! তোমার চাবুকটা আমাকে দিও, একটা চাবুকের দরকার হতে পারে।

এ যেন নতুন মণি তাকে হুকুম করছে। মণিবেগমের কণ্ঠস্বরও বদলে গেছে। বুব্বু মাথা নীচু করে শুনলো কথাটা। বিশুবেগ কথা বলবার সামর্থ্যটুকুও হারিয়ে ফেলেছে আজ।

একফালি চাঁদের আলো জাফরির ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে ছাদের উপর। চারদিকে তামার পাত্রে সাজান পাতাবাহার মল্লিকা বেল জুঁইএর সবুজ ঝাড়, ছাদ থেকে দূরে গঙ্গার রূপালী জলধারা নির্জন দিগন্ত সীমার পানে কিসের সন্ধানে বয়ে চলেছে। কোথায় ডাকছে রাতজাগা পাখি, আবার সব নীরব। ঘুমন্ত পুরীর মাঝে জেগে আছে বীণকার আর তার বীণ। বেহাগ বাজাচ্ছে সে। নিশীথরাত্রের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ঝরে পড়ে সুরের মূর্চ্ছনায়, ধৈবত থেকে রেখাবের অব্যক্ত সুরে রাতের পথহারা পাখির ক্লান্ত পাখার বিধুননের সুর।

হঠাৎ কাকে এসে দাঁড়াতে দেখে চোখ খুললো ওয়াজিদ আলি।

—সেলাম কর বেয়াদপ। সামনে তোমার সুবে বাংলার বেগম মণিবাঈ!

মণিকে আসতে দেখে থামল ওয়াজিদ। ওর জ্যোৎস্নামাখা কোমল মুখের দিকে চেয়ে থাকে ওয়াজিদ, অপরূপ সুন্দরী সে। মানুষের এত রূপ ভালো নয়। নিজে জলে পুড়ে মরে সেই আগুনে, চারপাশে যারাই আসে তারাও জলে ছাই হয়ে যায়। সর্বনাশা এ রূপ। পৃথিবীর পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস, বেদনা রূপ ধরে মানুষের জগতে আসে এমনি করেই।

—বেগম মহালে যাচ্ছি বীণকার। মণিই ওকে শোনাল সংবাদটা।

হাসে ওয়াজিদ—এ আমি আগে থেকেই জানতাম। রাজমহলের পথের সেই ছাউনিতে রাতের তারায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি দেখেছিলাম মণিবেগম।

তোমার পায়জারের নীচে তামাম বাংলা বিহার উড়িষ্যার মসনদ এসে লুটিয়ে পড়বে।

এগিয়ে আসে মণি; নিস্তব্ধ রাতের জেগে-থাকা চাঁদের একফালি আলো পড়েছে ওয়াজিদের মুখের উপর। ওকে আজও যেন চিনেও চিনতে পারেনি মণি। নিঃশেষে একটা মানুষ কোন স্বার্থে একজনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে? কোথায় একটা না পাওয়ার আশা যেন ওর মনের গোপনেই রয়ে গেছে।

—কি চাও তুমি ওয়াজিদ? মণি ব্যাকুল চাহনিতে চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

—কিছুই না। নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয় ওয়াজিদ; তারে মৃদু আঘাত করে স্বর তুলছে।

—কিছুই চাও না? অবাক হয়ে যায় মণিবেগম। মনের অতলে এতদিন একটা মধুর স্বপ্ন তার ছিল, একজনও অন্তত নিঃস্বার্থভাবে তাকে ভালবাসে, নিছক দয়াই করে না। হাসে ওয়াজিদ,

—যা চাই আজ তা মুখ ফুটে বলাও যায় না মণি! কি যেন ভাবছে ওয়াজিদ; একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে—ফৈজীর কথা মনে পড়ে? আজ তুমি নীল আকাশের তারা, দূরের লোক—দূরেই থাকা ভালো।

মণির মন আজ খুশিতে ভরপুর। জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া তার পূরণ হয়েছে। কিন্তু কোথায় মনে যে এমনি একটা অসীম শূন্যতা ছিল ভাবেনি সে। আজ নীরব হাহাকারে চাঁদনী রাত ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। এর চেয়ে জাহানাবাদের দিনগুলোই যেন সুখের ছিল, একটি স্বপ্ন মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

অবাক হয়ে যায় ওয়াজিদ—কাঁদছো মণিবেগম!

হু হু কান্নায় ভেসে যায় দুচোখ, সুর্মার কালো আভা মুছে যায় ওর চোখের জলে। এগিয়ে আসে ওয়াজিদ।

—ফির মুঝে দি দায়ে তর ইয়াদ আয়া।
দিল জিগর তিশ্‌না এ ফরিয়াদ আয়া॥

অজ্ঞাতেই অন্তর আজ আকুতি জানিয়েছে—কোথায় তার চিরজাগ্রত নিবিড় ব্যথা; মন বলেছে সে ব্যথার জ্বালার আগুন নিভবে একমাত্র চোখের জলে; মণিবেগম তাই-ই বোধ হয় আজ কাঁদে; চিরন্তন সত্য, স্বাভাবিক এ

ক্রন্দন, এর থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। ওয়াজিদের সঙ্গে আজ কোথায় আসমান-জমিন পার্থক্য রচিত হয়ে গেছে তার।

ওয়াজিদও জানে।

মুখ নীচু করে বীণের তারে সেই কান্নার স্বর তোলে ওয়াজিদ। কান্না থামাবার বৃথা চেষ্টা করতে সে নারাজ।

রূপালী জলস্রোত অসীম স্তব্ধতার বুকে নিরন্তর বয়ে চলেছে, দূরদিগন্তে বনসীমা ঘেরা সুপ্তিমগ্ন জগৎ কান্নার দীর্ঘশ্বাসভরা হতাশায় নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে আছে মুখ বুজে। মণিবেগম নীরবে কাঁদছে হারানোর দুঃখে।

ওয়াজিদ সেই দুর্বলতার একমাত্র সাক্ষী।

মুর্শিদাবাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেশ অনেকখানি সীমা জুড়েই। ইংরেজদের লণ্ডনের পাশাপাশি বলা যেতে পারে তাকে মান-ইজ্জৎ-দৌলৎ এবং পরিমাপের তুলনায়। জিয়াগঞ্জ, ওপারে আজিমগঞ্জ থেকে শুরু করে বর্তমান বহরমপুর শহরের সীমা অবধি বিস্তৃত। জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ শেঠদের মোকাম—গদি, গুদাম, তারপরই নশীপুর, ইচ্ছাগঞ্জ, শেঠদের কাঠগোলার বাগানবাড়ি, গঙ্গার পূর্ব তীর ধরে আদি মুর্শিদাবাদ ক্রমশ দক্ষিণের দিকে নেমে এসেছে। খাস মুর্শিদাবাদ চকের পরই মতিমসজিদ এলাকা, তারপরই জলাভূমি। গঙ্গার জলধারা পূর্বে এই খাতেই প্রবাহিত হতো, এখন মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে জায়গাটা বিলে পরিণত হয়েছে, এর একটু দূরেই কুঞ্জঘাটা, কাশিমবাজার। মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ সীমান্তে ইংরেজের কুঠি এবং কেল্লা। দৈর্ঘ্যে প্রায় বারো মাইল, প্রস্থে খুব বেশি না হলে ঠাঁই ঠাঁই মাইল তিনেক অবধি বিস্তৃত। মুর্শিদাবাদের পূর্ব সীমান্তে গঙ্গার মরা খাত, তারই তীরে মুর্শিদাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খাঁর প্রতিষ্ঠিত কাঠরায় সবজিপটির পাশেই বিশাল মসজিদ। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের নির্মাণ পদ্ধতি অনুসারে তিনি মুর্শিদাবাদেও মসজিদ তৈরি করালেন। একসঙ্গে এর চত্বরে দু'হাজার লোক নেওয়াজ পড়তে পারে, চার পাশে অসংখ্য ঘর, মুয়েজ্জিনদের থাকবার সুবন্দোবস্ত।

একটু দূরেই তোপখানা, জাহানকোষা তার সেরা কামান; দেশী কামারের ঢালাই-করা ইস্পাতে নিখুঁত ভাবে তৈরি। কিন্তু সবই যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে, জাহানকোষা আজ তোপখানার প্রাঙ্গণে অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে।

তবু স্থানীয় লোকেরা ওই জাহানকোষার প্রচণ্ড প্রতাপ ভুলতে পারেনি। একদিন ওরই গর্জনে মারাঠারা ভীত ত্রস্ত হয়ে বাংলা ছেড়ে ছিল, তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বৌ-ঝিরা আজও জাহানকোষাকে পালপার্বণে তেল সিন্দুর মাখায়, প্রদীপ জ্বেলে প্রণাম করে।

চকের সীমানা ছাড়িয়ে একটু দূর থেকেই আমবাগান শুরু হয়েছে। অযত্নবর্জিত আশশেওড়া, গোন্দালে লতার বন জন্ম নিচ্ছে কাঠরা এবং জাহান-কোষার দিনগুলোকে বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দিতে।

আয়োজন চলেছে বাংলার অতীত দিনের সব রীতিনীতি, স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে। কাশিমবাজার, গোরাবাজারে ইংরেজের দুটো বিভিন্ন সত্তা বাসা বেঁধেছে। কাশিমবাজার বাংলার ইতিহাসে একটা দুঃস্বপ্নের ঠাঁই। ইংরেজের কূটবুদ্ধিতে এখানে বালিশান পড়েছে, আর গোরাবাজার যুগিয়েছে মারণাস্ত্র। কূট চাল এবং বুদ্ধি দিয়ে যেখানে কুলিয়ে উঠতে পারেনি, সেখানে ইংরেজ কামান এবং বন্দুক এগিয়ে দিয়েছে।

নতুন রেসিডেণ্ট সাহেব তরুণ, করিতকর্মা লোক। চারদিকে তার সন্ধানী দৃষ্টি। বাংলা মুলুকে পয়সা হাওয়ায় উড়ছে—তার চাই টাকা। সে যেমন করেই হোক, যাকেই বিপদে ফেলতে হোক তার জন্য পিছুপা নয় সে। কুঠি থেকে বের হয়ে নিজেই ঘোড়সওয়ার হয়ে চলেছে দরবারের দিকে। আসলে কাজ তার নবাব দরবারে হাজিরা দেওয়া, শহরে ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে নজর রাখা, যাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোন রকম আর্থিক ক্ষতি না হয়; কিন্তু বর্তমান রেসিডেণ্ট সাহেব আরও কাজের লোক।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই সামান্য রাইটার কেরানীর পদ থেকে সোজা উঠে এসেছে রেসিডেণ্টের পদে। এক কথায় এলেমবাজ, তুখোড়। ইতিমধ্যেই নবাব সেরেস্তায় বেনামীতে সে আষাড়িয়াদহ শিকারপুর প্রভৃতি পদ্মাতীরের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলো ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং সেখানে নীল ও তুঁত চাষের বেশ মোটা মুনাফাও ভোগ করছে।

কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছে রেসিডেণ্ট। বাংলার সেঁতসেঁতে হাওয়ায়

চড়া রোদ গায়ে জ্বালা ধারায়, হাঁপিয়ে উঠেছে সাহেব, শোলাহ্যাটটা কপালের কাছ অবধি টেনে চলেছে ; গঙ্গার ধারে একটু নির্জন ছায়াঘন জায়গায় একটা ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে এসে থামল। দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা একটা পাক খেয়ে ঘুরে চলেছে গোরাবাজারের দিকে। কয়েকখানা বজরা-মালগুজারী নৌকা মাঝগঙ্গায় নোঙর করে অপেক্ষা করছে। নুইয়ে-পড়া বট অশ্বত্থ গাছের আবছা অন্ধকারে থমথম করছে জায়গাটা। ঝুরি নামাড় নেমে নদীতীর অন্ধকার, নীচে স্রোতে একটা ছোট নৌকা টলমল করে কাঁপছে। হাঁ-করা শিকড়ের জালে একবার আটকে গেলেই স্রোতের টানে উলটে যাবে।

এ জায়গায় সাধারণত কেউ আসে না। রেসিডেন্ট সাহেব ঘোড়া থেকে নেমে কাকে খুঁজতে থাকে।

—মর্নিং সাহেব।

এগিয়ে আসে বেঁটে-খাটো আর্মানী সাহেব খোজা পিক্রু। নীল চোখ দুটো পিটপিট করছে বিষধর সাপের মত শয়তানীতে, টিকলো খাঁড়ার মত নাক। একফালি কপালে ছিটিয়ে পড়েছে এলোমেলো কটা চুলগুলো।

—সব রেডি সাব। পিট্ পিটে চোখ দুটো ঘুরপাক খাচ্ছে।

—রাতের অন্ধকারে মাল খালাস করো। রেসিডেন্ট সাহেব চাপা স্বরে নির্দেশ দেয়।

—ইয়েস স্যার। এদিকে নবাবী ফৌজের রিসালদার বখরা চাইছে।

—হোয়াট ! তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে বিরক্তির রেখা।

নৌকাতে আছে চোরা কারবারের মালপত্র। রেশম, ফরাসী মদ, ইতালীর কাঁচের তৈরি নানা শৌখিন জিনিস।...এসবের ব্যবসা করতে গেলে আইনত মোটা ট্যাক্স দিতে হবে স্টেটকে ; সেই অপব্যয়টা বাঁচানোর জন্যই এত সাবধানতা। রেসিডেন্ট সাহেবকে বশ করেছে পিক্রু। তাতে তার কারবারের সুবিধাই হয়েছে। অবশ্য এর জন্য তাকেও মোটা বখরা দিতে হয়। সময় অসময়ে বিদেশী মদ এবং তার বিদেশিনী কর্মচারীদের দু একজনকে রাত্রে কুঠিতেও পাঠাতে হয়, এ সব দিয়ে থুয়েও যা মুনাফা থাকে তা কোন অংশেই কম নয়।

বখরার ব্যাপারে অন্য কাউকে হাত পাততে শুনে চটে উঠেছে সাহেব।

চুপ করে রেসিডেন্ট সাহেব এগিয়ে চলছে শহরের দিকে, বেলা পড়ে আসছে। নির্জন বাগানে আম-কাঁঠাল-নারকেল গাছের ঘন সবুজ পাতার

রং বদলাচ্ছে; এই সময়টা বড় মিষ্টি লাগে তার। অর্থ চিন্তা ক্ষণিকের জন্যও ভুলে যায় সে।

—খবরদার!

টং টং শব্দে, সহিসের ডাকে এবং নবাবী ফৌজের হাতিয়ার বন্দ সওয়ারের হাঁকে রেসিডেণ্ট সাহেবের নতুন ওয়েলার ঘোড়াটা যেন বেচাল হয়ে ওঠে। সশব্দে এগিয়ে আসছে গাড়িখানা। বেগমসাহেবরা কেউ চলেছে গোলাব বাগিচার দিকে, না হয় প্রমোদভবনে। এসব দুচোখে দেখতে পারে না রেসিডেণ্ট সাহেব। ওদের দম্ভের বাহ্যিক অপচয়, সম্পদের অপপ্রচার। কোনদিন যদি অধিকার আসে তার হাতে, সে এই এলাহিভাবে অপচয় দম্ভজাহির বন্ধ করে দেবে। হাতি-ঘোড়া ঠাটঠমক দিয়ে কাঠ-পুতুলের বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই।

পিছনের গাড়িখানা এসে পড়েছে। নবাবের খাসমুলুক। রেসিডেণ্ট সাহেব মাথা উঁচু করেই চলেছে। হঠাৎ অদূরে গিয়ে গাড়িখানা থেমে গেল। জুড়ির তেজী ঘোড়া চারটে পিছনের পা ঠুকছে সতেজে পাথরমোড়া রাস্তায়, খুরের আঘাতে আগুনের ফিন্‌কি উঠছে।

অনেকগুলো বিস্মিত দৃষ্টিমেলা চোখ রেসিডেণ্টের দিকে চেয়ে রয়েছে। প্রধান দেহরক্ষী বলে ওঠে—বেগমসাহেবা!

কথাটা সে রেসিডেণ্টকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এর পরের ব্যাপারটা সারতেও যেন আদেশ জানাচ্ছে সে। কি ভেবে রেসিডেণ্ট ওয়েলার থেকে নামল, অপমানে লজ্জায় টকটকে হয়ে উঠেছে মুখচোখ, রোদ্দ-তাতা শরীর জ্বালা করছে দুঃসহ অপমানে। ঘোড়া থেকে নেমে টুপি খুলে দাঁড়িয়ে রইল সাহেব। হঠাৎ গাড়ির দিকে চোখ তুলতেই অবাক হয়ে যায়।

—বেগম সাহেবা!

একটি পড়ন্ত রক্তসন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। রাজমহলের পথে কোন অজানা প্রান্তরে পদ্মদিঘির জলে দেখা ফুটন্ত পদ্মের মত সজীব সুন্দর সেই তওফাওয়ালী!

দরবারে নাচের আসরেও তাকে দেখেছিল, পায়ের চঞ্চল ছন্দে ওর ফুটে উঠেছিল লাল পদ্ম। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। একটি মুহূর্ত। যেন হাসছে বেগমসাহেবা। হেস্টিংসের সারা মনে ঝড় উঠেছে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। হেস্টিংস আনমনে ফিরে এসেছে কুঠিতে। বেগমের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আর দরবারের দিকে এগোতে পারেনি। কেমন যেন একটা লজ্জা দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসেছে। মীরজাফর ছিনিয়ে নিয়েছে মণি বাঁদীকেও, সেই বাঁদীকে কুর্নিশ করতে হয়েছে আজ। কি যেন ভাবছে চতুর ইংরেজ!

কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণের গোলাপ গাছে তাজা ফুলগুলো আঁধার আলো করে রেখেছে, বাতাসে বাতাসে তাদের মাদকতাময় সৌরভ। ওপাশে ঝরনার জল পড়ছে ঝির ঝির সুরে। জলকণাসিক্ত বাতাস ভেসে আসে বকুল গাছটার পানে। অলসগতিতে ঝরে পড়ে শিথিল বকুল দল দু একটা করে। অন্তহীন আয়ুর সমুদ্রে ঝরে পড়ছে এক একটি করে প্রাণের স্পন্দন অবিশ্রান্ত গতিতে।

হেস্টিংসের চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাজমহলের যুদ্ধশিবির। গঙ্গাতীরে সম্মিলিত ছাউনি পড়েছে নবাবী ফৌজ আর ইংরেজ ফৌজের। বাংলা আক্রমণ করতে এসেছে বাদশাহ শাহ আলমের পুত্র। প্রভূত সৈন্য আর সমরোপকরণ। তাদের সামনে ইংরেজের সৈন্য এবং নবাবের ফৌজ অতি নগণ্য। উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে শাহী ফৌজ তাদের ঘিরে রেখেছে, মাত্র গঙ্গার দিক খোলা। দূরে পারের চিহ্নও নেই, ধূ ধূ দিকচক্রবাল রেখা। ঐ অতল জলরাশির দিকে নবাবীফৌজের এগিয়ে যাওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। চিন্তায় পড়ে গেছে তারা। একবার পরাজিত হলেই শাহীফৌজ বাংলায় ঢুকবে এবং তার পরিণাম কি তাও জানে ইংরেজ। কাশিমবাজার, গোরাবাজার কিল্লার কোন চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না, ফৌজের শেষ সীমানা হবে কলকাতা অবধি। ইংরেজের নিশ্চিত সমাধি রচিত হবে।

সিরাজের কলকাতা অবরোধের স্মৃতি এখনও তারা ভোলেনি। শিউরে ওঠে কল্পনা করতে। আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে দিতে তারা নারাজ। যেমন করেই হোক বাধা তারা দেবেই। সেনাপতি মেজর ক্যালড, লুসিংটন এবং হেস্টিংস কি ভাবছে ছাউনিতে বসে। কোন কিছুরই সুরাহা করা যাচ্ছে না।

এমন সময় মীরজাফরের ছেলে নবাবী ফৌজের সেনাপতি মীরণের সঙ্গে অপরিচিত একজন তুর্কীকে আসতে দেখে বিস্মিত হয় তারা। যুদ্ধক্ষেত্র, ইংরেজ সাবধানী জাত। মুহূর্তের ইশারায় ছাউনির বাইরে সশস্ত্র প্রহরীর

সংখ্যা বেড়ে গেল। রাতের অন্ধকারে মীরণের কথা শুনে শিউরে ওঠে নৃশংস ইংরেজ।

শঠতা হিংস্রতায় মীরণ ওদের সবাইকে হার মানিয়েছে। সিরাজকে ইংরেজ বন্দী করেছিল, রাজচ্যুত করেছিল সত্যি, কিন্তু নৃশংসভাবে হত্যা করে তার মৃতদেহ হাতির পিঠে চাপিয়ে মুর্শিদাবাদের রাজপথে প্রকাশ্য শোভাযাত্রা করেছিল ঐ মীরণ। আলিবর্দির কন্যা ঘসেটি এবং আয়মানা বেগম মুর্শিদাবাদ ছেড়ে প্রাণভয়ে ঢাকাতে পালিয়ে গিয়েও ওর নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পায়নি। দুই বোনকেই মীরণ জলে ডুবিয়ে হত্যা করিয়েছিল। সিরাজের ছোট ভাই তরুণ মির্জা মেহেদীকে তক্তার ফাঁকে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করেছিল ওই মীরণ। হাত ওর নারীরক্ত, রাজরক্তে বহুবার রঞ্জিত। চোখেমুখে শ্বাপদ রক্তলালসা। ইংরেজ কার্যসিদ্ধির জন্য তেমনি নরপিশাচকেও বুকে টেনে নেয়। সে রাত্রে রাজমহল ছাউনিতেও নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্ত গড়ে উঠল। সুসভ্য ইংরেজ আর নরপশু মীরণ এবং শাহ্ আলমের পুত্রের বিশ্বাস-ঘাতক দেহরক্ষী তুর্কী কামদারের মধ্যে।

সিরাজী আর সরাবের ঝরনা চলেছে। ওদিকে নিশ্চিন্ত নিরাপদে শাহজাদা নিদ্রামগ্ন; অন্যদিকে কামদার শাহজাদাকে হত্যা কিংবা ইংরেজের হাতে বন্দী করে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতিতে এক লক্ষ টাকা চুক্তি করল; আধ লক্ষ দেওয়া হল তখনই, বাকি আধ লক্ষ দেওয়া হবে কার্যসিদ্ধির পর। পাকা দলিলও তৈরি হলো। ইংরেজ তরফ থেকে পাঞ্জা ছাপ দিয়ে সই করল হেস্টিংস, মেজর ক্যালড, নবাব তরফ থেকে মীরণ এবং কামদার নিজে।

সেই তিন পাঞ্জার নৃশংস জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা আজও ভোলেনি হেস্টিংস।

আকাশের বুকে তারার রোশনী জলে উঠেছে নীরবে। কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণে কোথায় ময়ূর ডাকছে। কাশিমবাজারের পথে পথে ঘন বনে নেমেছে স্তব্ধ রাত্রি। হেস্টিংস ভাবছে—সেই রাত্রের অপকীর্তির কথা কোন সভ্য মানুষই মেনে নেবে না। নরহত্যার দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। কামদার নিহত। বাকি আছে সাক্ষীদের মধ্যে ওই মীরণ। কুটিল রক্ত-পিশাচ মীরণ। বাংলা আজ শাহীকবল মুক্ত, কিন্তু মীরণ হেস্টিংসকে আজও বিপদে ফেলতে পারে। লুসিংটনও কথাটা স্বীকার করে। মীরজাফরকে দুর্বল করে আঘাত হানতে হলে মীরণকে সরানো প্রয়োজন।

দুজন ইংরেজ মুখোমুখি বসে। রাতের বাতাস অশরীরীর মত শিহর জাগায় বিদেশী পামগাছের পাতায়। বনঝাউগুলো হাহাকার করে ওঠে। লুসিংটন, হলওয়েল ওপাশে পাইপ টানছে, আবছা অন্ধকারে জলন্ত পাইপের আগুন দপ্ দপ করছে, যেন হিংস্র শ্বাপদের দুটো চোখ। ওরা সাগ্রহে কার প্রতীক্ষা করছে। কেল্লার পেটা ঘণ্টায় বাজলো রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। জলাভূমির ওপারে মতিঝিলের চারপাশের বনে তার নির্জন শব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

রাতের আঁধারে ওরা আসে। দিনের প্রকাশ্য আলোয় কাশিমবাজার কুঠির রূপ স্বতন্ত্র। সদর ফটক দিয়ে রাশি রাশি রেশম পশম নুন চামড়া মশলাপাতি বাজারে যায়। শত শত লোকজন গাড়িঘোড়া যাতায়াত করে নানা কাজে। রাতের অন্ধকারে বড় ফটকটা বন্ধ হয়ে যায়। তারই পাশে ঘুপচিমত একটু কাটা দরজা দিয়ে গুঁড়ি মেরে কত অপরিচিত, পরিচিত মুখ চাদর বোর্খা জড়িয়ে যাতায়াত করে। বহরমপুর, কুঞ্জঘাটা, সৈয়দাবাদ, কাশিমবাজারের কত জমিদার ফড়ে দালাল কুটনীকে দেখা যায়।

তারও চেয়ে গোপন পথ একটা আছে।

জলাভূমিতে জন্মেছে ঘন জলকচুর বন। চারপাশে কাশবনের সমারোহ; বাঁশ গাছগুলো নুইয়ে পড়ে জলের বুকে আঁধার কালো রহস্যময় পরিবেশ গড়ে তুলেছে। তারই পাশ দিয়ে আসছে ডিঙ্গিটা। এক একবার দেখা যায়, আবার বিলের কচু-কলমি বনের সবুজে মিলিয়ে যায়। কেল্লার নীচে এসে দাঁড়াল। চারদিকে সন্তর্পণী দৃষ্টি মেলে ডিঙ্গি থেকে নেমে এসেই ছায়ামূর্তিটা থমকে দাঁড়ায়।

উৎকর্ণ হয়ে শোনে, দূরে বিলের বুক থেকে রাতের আঁধারে আর একটা ডিঙ্গি আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে শব্দটা। কি ভেবে ছায়ামূর্তি নিজের ছোট ডিঙ্গিটার নীচেকার একটা পাটাতনে একটু চাপ দিতেই সেটা উঠে এল উপরের দিকে। সেই সঙ্গে হু হু শব্দে জল উঠছে। ডিঙ্গিটা জলে তলিয়ে গেল। পিছনের দিকে না চেয়ে নিঃশব্দ অন্ধকারে বিড়ালের মত সন্তর্পণী পদক্ষেপে সরে গিয়ে দূরে একটা পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। গায়ের কালো আংরাখা অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। বিলের দিকে দৃষ্টি মেলে চেয়ে কি যেন দেখছে। কারা পিছু নিয়েছে তার জানা দরকার। কয়েকদিন থেকেই অনুমান করতে পেরেছে সে, তাকে কারা যেন

ছায়ার মত অহরহ অনুসরণ করছে। তার প্রতিটি চালচলনের উপর লক্ষ্য রাখছে।

অস্পষ্ট তারার আলোয় ডিঙ্গিটার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। হ্যাঁ। চিনতে ভুল করে নি সে। দুজন দেহরক্ষীতে দাঁড় বাইছে, মাঝখানে বসে আছে মীরণ, হাতে তার খাপখোলা তলোয়ার। সন্ধানী দৃষ্টিতে চারদিকে কাকে খুঁজছে তারা।

একজন বলে ওঠে—ডিঙ্গির কোন চিহ্ন পর্যন্তও নেই। তাজ্জব!

বিস্মিত হয়ে গেছে সে আগেকার ডিঙ্গিটার রহস্যজনক অন্তর্ধানে।

—বড় মাছ জাওলা করছিল জনাব। একজন সৈনিক বলে ওঠে।

—তা হতে পারে। বিলের মাছ তো নয় আস্ত কুমীর। সিবার বর্ষায় একটাকে বিঁধেছিলাম। তা তুলতে চাচা আর আমি হিমসিম খেয়েছিলাম জনাব।

—থাম উল্লুক। ধমকে ওঠে মীরণ।

নিজের চোখকে সে অবিশ্বাস করতে পারে না। স্পষ্ট দেখেছে ডিঙ্গিটাকে এই দিকে আসতে। গেল কোথায়? তার অনুমান মিথ্যা নয়। কাকে সে মহাল থেকে বের হয়ে ঘোড়া নিয়ে বিলের দিকে আসতে দেখেছে। কারও চোখে পড়বার ভয়েই রাস্তায় ঘোড়া ছেড়ে ডিঙ্গি নিয়ে আসছিল সে, কিন্তু যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

সে রাত্রে কাশিমবাজার কুঠির গুপ্তকক্ষের ম্লান আলোয় চিন্তান্বিতভাবে চারজনকে বসে থাকতে দেখলে অনেকটা ষড়যন্ত্রের জাল পরিষ্কার করে জানা যেত। মীরকাশিমকেই হেস্টিংস বাংলার ভাবী নবাব হিসাবে মনোনীত করেছে। তরুণ প্রতিভাবান যুবক। তার কর্মক্ষমতা রাজ্য পরিচালনার উপযুক্ত। কিন্তু শ্বশুর মীরজাফরের অধীনে সামান্য সেনানায়কমাত্র। সিংহাসনের দাবীদার হিসাবে মীরণ আছে।

—মীরণ যদি না থাকে? হেস্টিংস বলে ওঠে।

হেস্টিংসের কথায় লুসিংটন এবং মীরকাশিম যেন কিসের আভাষ পায়।

—কিন্তু একটা শর্ত, কোম্পানির সব হুকুমই মেনে চলতে হবে মীরকাশিম খাঁ।

মীরজাফরকে নবাবী দিয়েছে ইংরেজ, ইচ্ছে করলেই তাকে সরানো যাবে। মীরণকে শেষ করতে পারলেই সব হাতে আসবে। হলওয়েল সাহেবের হাতে কাশিমবাজার, গোরাবাজার ছাউনির ভার। মীরকাশিম এতদিন সবুর করতে নারাজ।

—যদি মীরজাফরকে হত্যা করা যায় সাহেব? মীরকাশিম যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

চমকে ওঠে হেস্টিংস। ওরা সবাই সমান রক্ত পিশাচ। হেস্টিংস মীরণকে সরাতে চায় কুকীর্তির সঙ্গী হিসাবে—মীরকাশিম নিজের পথ পরিষ্কার করতে মীরজাফরকে হত্যা করতে চায়।

—তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। মীরণ আছে। হেস্টিংস জবাব দেয়।

মীরণ! আজ রাত্রে একটু আগেই মীরকাশিম তার হাত থেকে বেঁচে এসেছে। ধরতে পারলে ভগ্নীপতি হিসাবেও তাকে ক্ষমা করতো না সে। রাতের অন্ধকারে কাশিমবাজার বিলের জলে তার মৃতদেহ সমাধিস্থ করে বাড়ি ফিরতো। এখনও হয়তো ওৎ পেতে আছে সেই রক্তলোলুপ পিশাচ। মীর-কাশিম কি ভাবছে!

হলওয়েল সাহেব বলে ওঠে—যদি মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করা যায়?

হেস্টিংস ধীরভাবে জবাব দেয়—তার মত কোন ঘটনাই আপাতত ঘটেনি। যদি প্রয়োজন হয় করবো। কিন্তু অযথা রক্তপাতের চেয়ে গোপনে কাজ সারবার ফন্দিই আমি পছন্দ করি।

হেস্টিংস এত সহজে উত্তেজিত হতে চায় না; মাথা ঠাণ্ডা করে কি ভাবছ। গোপনে সমস্যা সমাধান করতে হবে।

মীরকাশিমকে প্রশ্ন করে হেস্টিংস,

—সুবেবাংলার সিংহাসনের জন্য কোম্পানি এবং আমাদের কতলক্ষ টাকা মূল্য দিতে চান মীরকাশিম খাঁ?

হেস্টিংসের কথায় বিস্মিত হয়ে ওঠে মীরকাশিম খাঁ। ইংরেজ যে বাংলার সিংহাসনকে তাদের ব্যবসার পণ্য করে তুলেছে এটা বিশ্বাস করতে পারে না। অন্তরের ঘৃণা, ক্ষোভ চেপে রেখে বলে ওঠে

—আমার বশ্যতাই তার চরম মূল্য।

হাসে হেস্টিংস—সেটা তো উপরি পাওনা। আসল টাকার অঙ্কটাও ভেবে

দেখবেন কাশিম আলি। ব্যবসা করতে এসেছি আমরা, বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সনন্দ দিতে হবে। রাজি থাকেন আমাদের সব সাহায্য পাবেন।

কোথায় এসে পড়েছে কাশিম আলি আজ ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে। ওদিকেও মীরণ মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কোন মুহূর্তেই নৃশংস মীরণ তার কার্যসিদ্ধি করবেই; সামান্য একজন সৈন্যাধ্যক্ষ সে, ইংরেজ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং আর্থিক লাভের জন্য তাকে সাহায্য করতে চায় মাত্র।

কি যেন ভাবছে মীরকাশিম।

—এখুনিই এর জবাব চাইছি না আলিসাহেব। নিশ্চিন্ত মনে ভেবে দেখুন। তবে বিনা শুল্কে বাণিজ্য এবং গদির জন্য কিছু সেলামী আমাদের চাই।

—এখনও তো শুল্ক দিয়েই বাণিজ্য করছেন।

—আর ভবিষ্যতে করতে চাইছি না বলেই আপনাকে সাহায্য করবার, মীরজাফরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কথা ভাবছি।

কি একটা জবাব দিতে গিয়ে কাশিম আলি খাঁ থেমে গেল। ওই বিদেশীদের দিকে চেয়ে ঘৃণায় শিউরে ওঠে। ওরা ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব নিকাশ করেও মানুষকে হত্যা করতে পারে। ওরা মীরকাশিমকেও যেন জালে বন্দী করছে—হাত পা বেঁধে ওদের পুতুল করে তুলতে চায়। প্রতিবাদ করলে সমস্ত চক্রান্তের কথা প্রকাশ করে দিয়ে জীবন বিপন্ন করে তুলবে।

—এ সম্বন্ধে যথা সময়ে আপনাকে জানাবো।

বের হয়ে এল মীরকাশিম।

বাধা দেয় হলওয়েল—ওদিকে যাবেন না।

বিলের পথে যেতে ওরাই নিষেধ করলে। বিলে কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাশিমবাজারের বনপথ দিয়ে রাত্রি নিশীথে ফিরে এলো মীরকাশিম চিন্তিত মনে।

একজন মাত্র লোক সারা মুর্শিদাবাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি নিজেকে। ওই বিলাস ব্যসন, ভোগের স্রোতে নিজেকে নিঃশেষে ভাসিয়ে দিতে তাঁর শিক্ষা সংস্কৃতি বিবেকে বেধেছিল। মুর্শিদাবাদের তামাম ইংরেজ কর্মচারীর দল, রেজাখাঁয়ের অনুচরবর্গ তাঁকে তাড়াবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি। মুর্শিদাবাদের নবাব মীরজাফরের প্রয়োজন ছিল মহারাজ নন্দকুমারকে সব থেকে বেশী।

একটা বাঁশের টুকরো পড়েছিল সেইটাই উঠিয়ে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। দেহরক্ষী এই ধরনের প্রতিবাদের জন্য তৈয়ার ছিল না, থমকে দাঁড়াল বাধা পেয়ে। মাথা উঁচু করে ঘৃণাভরে বের হয়ে এসেছিলেন সেদিন তিনি। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে রাতের তারার অক্ষরে পরিষ্কার পড়েছিলেন বাঙলার নিষ্ঠুর ভাগ্যলিখন।

উমিচাঁদ ইংরেজের হয়ে দালালি শুরু করেছে। সবরকম যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন। হুগলীর ফৌজদার তখন নন্দকুমার, উমিচাঁদ একদিন এসে হাজির হলেন ; মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়বল্লভ সকলেই ইংরেজের পক্ষে সাহায্য করছেন সিরাজকে উৎখাত করে দিতে। তিনি কি করবেন ?

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলেন সেদিন নন্দকুমার। সিরাজের উপর ব্যক্তিগত কোন ক্ষোভ তাঁর ছিল না। বাংলার এ দুর্দিন আসবে তিনি সেই সন্ধ্যাতেই কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু এত শীঘ্রই সেই সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে ভাবতে পারেন নি। পাশেই ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর। তারা উদগ্রীব হয়ে আছে নন্দকুমারের মতামতের উপর। সেদিন উমিচাঁদের চক্রান্তে মত দিয়েছিলেন, ধূর্ত ইংরেজের ছলনা না বুঝেই। একবার প্রতারিত হয়েছিলেন ওদের ধূর্ততায়।

আজ আবার এ কোন ফাঁদ পেতেছে তারা ঠিক বুঝতে পারেন না। এটা যে সুবুদ্ধি-প্রণোদিত নয়—তা বুঝতে দেরি হয় না। ইংরেজকে তিনি মর্মে মর্মে চিনেছেন।

বাইরে ঘোড়া থামবার শব্দ হ'ল। বারান্দায় এগিয়ে আসছে জুতোর শব্দ। মদমত্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে বিদেশী বণিকের দল। উঠে বসলেন নন্দকুমার। আজ যেন একটা মতলব নিয়েই এসেছে ওই হেস্টিংস।

—জুতোটা বাইরে খুলে আসবেন।

থমকে দাঁড়াল হেস্টিংস। ওর পদশব্দ থামিয়ে দিতে চায় ওই উত্তরীয়ধারী ব্রাহ্মণ। কি ভেবে জুতোটা বাইরে রেখে ঘরের ভিতর এসে বসলো রেসিডেণ্ট। একটা ঝড়ের পূর্বাভাষ, থমথম করছে আকাশ। নন্দকুমারই কথাটা জানান,

—আপনার চিঠি পেয়েছি। কোম্পানির হুকুম মত বর্ধমান, নদীয়ার রাজস্ব কলকাতার সদর কুঠিতেই আমরা জমা দিই।

হেস্টিংস পাইপ মুখেই বলে ওঠে—এখন থেকে সেটা আর কলকাতা না পাঠিয়ে এইখানের কুঠিতেই জমা দেবেন।

একটি মুহূর্ত! নন্দকুমার ওর দিকে চেয়ে থাকেন ; তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না ধূর্ত ইংরেজ।

নন্দকুমার জবাব দেন—কোম্পানির রেসিডেন্টের হুকুমে সে আইন ভাঙতে পারি না সাহেব।

—আপনারা হুকুম মানতে চান না? হেস্টিংসের কণ্ঠে উষ্মা ফুটে ওঠে।

—মানতে চাই বলেই কলকাতাতেই জমা দিচ্ছি। বোর্ডের হুকুম আনান, রাজস্ব আমরা আপনার কাছেই জমা দিয়ে রসিদ নেবো। তার আগে পারবো না।

স্রেফ সাফা কথা। একেবারে রসকষহীন পরিষ্কার প্রাঞ্জল ভাষা। হেস্টিংস মনে মনে ফুঁসছে, রেজা খাঁ কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল মহারাজের কথায়।

—আপনি থামুন খাঁ সাহেব। আমার কথা নয়, এ সবই নবাব মীরজাফরের হুকুম মতই সাহেবকে জানালাম। আচ্ছা নমস্কার।

অর্থাৎ হেস্টিংসের সঙ্গে এ সম্বন্ধে বেশি কথা বলতে চান না মহারাজ। ওর গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারার দিকে চেয়ে সাহেব বের হয়ে এল। অপমানের অসহ্য জ্বালায় মনে মনে জ্বলতে থাকে আগ্নেয়গিরির মত। জুতোর শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে কি ভাবছেন নন্দকুমার ; হয়তো এইবার ঝড় উঠবে।

খাঁ সহেব স্তব্ধতা ভঙ্গ করে—এটা কি ভালো হল মহারাজ?

—মানে? আপনিও ওদের ভয় পেয়েছেন খাঁ সাহেব? অবশ্য ওদের খুশি করতে পারলে লোকসান তেমন কিছু ছিল না, তবে ওদের জুলুম ক্রমশ বেড়েই চলবে। এ চাওয়ার কোন দিনই শেষ হবে না খাঁ সাহেব।

কথাটা যেন খাঁ সাহেবের বেশ মনঃপূত হলো না। মনে মনে ভাবে, ওর মতিগতিই আলাদা। কাফেরের বিষয় বুদ্ধি 'জেরাসে'ও নেই।

আপন মনে ভাবতে ভাবতে নিজের সেরেস্তার দিকে এগোল সে। বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আর্মানী বণিক বেঁটে-খাটো ধূর্ত লোকটা। খাঁ সাহেবকে দেখেই এগিয়ে এসে সেলাম ঠুকলো পিক্রু।

—সব ঠিক আছে খাঁ সাহেব?

চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কি দেখে খাঁ সাহেব তাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। কোমরের চামড়ার পেটির ফাঁক থেকে পিক্রু আঙুল চালিয়ে একটা হীরা বের করে খাঁ সাহেবের সামনে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলো। সূর্যের আলো

ঠিকরে পড়ছে চারদিকে তির্যক রশ্মিতে। খাঁ সাহেবের নীলাভ চোখের তারায় পড়ছে সেই আভা।

—খাস বার্মার মাল। ফিস ফিস করে বলে ওঠে বিড়ালের মত ধূর্ত ওই বিদেশী।

—কিম্মৎ কত সাহেব?

পিক্রু আভূমি নত হয়ে সেলাম করে—হুজুরের হাতে উঠলেই ধন্য হব। বাকি—

কথাটা আর বলতে হোল না, হীরাটাকে সন্তর্পণে লাল তুলোর আস্তরণে মুড়ে আচকানের ভিতরের পকেটে চালান করে খাঁ সাহেব অভয় দেয়।

—ঠিক আছে। তবে যেন জানাজানি না হয়। বিশেষ করে ওই কাফেরের কানে উঠলেই বিলকুল গলদ বেরিয়ে পড়বে। হুঁশিয়ারী কাম করো।

নন্দকুমারের ঘরের দিকে ইশারা করে দেখাল খাঁ সাহেব। পিক্রু মাথা নাড়ে—বেশখ।

গত কয়েকদিন আগেই গঙ্গার বুকে কয়েকখানা বজরা থেকে মাল খালাস করে ভেট দিতে এসেছে সে সরকারকে। রেসিডেণ্ট সাহেব ভেটে সন্তুষ্ট নন, তিনি কারবারের এক আনা মুনাফা না নিয়ে সন্তুষ্ট হন না। তাতেই রাজি না হ'য়ে পারেনি পিক্রু। এমনি ভাগাভাগিতেই কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে কারবার চালাচ্ছে কুঠিয়াল সাহেবরাও।

নতুন পরিবেশ। বিবি মহল আর বেগম মহল—যেন আসমান আর জমিন। বাংলা মুলুকের সব সম্পদ, হিন্দুস্থান ছাড়িয়ে ইরান, বসরা, বোখারার বিলাস সামগ্রী এসে জমায়েত হয়েছে এখানে। মতিমহলের একটা প্রস্থ নির্দিষ্ট হয়েছে মণিবেগমের জন্য। মীরজাফরের সন্তানের জননী হতে চলেছে মণি। বুব্বুও এসেছে। তবে আজ সে আর মণিবেগমের মনিবান নয়; তাকে চলতে হয় মণিবেগমের নির্দেশমতই। বুব্বু অসহায় অবস্থাতেই মাথা নীচু করেছে, কিন্তু রূপে সেও কম নয়, মনে মনে তার আশার দীপ আজও নেভেনি।

বিশাল চত্বরের মাঝে সবুজ দ্রাক্ষাকুঞ্জ, চারপাশে গঙ্গা থেকে নিয়ে আসা

ফোয়ারায় রঙীন জল উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। বাতাস জলকণা সিক্ত হয়ে হিমেল হয়ে উঠেছে। বোখরার লাল কার্পেটে ঢাকা মেজে, দেওয়ালের মাঝে মাঝে জয়পুরী শ্বেতপাথরে নিপুণ হাতে রকমারি জাফরি করা, শিলিংগুলো থেকে রূপোলী পাতে ঝল্‌সে ওঠে দিনে রাতের আলো। হু হু বাতাসে পর্দাগুলো নড়ছে, দুলছে তার গায়ে সাচ্চাসোনার অসংখ্য ঘুঁঘুট। মণিবেগম অলসভাবে ডিভানে শুয়ে কি যেন ভাবছে। কানে আসে বুব্বুর বীণের আলাপ।

মুলতানের সুর ওর হাতে ঠিক জমে না, কানে তখনও ভাসছে ওয়াজিদ বীণকারের সুর লহরী। জীবন্ত রূপ রং রসে ভরপুর সে রাগিণী। সরগম থেকে তানকর্তবটুকু তার নিজস্ব সুডৌল রীতিতে গজ গমনে চলেছে। দিনের শেষ ডাক ভাসছে আকাশ বাতাসে, বিরহবিধুরা কোন প্রিয়া দয়িত মিলন পিয়াসে উৎসুক নয়নে পথ চেয়ে আছে। গেরুয়ারোদে দিকহারা বাতাসের হাহাকারে তার কান্নার সুর গুমরে ফেরে।

ওয়াজিদকে সে ভুলতে পারে না। জীবনের সব সুর, সব সুন্দরের সাথী হয়ে মনের গহনে সে ঠাঁই নিয়েছে।

হঠাৎ বীণ থেমে যেতেই উঠে বসলো মণি।

—জনাব! উঠে অভ্যর্থনা জানায় মীরজাফর আলি খাঁকে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, চুলে পাক ধরেছে। কোথায় মনের অতলে ওর একটা দুশ্চিন্তা বাসা বেঁধেছে। মনের সঙ্গে বিবেকের অহরহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে ক্লান্ত বিপর্যস্ত, সেই অসীম ক্লান্তির ছায়া ফুটে ওঠে তার মুখে।

বুব্বু চলে গেছে, জাফর আলি খাঁ চেয়ে থাকে বাঁদীর দিকে।

—আপনি কি অসুস্থ জনাব? মণির কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

ব্যস্ত হয়ে নিজেই উঠে গিয়ে সরবৎ এনে দিল। মুক্তার ঝালর-লাগানো খসখসের হাতপাখাখানা তুলে এগিয়ে এল ওর কাছে। জাফর আলি খাঁ ওর দিকে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে। মাঝে মাঝে মণিকে ঠিক চিনতে পারে না। ওরা কৈজীর জাত নয়, এ দয়া প্রেম তওয়াফওয়ালীর মনে এল কোথা থেকে।

চোখের সামনে আজ মীরজাফর দেখতে পেয়েছে আগামী বিপদের ছবি। বার বার তার চোখে ভেসে ওঠে সিরাজের প্রার্থনাকাতর মুখ।

—একবার ক্ষমা করুণ সিপাহশালার। ভুল সকলেই করে। আমিও ভুল করেছি।

কিন্তু ক্ষমা তাকে করেনি মীরজাফর। নির্দয় নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। বাংলার কোন লোক তাকে ক্ষমা করেনি। বার বার সেই স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন আজও মন ব্যাকুল করে তোলে।

—তুমিও কি আমাকে ঘৃণা কর বেগম ?

প্রায়ই এ কথা শুনেছে মণি জাফর আলি খাঁর মুখে। এ প্রশ্নের জবাব কোন দিনই দেয় নি। প্রথমে ভেবেছিল পরম নিষ্ঠুর নৃশংস ওই মীরজাফর। নেহাত ভোগবিলাসের জন্যই বাঁদীকে বেগম করে এনেছে। কিন্তু যতই দেখেছে লোকটিকে, ততই দয়া অনুকম্পায় ভরে উঠেছে ওর মন। অসহায় ব্যক্তিত্বহীন একটি মানুষ। পরের অঙ্গুলি হেলনে অন্যায় করেছে; কিন্তু সেই অনিচ্ছাকৃত অন্যায়ের জন্য বিবেকের বৃশ্চিক দংশনে জ্বলে পুড়ে মরছে। অসহায় মানুষটির জন্য দয়া হয়। মনে মনে স্থির করেছে বেগম, এ ভাবে সমস্ত ভার একাই ওকে বইতে দেবে না সে। নিজের রূপ-গুণ-বুদ্ধি আছে, সে কেন এগিয়ে আসতে পারে না স্বামীর পাশে!

দুচোখে প্রেমের স্নিগ্ধতা এনে চেয়ে থাকে ওর দিকে। ক্লান্ত জাফর আলি খাঁ বলে চলেছে—ভুল আমি অনেক করেছি বেগম। তার জন্য খোদাতালাকে প্রার্থনা জানাই, যা শাস্তি তুমি দেবে এই জীবনেই দিও। তার জন্য দোষ কাউকেই দোব না।

...আজ মীরকাশিম মাথা তুলছে। কোম্পানির ধূর্ত ইংরেজ সারা বাংলায় জালপেতে বসেছে। নবাব নাজিম তাদের হাতের পুতুল। অসহায় কণ্ঠে বলে ওঠে মীরজাফর,

—কোথাও তীর্থে গিয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে চাই বেগম।

মণি কথা বলে না; কোথায় অসহ্য বেদনা লুকোনো রয়েছে ওর মনে, তারই যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে চলেছে সে।

বাঁদী সেলাম দিল—বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে মহারাজ নন্দকুমার দেখা করতে চান তাঁর সঙ্গে।...বেগম বাধা দেয়,

—অসুস্থ শরীর নিয়ে এখন দেখা না করলেই নয় ?

মীরজাফর ব্যস্ত হয়ে ওঠে—না, এখানেই নিয়ে এস তাঁকে।

মণিবেগম একটু যেন বিব্রত বোধ করে। হাসে মীরজাফর—এঁকে দেখলে শ্রদ্ধা না করে পারবে না বেগম। আমার একমাত্র হিতৈষী সুহৃৎ হিন্দু ব্রাহ্মণ, দেশবরেণ্য লোক।

মণিবেগম মুগ্ধ দৃষ্টিতে সতেজ সুঠামদেহী ব্রাহ্মণের দিকে চেয়ে থাকে। নির্ভীক নিরাসক্ত লোক, চোখের দিকে চোখ রাখা যায় না। শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে।

হাত তুলে আশীর্বাদ করেন নন্দকুমার, কি যেন চিন্তামগ্ন। মীরজাফর এগিয়ে আসে, নীরবে মহারাজ হেষ্টিংসের চিঠিখানা তুলে দিলেন তাঁর হাতে। পড়েই বিস্মিত হয় জাফর আলি খাঁ।

—সামান্য একজন রেসিডেন্ট এই হেষ্টিংস, তার ঔদ্ধত্য অমার্জনীয়।

—আমিও সেই জবাবই দিয়েছি। খাজনা আমরা কলকাতাতেই পাঠাবো। সেই সঙ্গে একটা কাজও সারতে হবে। বাদশাহী সনন্দ আপনার নামে নিতে হবে। আবার শাহী ফৌজ এগিয়ে আসছে।

মীরজাফর যেন আর ভাবতে পারে না, সমস্ত চিন্তাধারা জট পাকিয়ে যায়।

—একদিকে ইংরেজ, অন্য দিকে শাহী ফৌজ! নবাবী না গোলামী করছি মহারাজ?

এ কথায় জবাব দিলেন না নন্দকুমার। মীরজাফরের অন্যায়কে তিনি ক্ষমা কোনদিনই করেন নি। আজও শেষ চেষ্টা করছেন তিনি ইংরেজের বশ্যতা না মানারই জন্য। শাহী ফরমান পেলে রাজস্ব তিনি পাঠান বন্ধ করবেন।

মীরজাফর বলে ওঠে—মীরণকে আজই আমি পাঠাবো শাহী ফৌজের সঙ্গে সন্ধি করে নজরানা দিয়ে শাহী ফরমান আনবার জন্য। যেমন করে হোক ফরমান আমার চাই-ই।

দমকা বাতাসে হঠাৎ ওপাশের দরজার কিংখাবের পর্দাটা নড়ে ওঠে সশব্দে। দেখা যায় একজন বাঁদী চকিতপায়ে সরে গেল।

—কোন হ্যায়? গর্জন করে ওঠে জাফর আলি খাঁ।

মণিবেগমও এগিয়ে যায় বাঁদীর উদ্দেশে, কে যেন তাদের গোপন পরামর্শ শুনছিল কান পেতে, চমকে ওঠে জাফর আলি খাঁ! এ সংবাদ ইংরেজের কাছে পৌঁছবে, সারা প্রাসাদে ওদের গুপ্তচর। মহারাজ নন্দকুমার স্তব্ধ হয়ে কি ভাবছেন। বাঁদীকে ঠিক ধরা গেল না। রংমহলের নীচেকার চোরা দরজা দিয়ে সে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল।

—ভুল দেখেছিলেন বোধ হয়? নন্দকুমার বলে ওঠেন।

জাফর আলি খাঁ যেন বিড় বিড় করে—হবে। বয়সও তো হয়েছে। চোখে ঠিক দূরের জিনিস দেখতে পাই না।

জাফরগঞ্জ প্রাসাদের পিছনেই গঙ্গা। ওপাশে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডাল ছেয়ে এসেছে রক্তলাল ফুলের প্লাবন। পাতার চিহ্ন মুছে গেছে, কেবল গাঢ় লাল ছোপ আকাশ কোলে পুঞ্জীভূত লাল মেঘের ইশারা এনেছে। একজন পেশোয়ারী শেখ গরমে বসে ধুঁকছে। একপাশে নামান তেলচিমটে কালো একটা পিঠবাঁধা থলিয়া ; আসল বর্ণ তার ময়লা আর তেল লেগে ঢেকে গেছে। প্রাসাদ থেকে বাঁদী লোকজন যাতায়াত করছে। আপন মনে সে বেসাতি মেলে বসে আছে আর হাঁক পাড়ছে,

—আসলি হিং, জাফরান, শিলাযুত, বংশলোচন হ্যায়।

একজন বাঁদি এসে দাঁড়াল। একটু পরেই দেখা গেল পেশোয়ারী শেখ পাগড়ির ডগা দিয়ে ঘাম মুছে চলেছে চকের সীমানা পার হয়ে।

ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। এখন ও আর লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়ার মত চলে না, আর্মানী ব্যবসায়ী পিক্রর বাড়ির ভিতর সোজা হয়েই ঢুকে গেল। পিক্রু সাগ্রহে যেন তার পথ চেয়েই বসেছিল।

সব রকম ব্যবসাই করে পিক্রু। পয়সা এবং প্রতিপত্তির ধান্ধাতেই সুদূর মাতৃভূমি ছেড়ে বাংলা মুলুকে এসেছে হাওয়ায় ছড়ান পয়সা, আসরফি কুড়িয়ে নিতে। পিছনকার দরজা দিয়ে আরবী টাট্টুতে সওয়ার হয়ে বের হয়ে পড়লো পিক্রু কাশিমবাজার কুঠিতে নতুন সওদা নিয়ে। এমন সওদার দাম বহুৎ। নবাব হারেমের খাস তাজা খবর, নির্ভেজাল। সাক্ষী মহারাজ নন্দকুমার স্বয়ং।

ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ নন্দকুমারের প্রথম থেকেই রয়ে গেছে। বাংলার বুকে ফরাসী চন্দননগর থেকে কোন সাহায্য পাবার আশা না থাকলেও নন্দকুমার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। কাশীর বলবন্ত সিং তখন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা। মহারাজ নন্দকুমারের দৃষ্টি ছিল তাঁর উপরও। তাঁর সাহায্য পেলে শাহী ফৌজের সঙ্গে সন্ধি করে তাঁরা সম্মিলিতভাবে ইংরেজ সৈন্যকে পরাজিত করতে পারেন এ আশা তিনি ছাড়তে পারেন নি এখনও।

বলবন্ত সিংও এতে অমত করেন নি। দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন ইংরেজ বাংলা বিহার উড়িষ্যা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না। দক্ষিণ ভারতের অধিকারও পেয়েছে, এইবার উত্তর ভারতের দিকে দৃষ্টি দেবে তারা। তার আগেই বাধা দেবার শেষ চেষ্টা করতে চান তিনি। তাই নন্দকুমারের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল তাঁর।

বর্ষার ঝিম ঝিম বৃষ্টির মধ্যে চলেছে অশ্বারোহী ; মুর্শিদাবাদের সীমানা ছাড়িয়ে বিহারের দিকে। পথে ইংরেজ সৈন্য পিছু নিয়েছে। পিস্তলের গুলিতে লুটিয়ে পড়লো দূত। লুঠ করবার জন্যই হত্যা করেছিল সোয়ারীকে ইংরেজের সৈন্যেরা।

কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়ে পড়লো। দূতের জেব্বার বুক পকেটে নবাব মীরজাফরের ছাপমারা নন্দকুমারের চিঠি, কাশীরাজকে লিখছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনার গূঢ় তথ্য সমেত। চন্দননগরের ফরাসী কুঠিয়ালদের কথারও উল্লেখ আছে। গোপন চক্রান্তের সমস্ত তথ্যই ইংরেজের হাতে পৌছে যায়।

হেস্টিংস, ভ্যান্সিট্টার্ট তখন পানোন্মত্ত। কাশিমবাজার কুঠিতে সেই চিঠি পেয়েই নেশা ছুটে যায় তাদের। শিউরে ওঠে তারা। উপবীত সর্বস্ব তেজস্বী ব্রাহ্মণ এতদূর অবধি এগিয়েছে তা কল্পনাও করেনি।

—ডেঞ্জারাস ! স্যুট হিম্। ভ্যান্সিট্টার্ট গর্জে ওঠে।

বাধা দেয় হেস্টিংস—তা হয় না। ওর উপর এখন থেকে কড়া নজর রাখতে হবে। ফিনিস হিম এট দি ফার্স্ট অপরচুন মোমেণ্ট।

কড়া পাহারা বসেছে। যাতে আরও চিঠিপত্র কিছু হাত করতে পারা যায় তার জন্য, পিক্রর দলকেও অবহিত করা হোল। মনে মনে শিউরে ওঠে ওরা, বাঙালী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে স্থায়ী আতঙ্ক বাসা বেঁধেছে। মীরজাফরকেও আর রাখা নিরাপদ নয়। গদ্দিচ্যুত করবার এতবড় কারণ থাকা সত্ত্বেও তাকে এখনও কেন সরানো হয়নি সেই কথাই মনে হয়।

মীরজাফর মীরণকে বাদ দিয়ে মীরকাশিমকেই ধরেছে ইংরেজ নবাবী দেবার পাত্র হিসেবে।

মীরণ সম্বন্ধে ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে ওরা ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলে। শাহ্ আলমের পুত্রকে হত্যা করবার হীন চক্রান্তের কথা মীরণ জানে।

কাশিমবাজার কুঠিতে কর্মব্যস্ততা পড়ে গেছে। হলওয়েল, ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেবও এসেছেন। গোরাবাজার কিল্লায় ভোরের আগে হতেই প্যারেড শুরু হয়েছে। বিউগিল মিলিটারি ব্যাণ্ডে 'রুল ব্রিটানিয়া' বাজছে, গঙ্গার বুক থেকে জলো দমকা হাওয়ায় উড়ছে ইয়নিয়ন জ্যাক।

শাহী ফৌজ এগিয়ে আসছে।

নবাবী ফৌজ তোষাখানা থেকে কামান বন্দুক টেনে বের করছে।

তেল পালিশ করে হাতিয়ারবন্দ হচ্ছে তারা—শাহীফৌজকে বাধা দিতে হবে। ইংরেজেরও স্বার্থ জড়িত রয়েছে নবাবের সঙ্গে, বাংলার সঙ্গে। সুতরাং যুদ্ধসাজে তারাও তৈরি। ইংরেজ সৈন্য নবাবী ফৌজ একযোগে বাধা দিতে চলেছে। কাশিমবাজার কুঠির বাইরে কুচকাওয়াজের মাঠের একদিকে একটা বিশাল বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে হেস্টিংস। পরনে তার ফৌজী পোশাক। লাল কর্ডুরয়ের লংপ্যাণ্ট; কোমরে তরওয়াল, মাথায় জরির স্ট্রাপ লাগান অফিসারি হুডক্যাপ। এ যুদ্ধের রীতিনীতি সম্বন্ধে কি যেন গোপন খবর পেয়ে মনস্থির করছে। মীরকাশিমের হাতে মুর্শিদাবাদ শহর রক্ষার ভার দিয়ে মীরণকে যুদ্ধে যেতে হুকুম হয়েছে শুনে খুশিই হয়েছে হেস্টিংস। বাকি কথাটা যুগিয়ে দেয় হলওয়েল।

—কাশিমবাজার কুঠিতে ইংরেজ ফৌজ মজুত থাকুক। ওদিকের কোন খারাপ সংবাদ পেলেই আমরা মুর্শিদাবাদ দখল করবো। মীরকাশিম এতে আমাদিকে সাহায্য করবেন।

শেষ পর্যন্ত তাই সাব্যস্ত হল। নবাবের অগোচরেই কাশিমবাজার কুঠিতে বেশ কিছু সৈন্য রেখে মেজর লুসিংটন এবং ক্যালার্ড এগিয়ে চললেন মীরণের সঙ্গে শাহীফৌজকে বাধা দিতে।

ছাউনি পড়েছে বিহারের সীমা ঘেঁষে মুক্ত উদার প্রান্তরে। এখনও জঙ্গী মনোভাব আসেনি ফৌজদের। সন্ধ্যার অন্ধকারে মুক্ত প্রান্তরে আগুনের চারপাশে বসে তাসা পিটছে আর মত্ত অবস্থায় গান গাইছে। ইংরেজ ফৌজ দেশী সৈন্যদের সঙ্গে মেশে না। তাদের ছাউনি পড়ে একটু দূরে। তারাও সরাব খায়—হৈ-চৈ করে। কেউ কেউ বা রাতের অন্ধকারে কাছাকাছি পল্লীতে গিয়ে হল্লা শুরু করে। গোরা সিপাই যাবার পথের দুপাশে গ্রাম তাই জনহীন হয়ে যায়, ওরা মূর্তিমান আতঙ্কের মত হয়ে উঠেছে। গৃহস্থের গরু-বাছুর ছাগল গোয়াল থেকে বের করে এনে খানা বানায়, বৌ-ঝিদের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে লোক।

মেজর ক্যালার্ড, লুসিংটন দুজনেই কড়া নজর রেখেছে নবাবী ছাউনির উপর। রাত্রি গভীরেও তাদের প্রহরা ঠিক থাকে। দূরে ওদিকে একটা সাতাকানাতী তাঁবুর ভিতরের কিছুটা অংশ দেখা যায়। লাল কার্পেট পাতা,

এদিক ওদিক ছড়ান কয়েকটা গির্দা। কোণে টাঙ্গান রয়েছে কয়েকটা তলওয়ার, বন্দুক, যুদ্ধের সাজ পোশাক। মীরণ একটা সাটিনের পায়জামা আর সলমা আঁটা কুর্তা পরে পায়চারি করছে।

রাত্রি নিথর হয়ে আসে। শাহী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ইচ্ছা তার নেই। রাত্রির নির্জন মুহূর্তের সুযোগ খুঁজছে মীরণ!

আসল উদ্দেশ্য তার শাহ আলমের সঙ্গে সন্ধি করা। বাদশাহী সনন্দ বের করে নিতে হবে; কিন্তু কোথায় যেন কি একটা গোলমাল ঘটেছে। তার সৈন্যদল পিছনেই ছিল, সামনে এগিয়ে আসছিল গোরা ফৌজ। হঠাৎ মেজর ক্যালার্ডের আদেশে ইংরেজ সৈন্য গেল পিছনের দিকে, আগে আসতে হ'ল মীরণকে।

প্রতিবাদ করেছিল—এভাবে এগোবার কথা ছিল না।

—মিলিটারি ট্যাক্‌টিক্‌স। সাহেব জবাব দেয় কঠিন কণ্ঠে।

ক্যালার্ডের চাকামত বিরাট হাঁড়ি মুখের অতলে খুদে পিটপিটে দুটো চোখ কি যেন শ্বাপদ লালসায় জ্বলে উঠেছে। লুসিংটন মীরণের বিনা অনুমতিতেই ওর সেনাদলের ছাউনিতে ঢুকে একবার নিরীক্ষণ করে গেল। এমন কি তোষাখানার কামান বন্দুকের একটা আন্দাজও নিয়েছে।

চিন্তিত হয়ে পড়েছে মীরণ। দূর প্রান্তরে হঠাৎ ইংরেজের মনে কোথায় যেন সন্দেহ জেগেছে। ওরা টের পেয়েছে হয়তো মীরণের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যের কথা মীরজাফর নন্দকুমার আর সে, মাত্র তিনটি লোক ছাড়া আর কেউ জানে না। হঠাৎ জালে বন্দী হয়ে পড়ার মত অবস্থায় দেখতে পায় নিজেকে! দূরে ইংরেজ ছাউনির কোলাহল কমে আসছে। ক্যাম্প-ফায়ারের লাল আভা শীতের গুঁড়ি গুঁড়ি হিমে ম্লান হয়ে এল।

শাহী ছাউনি এখান থেকে ছয় মাইল দূরে। মেজর ক্যালার্ড, লুসিংটনের উপর ভ্যান্সিটার্টের স্পষ্ট নির্দেশ আছে যেন মীরণ শাহী ফৌজের ছাউনিতে পৌঁছতে না পারে। মহারাজ নন্দকুমার যে সনন্দের জন্য মীরজাফরকে বলেছিলেন, বণিক ইংরেজের মনেও সেই সনন্দ পাবার আশা রয়েছে। মানদণ্ড ছেড়ে রাতারাতি ভারতের রাজদণ্ড তুলে নেবার লোভ সামলাতে পারেনি ইংরেজ। হেস্টিংস ত পিত্রুর কাছ থেকে মীরজাফরের গোপন ইচ্ছা শোনা অবধিই লুব্ধ হয়ে উঠেছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়ে যেতে চায় হেস্টিংস, তাদের দলের ওই রক্তলোভী পিশাচ মেজর ক্যালার্ড এবং লুসিংটন।

সূচীভেদ্য অন্ধকার। রাতের তারাগুলোও মেঘে ঢেকে গেছে। ঈশান কোণে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা যায়— আবার দ্বিগুণতর হয়ে নেমে আসে অন্ধকার। প্রান্তরে খটখট শব্দ উঠছে। দ্রুত ছন্দবদ্ধ শব্দ। ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে চলেছে শুকনো পাতা, আকাশে উড়ছে আবর্জনা, লাল ধূলো। এক ঝিলিক আলোয় দেখা যায় কে যেন বেগে ছুটে চলেছে।

হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সোয়ারী। পিছন থেকে কারা এগিয়ে আসছে। ঘোড়াকে হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিতে থাকে। কিন্তু মূর্তিমান মৃত্যুর মত সামনে থেকে তার পথ রুদ্ধ করলো দুজন অশ্বারোহী। বাধা পেয়ে ঘোড়াটা সামনের দু পা তুলে গতিরোধ করেই পিছন ফেরবার চেষ্টা করছে। আবছা আলোয় দেখা যায় অশ্বারোহী আর কেউ নয় মীরণ; সামনে তাকে বাধা দিয়েছে মেজর ক্যালার্ড এবং লুসিংটন। মীরণ মুহূর্তমধ্যে কোষবদ্ধ তরবারি বের করে এগিয়ে যায়। বাধা পেয়ে সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিশ্চিত মৃত্যুর ছায়া। রাত্রির ঝড়ো আকাশে বাতাসে কোন অশরীরীদের আহ্বান!

প্রচণ্ড আঘাতে ওর হাত থেকে ছিটকে পড়লো তরবারি। নিরস্ত্র অবস্থায় ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লো মীরণ শক্ত মাটিতে। দু'দিক থেকে দুজন তাকে টিপে ধরেছে, নড়বার শক্তিটুকুও নেই। ব্যর্থ প্রচেষ্টায় দাপাচ্ছে সে প্রাণের শেষ বিন্দুটুকু দিয়েই।

জমাট অন্ধকার সজীব হয়ে উঠেছে। মীরণের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সিরাজের বেদনাহত মুখ, সেই কাতর চাহনি! অসহায় আর্তনাদে মুর্শিদাবাদের আকাশ বাতাস কেঁপে উঠেছে। মহম্মদী বেগের তরবারির মুখ দিয়ে ছিটকে পড়ছে তাজা রক্ত, মীরণের দুহাত রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ছে মীরণ!

হ্যাঁ। চোখের সামনে দেখেছিল ঘসেটি, আয়মানা বেগমকে। পলাতকা বেগমের জীবনের শেষ নিশ্বাসটুকুও রুদ্ধ করে দিয়েছে মীরণ। তিলে তিলে দম বন্ধ হয়ে আসছে, বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা, অসীম শূন্যতা জমাট বেঁধে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে আচ্ছন্ন করে আনছে। ঘসেটি-আয়মানা নদীর অতল জলের মধ্যে কি নিশ্বাস নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল? আজ তাদের কালো চোখের তীব্র প্রতিহিংসা আগুনের আভা নিয়ে নিরন্ধ্র অন্ধকারে জেগে রয়েছে। এগিয়ে আসছে ওরা! ওদের বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রতিহিংসার জ্বালা।

আতঙ্কে চিৎকার করবার চেষ্টা করে মীরণ। কিন্তু দম তার ফুরিয়ে আসছে।···ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিরাজের ছোট ভাই মির্জা মেহেদী। ফুলের মত সুন্দর তরুণ কিশোর। আজ তাকে দেখে শিউরে ওঠে মীরণ! কেন —কেন ওরা সবাই ভিড় করে আসে অকারণ? মেহেদীর সুন্দর সুগৌর কণ্ঠদেশের দুপাশে কালো গভীর একটা দাগ। দুপাশ থেকে তক্তা চেপে তাকে হত্যা করেছিল মীরণ, আলিবর্দির বংশের একটু পিদীমও সে রাখবে না। তরুণ কিশোর নিষ্ফল বেদনায় কঁকিয়ে উঠেছিল!

মেহেদী! মির্জা মেহেদীকে চেনা যায় না। দুচোখের তারা ঠিকরে পড়েছে, জিভটা বের হয়ে দাঁতে আটকে গেল। নীল হয়ে উঠেছে সারা মুখ, নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে সুতোর মত রক্তধারা। এগিয়ে আসছে তার দিকে। হিমশীতল কঠিন দুহাতের চাপে টিপে ধরেছে মীরণের কণ্ঠনালী। মীরণের হাত দুটো কে আটকে রেখেছে, শয়তান তার নিশ্বাস রুদ্ধ করে আনছে। মেহেরবান!

দুনিয়ায় কাউকে মেহেরবাণী করে নি মীরণ। আজ তার জন্য কোথাও দয়ার কণামাত্র অবশেষ নেই। রাতের অন্ধকার জমাট বেঁধে আসে তার চোখের সামনে।

স্থির প্রাণহীন দেহটা পড়ে রইল নির্জন প্রান্তরে। ছায়ামূর্তিগুলো সরে গেলে, মিলিয়ে গেল কোন দিকে।

পরদিন ভোরেই নবাবী ছাউনি, গোরা ফৌজ সকলেই ব্যাপারটা অনুমান করে। ঝড়ের রাত্রে মীরণ বজ্রাঘাতেই মারা গেছে।

টুপি খুলে এগিয়ে যায় মেজর ক্যালার্ড, লুসিংটন, আরও ইংরেজ বীররা। ছাউনি উঠলো, মীরণের শবদেহ সসম্মানে আনীত হল মুর্শিদাবাদে। কোম্পানি যথারীতি শোকপ্রকাশ করলেন। গোরা সৈন্য কামান দেগে নির্ধূম আকাশ কালো করে কাঁপিয়ে তুললো।

ইংরেজের শাহ আলমের পুত্রকে হত্যা করার কাহিনী, নিজেদের অনেক কলঙ্কের ইতিহাস মীরণের সমাধির সঙ্গে মাটির অতলে আশ্রয় লাভ করলো।

মণিবেগম আজ চোখের সামনে রাজ্যের উত্থান পতন ভাঙাগড়ার নিখুঁত

ছবি দেখতে পায়। হীরা-জহরৎ, সম্পদের প্রাচুর্যের অন্তরালে এমনি একটি করুণ নিঃস্বতা আছে তা ভাবতেই পারেনি। বিলাস-ব্যসনের মোহে সেই চরম পরাজয়ের স্বপ্ন ভুলে গিয়েছিল, আজ আবার সেই হাহাকার চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

মীরজাফরের দিকে চাইতে পারে না। উপযুক্ত সন্তান মীরণের মৃত্যুর পর কেমন অসহায়, পরাজিত হয়ে পড়েছে সে। বজ্রাঘাতে পুড়ে যাওয়া বটগাছ, ডালপালা কতকগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাকি যেটুকু টিকে আছে সেখানেও সবুজ শ্যামলিমার কোন ছায়া নেই, রিক্ত শূন্য নিঃস্ব। কোন পাখির কাকলিই সেখানে শোনা যায় না, কোন বিহঙ্গও বাসা বাঁধে না। সব কোলাহল সজীবতা তাকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেছে।

নীচে দেখা যায় হেষ্টিংস আর দুজন ইংরেজ এসে কাছারির দিকে ঢুকলো। এক নজর উপর থেকে দেখেই চিনতে পারে মণিবেগম। সেই প্রথম অপরাহ্নে দেখা তরুণ, আজ ভাগ্যের জোরেই বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবী নিয়ে কিনিবিকি করতে বসেছে হাটে হাটে। মীরজাফর আলি খাঁ কি ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। মেহগিনি কাঠের পালিশ করা সিঁড়ি, ঝকঝকে, মুখ দেখা যায়; নিজের প্রকম্প ছায়ার দিকেও চাইবার সাহস তার নেই। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংএর কাছে একটা বিরাট অয়েলের ছবি। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে রয়েছে সিরাজ! বহুবার ওই ছবিটাকে যেতে আসতে দেখেছে মীরজাফর, অনেকদিন ভেবেছে ওখান থেকে সরিয়ে দেবে ছবিখানাকে; আজ হঠাৎ সেই ছবির সামনে এসে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, মনে হয় নড়ছে ছবিটা। শিউরে ওঠে সারা গা, কাঁটা দিয়ে ওঠে সাহসী অন্তর। আজ মনে হয় সিরাজের সেদিনের ব্যথা বেদনা বিন্দুমাত্রও অনুভব করতে মীরজাফর পারে নি। আজ মর্মে মর্মে সেই দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায় নিজের জীবনের আসন্ন ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হতাশাভরা দিনে। স্তব্ধ হয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াল মীরজাফর। গ্লানিভরা কণ্ঠে বলে ওঠে,

—তোমাকে যে ব্যথা দিয়েছিলাম, আজ মর্মে মর্মে তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। তোমার কাছে মাপ চাইবার অধিকারও আর নেই।

আজ দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পায় মীরজাফর তার আসন্ন ভবিষ্যৎ, সিরাজের শেষ দৃশ্যটা কল্পনা করতেও শিউরে ওঠে। ছিন্ন ভিন্ন শবদেহ প্রকাশ্য রাজপথে টেনে নিয়ে ফিরেছিল ওরা। আর্তনাদ করে অস্ফুটকণ্ঠে।

—খোদা মেহেরবান।

হেস্টিংস আজ বুট সমেত এসে ঢুকছে নন্দকুমারের ঘরে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির সামনে ক্ষীণ ধোঁয়ার কুণ্ডলী তুলে একান্ত একাকী পুড়ে চলেছে একটুকরো চন্দন ধূপ। স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন মহারাজ। হেস্টিংস পাইপ টানছে, বিলেতী তামাকের উৎকট বিশ্রী গন্ধ ধূপের মিষ্টি ক্ষীণ সৌরভটুকুকে ঢেকে দিয়েছে। সঙ্গের একজন সাহেব শিস দিয়ে পায়চারি করছে। তার হাতের কনুই অবধি খোলা, সাদা চামড়ায় কতকগুলো নীল রংএ অর্ধনগ্ন মেয়ের ছবি উল্কি আঁকা, মহারাজ মুখ ফিরিয়ে নিলেন ঘৃণাভরে। হেস্টিংস হুকুম করে, —সব হিসেবপত্র রেজা খাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

—নবাবের হুকুম না পেলে তা কি করে সম্ভব? নন্দকুমার জবাব দেন।

চটে ওঠে হেস্টিংস—আই সে, ডু ইট।

মুহূর্তের মধ্যে মহারাজ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কি জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। নীরব ঘৃণাভরা তেজদৃপ্ত চাহনিতে তার দিকে চেয়ে থাকেন মহারাজ।

হেস্টিংসও কথাটা বলে একটু ঘাবড়ে গেছে ওর অতলস্পর্শী দৃষ্টির সামনে। মীরজাফর প্রবেশ করতে ওই অপ্রিয় প্রসঙ্গটা আপাতত চাপা পড়লো। রেজা খাঁ একপাশে দাঁড়িয়েছিল, নবাবকে কুর্নিশ করে এগিয়ে যায়।

ওদের আসার অর্থ আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে ওঠে মীরজাফরের চোখের সামনে। এখন শুধু হাতে এসেছে ধূর্ত ইংরেজ, পিছনেই কাশিমবাজার কুঠিতে চাই কি নবাবের ফৌজী ছাউনিতে অপেক্ষা করছে নবাবের অন্নদাস জামাই মীরকাশিম, সসৈন্যে তাকে বন্দী করবে। মীরজাফরকে রক্ষা করতে আজ সারা বাংলায় একটি হাতও উঠবে না।

—রেজা খাঁকে হিসাবপত্র বুঝিয়ে দিতে হবে।

সমস্ত শক্তি একত্রিত করে মীরজাফর এগিয়ে এসে কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—আমার বিনা অনুমতিতে আমারই রাজধানীতে গোরা সৈন্য কুচ করানো, আমার সমস্ত হিসেব নিকেশ জোর করে চাওয়ার অর্থ কি নিশ্চয়ই জানেন?

হেস্টিংস জবাব দেয়—হ্যাঁ, বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজা প্রজা সকলেই মীরজাফরকে বিশ্বাসঘাতক বেইমান বলে। তারা আপনার শাসন মানতে রাজি নয়।

সামনে যেন বজ্রাঘাত হোল মীরজাফরের। ইংরেজ আজ তারই জন্যে

বাংলার বুকে ঠাঁই পেয়েছে, ওই অপবাদ বাঙালী তাকে দিতে পারে কিন্তু ইংরেজের গায়ে সামান্যমাত্র মানুষের রক্ত থাকলে ওই অপবাদ দেবার কল্পনা করতেও বাধতো তাদের। আজ মীরজাফরের ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। মীরণের মৃত্যুর পর সেনাবাহিনীতে তাঁর হাত নেই, রাজকার্যও চলে যাচ্ছে কোম্পানির গড়ে তোলা পুতুল ওই ধূর্ত রেজা খাঁয়ের হাতে।

—যদি না দিই? মীরজাফর শক্তি সংগ্রহ করে জবাব দেয়।

—কোম্পানির হুকুম না মানার অপরাধে আমরা ফৌজ দিয়ে মুর্শিদাবাদ দখল করবো। আপনাকে বন্দী করতে বাধ্য হবো।

ইংরেজের হাতে বন্দী! সিরাজের শেষ দিনের কথা মনে পড়ে; শিউরে ওঠে মীরজাফর। কি ভাবছে অসহায় গদিচ্যুত নবাব। মুর্শিদাবাদের রাজ-পথ আবার কার রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠ্‌বে! অজানা আতঙ্কের কালো ছায়া তার মনের সব আশার আলোকে নিভিয়ে দেয়। ইরেজ আজ বলদর্পী; যে কোন মুহূর্তে তার জীবনে চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে আসতে পারে। সব আলো চিরদিনের জন্য নিভে যাবে। বাঁচবার, শুধু বেঁচে থাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে মন। কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে মীরজাফর হেস্টিংসের দুটো হাত ধরে; দীনতা ফুটে ওঠে,

—আমার জন্য কত দাম স্থির করেছো সাহেব? বল, কত টাকা দিলে আমাকে প্রাণে বাঁচতে দেবে তোমরা?

মীরজাফরের আতঙ্ক বিস্ফারিত দৃষ্টি হেস্টিংসের মনে জয়ের নেশা আনে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে হেস্টিংস। কাঁপছে নবাবপ্রাসাদ সেই হিংস্র পশুর হাসির প্রচণ্ড শব্দে। আলিবর্দী, সিরাজের মৃত আত্মা শিউরে ওঠে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদের কোণে কোণে।

কখন ঘর থেকে তাঁর অজ্ঞাতসারেই বের হয়ে গেছেন নন্দকুমার। এই দৃশ্য তিনি দেখতে পারেন না। বাংলার একের পর এক নবাব বিদেশী ইংরেজের কাছে মুক্তিপণ দিয়ে করযোড়ে প্রাণভিক্ষা চাইছে, এ দৃশ্য তিনি দেখতে চান না। রক্তের দাগে দগ্‌দগে হয়ে উঠেছে সবুজ মাটি।

—জবাব দাও সাহেব। মীরজাফর ব্যাকুল কণ্ঠে যেন আর্তনাদ করছে। হাসছে হেস্টিংস—কাওয়ার্ড। গদি তোমার জন্য নয়।

রেজা খাঁ কখন নীরবে গিয়ে মহারাজার পরিত্যক্ত জায়গায় বসেছে। ধূপের বিশ্রী গন্ধ তার নাকে লাগে, কাফেরের অপবিত্র সৌরভ; কানের ভাঁজ

থেকে আতর ভিজানো তুলো শুঁকতে থাকে। অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে মীরজাফর। তার বিচারের রায় বের হয়েছে, নিষ্ঠুর সে বিচারক।

রাজনীতির সতরঞ্চ খেলায় পাশা পড়েছে—কখনো বা উল্টো দান, কখনও সোজা। গজ-নৌকা-ঘোড়া ছাড়াও বড়ে দিয়ে কিস্তী মাৎ করবার চেষ্টা করছে অনেকে।

মণিবেগম আজ নিজেকে নতুন করে চিনতে শেখে। হেষ্টিংসকে সে একদিন দেখেছিল কোন সামান্যতম অবস্থায়, মনে পড়ে রাস্তা দিয়ে চলেছিল সে, সেলাম না করাতে ওকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে নবাবী সম্মানের কেতায় দুরস্ত করে দিয়েছিল বেগম। আজ সেই হেষ্টিংস এসেছে তার স্বামীকে গদিচ্যুত করবার ফারমান নিয়ে।

কি ভাবছে বেগম। বাতাসে লাল গোলাবের পাপড়ি ঝরে পড়ছে ঝুর ঝুর করে। কোথায় দ্রাক্ষাবনে তখনও ঘুরে বেড়ায় ভ্রমর দল। তওফাওয়ালীর রক্তে যেন মাতন উঠেছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের এক স্বর্ণসন্ধ্যায় নির্জন প্রান্তরে পদ্মদিঘির ধারে দেখা নীল নির্জন দুটি কামনা ব্যাকুল চোখের চাহনি। হ্যাঁ! ওই নীরব চাহনির অর্থ সেদিন বুঝতে এতটুকু ভুল করেনি সে।

উঠে দাঁড়াল বেগম। রূপোলী পাতামোড়া পেটির ডালা খুলে কি যেন দেখছে সে। মুর্শিদাবাদের প্রথম আসরে সেই মির্জাপুরী সিল্কের ঘাঘরা পরে নেমেছিল, আশমানী রংএর বুলন্দশহরের থেস, ফিকে আকাশী রংএর মেঝেতে টুকরা জরির কাজ করা যেন এক আকাশ রাতের তারার বাহার খুলেছে, তারই ফাঁকে উঁকি মারছে ওর চাঁদের মত মুখখানা। কত আশা আনন্দ এতে মিশিয়ে আছে, মণিবেগমের যৌবনমদির দেহের সুবাস আজও মিশে আছে এর সঙ্গে।

মীরকাশিম রাতারাতি প্রাসাদ সুরক্ষিত করে তুলেছে। গঙ্গার দিকে তৈরি হচ্ছে বুরুজ। পূর্বপ্রান্তে কাটরার সবজি মহল্লার শেষ সীমায় গড়খাই সংস্কার করে ওটাকে বিলের সঙ্গে যোগ করে দিচ্ছে। মুর্শিদাবাদ থেকে সহজে কেউ বের হয়ে যেতেও পারবে না, ঢোকাও হবে তেমনি কঠিন।

রাতের আঁধারে সেদিন কাশিমবাজারের দিকে ঝোলান পুল বেয়ে একটা ঢাকা গাড়ি বেগে বের হয়ে গেল।

—হুকাম ছার।

গোরা সৈন্যের খবরদারী নজর এড়িয়ে মাছিটিও গলতে পারবে না। গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে বুলস্ আই লণ্ঠনের আলোয় ভিতরের সোয়ারীর দিকে চেয়েই তাজ্জব বনে যায়। বড় ঘরের কোন বিবি সাহেব-সুবোর সঙ্গে বিশেষ আলাপ করতে যাচ্ছে। এটা তারা ভাল জানে এসব ব্যাপারে কড়া-কড়ি করতে গেলেই ঝামেলা। দাঁত চিপে বলে ওঠে—গো।

গড়ের এলাকায় ঢুকলো গাড়ি। নৈশ অন্ধকার কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে সাদা আরবী টাট্টু দুলকি চালে।

—টাকা! রূপোর বাট, সোনার বাট! মুর্শিদাবাদের নবাবী তোশা-খানার অন্ধকারে ওগুলো জমেছিল, ক্রমশ রাতের অন্ধকারে তা বের হয়ে চারিয়ে যাচ্ছে। সুবে বাংলা-বিহারের চাষীর ঘরে মাটির তলে পোতা কণা কণা সামান্য সঞ্চয় একত্রিত হয়ে সোনার তালে পরিণত হয়েছে। এখনও ওই সোনার তালে লেগে আছে কোন গৃহস্থ বৌএর এয়োতির সিন্দুর চিহ্ন, মাটির একটু দাগ। সামনে আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে ইংলণ্ডের সামান্য একটি নাম পরিচয়হীন তরুণ, জন্ম ইতিহাস যার সঠিক জানা যায় নি।

হিন্দুস্থানে এসে সে নিজের ভাগ্যকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

পায়চারি করছে হেস্টিংস। অতীতের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, দুঃখ অভাব অপমানের কালিতে কালো করা কতদিন, স্বদেশের কত হতাশার গ্লানি। কে জানে সেই দুর্দিনের দেখা এ্যানি কোথায়—তাকে পাবার কোন আশাই তার ছিল না। সামান্য অপরিচিত একটি তরুণ, কে তাকে আত্ম-সমর্পণ করবে? কি তার সামাজিক পরিচয়! আজ!!

মনে পড়ে কয়েক বৎসর আগেকার একটি অপরাহ্ণ বেলা, নির্জন প্রান্তরে পদ্মদিঘির জলে সজীব সেই লাল কমল!

হঠাৎ কিসের শব্দে চমকে উঠলো। রেড়ির তেলের সেজবাতির আলোয় দরজার দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়, যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না। নেশাও তেমন করেনি। বিলের সদ্যধরা লবস্টারের কাটলেটের সঙ্গে মাত্র দু'পেগ চালিয়েছে। সজ্ঞানেই আছে সে।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, হ্যাঁ, এ মুখ কোনদিনই ভুলবে না। জীবনের অমূল্য অবিস্মরণীয় মুহূর্তের এও একটি স্মৃতি।

—আপনি!

তওফাওয়ালীর সাজে মণিবেগম আসবে গভীর নিশীথ রাত্রে তারই কুঠিতে

একা এ যেন বিশ্বাস করতে পারে না। হঠাৎ মনে পড়ে যায় মীরজাফরের কথা। অসহায় গদিচ্যুত নবাব, আজ বাধ্য হয়েই এই হীন পন্থা নিতে এগিয়ে এসেছে মণিবেগম। কিছুদিন আগেই রেসিডেন্টকে প্রকাশ্য রাজপথে দেহ-রক্ষী দিয়ে বেগমসাহেবা নবাবী সহবৎ শেখাতেও কশুর করে নি। মনে একটা দম্ভ—অপমানের প্রতিশোধ নেবার দৃঢ়তা তার পাক দিয়ে জেগে উঠেছে, গ্রাস করছে তার নারী মাংসের প্রতি চিরন্তন স্বভাবসুলভ দুর্বলতাকে। এ যেন হেস্টিংসের নব চেতনার প্রত্যূষ।

এগিয়ে আসে বেগম, সাপের মত স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখছে সে সাহেবকে ; একটু হতাশ হয়, প্রথম দেখা সেই কামনার নেশাজ্বালা আগুন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, জেগে উঠেছে ওর দৃষ্টিতে পুঞ্জীভূত ঘৃণা।

—সেলাম বেগমসাহেবা।

মণিবেগম অবাক হয়ে গেছে। ওদিকে টাকা, রূপো, সোনার তাল, আশরফি দেখে অনুমান করতে পারে কোত্থেকে, কেন এসেছে ওই দৌলত। বাংলার সিংহাসনের কিম্মত দিতেই নবাবী তোশাখানা ফাঁক হয়ে যাবে। এগিয়ে আসছে বেগম, শিরায় শিরায় তার উতলা যৌবনের চঞ্চল রক্তপ্রবাহ ; তরুণ ইংরেজের সামনে কাঁপছে সেজের আলো, রাতের নিরন্ধ্র অন্ধকার সুপ্তি-মগ্ন আকাশের নীচে জেগে আছে মাত্র তারা দুজন। মণিবেগম আজ নিজেকে ভাসিয়ে দিতে এসেছে—মীরজাফরের জন্য, নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায়। বাংলার মসনদের নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে। বাতাস কাঁদছে ওই নির্জন বনসীমায়!

তারার আলো আকাশের বুকে কামনার দীপ জ্বেলেছে।

চঞ্চল হয়ে উঠেছে হেস্টিংস। সারা দেহমনে ওর ঝড় উঠেছে। একদিন যে সম্পদ তার কাছে ছিল দূর আকাশের তারার মত আজ তা অযাচিত ভাবে তার সামনে এসেছে। ওদিকে পুঞ্জীভূত সোনার তাল, একদিকে কামিনী, অন্যদিকে কাঞ্চন। জীবনের মধু বসন্ত, অন্যদিকে সঞ্চয়ের তীব্র কঠিন শীতঋতু!

—কথা দাও সাহেব ; মীরকাশিমকে গদি তুমি দেবে না!

মণিবেগমের চোখে কি এক ব্যাকুলতা! বেশবাস অসংযত ; রূপের এক ঝলক আলো যেন ঠিকরে পড়েছে।

স্থির কণ্ঠে বলে হেস্টিংস,—তা হয় না বেগম। কোম্পানির পরোয়ানা সে পেয়েছে।

হেষ্টিংস লোলুপদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। থমকে দাঁড়াল বেগম। নিজেকে বিকিয়ে দিতে আসেনি। এসেছিল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। ইংরেজও ব্যবসা করতে এসেছে।

—মরা সোনার তাল নিয়েই খুশি হও সাহেব। মণিবেগম নিজেকে সামলে নিল। হেষ্টিংস বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে, অতল অন্ধকারে কোন পথই দেখছে না সে।

বের হয়ে এল মণি। এক মুহূর্তও আর সেখানে দাঁড়াল না। অসহ্য অপমানে সুগৌর মুখ কালো হয়ে উঠেছে। পরাজয়, প্রত্যাখ্যানের চরম গ্লানি তার অন্তর জ্বালায় বিষিয়ে তুলেছে। এ কাহিনী রাতের আঁধারেই চাপা থাক। যদি দিন আসে ওই বিদেশীকে এর জবাব দেবে। লজ্জায় অপমানে কাঁপছে প্রত্যাখ্যাত বেগম। দাঁত চেপে দ্রুতপদে এসে গাড়িতে উঠলো।

কুঠির বারান্দায় বের হয়ে এসেছে হেষ্টিংস। বাঁশ গাছগুলো কাঁপছে হাওয়ায়; জীবনের সমস্ত বসন্ত আজ ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। আজ মনে হয় ওর জন্যই তো সে মীরজাফরকে সহ্য করতে পারে নি। মীরজাফর তার সামনে মণিকে নিজের হারেমে নিয়ে তুলেছিল, এ যেন তারই দুঃসহ অপমান। আজ সেই মণিবেগম তাকে অতল অন্ধকার থেকে আলোকের ইশারায় ডেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল বিস্মৃতির অতলে। এ সোনা রূপোর তালগুলো আজ মাটির মতই মূল্যহীন. কাঞ্চন ধূলায় ফেলে কাঁচ নিয়েই তৃপ্ত হয়ে রইল সে। কামনামদির মধু বসন্তের সৌরভগন্ধমদির বাতাস তার রুদ্ধ জানালায় মাথা ঠুকে ফিরে গেল।

রাত কত জানে না। বনঝাউগাছের পাতায় হাহাকার উঠেছে, বিলের বুকে রাতজাগা ডাহুকগুলো মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে ওঠে, আবার নিস্তব্ধতা নেমে আসে, জেগে থাকে মাত্র গড়ের ফটকে সেন্ট্রির ভারী বুটের শব্দ। আর টিপটিপ করে জ্বলছে ওর হাতের বুলস্ আই লণ্ঠন।

মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ সীমান্তে কাশিমবাজারের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত জলাভূমি। কোন কালে গঙ্গার ধারা ওই পথেই বইতো। ক্রমশ গঙ্গার মুখ ওদিকে পলি পড়ে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন ওটা বদ্ধ জলায় পরিণত হয়েছে।

অতল খাদের বুকে ঠাঁই ঠাঁই এখনও কালো জল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছোট হ্রদে পরিণত হয়েছে। এমনি একটা বিস্তীর্ণ জলার চার পাশে বাঁধ দিয়ে ঘোড়ার খুরের আকারে তৈরি হয়েছে মতিঝিল। গঙ্গার গভীর খাদে হয়তো কোন শুক্তির ভিতর মুক্তার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, মতিঝিল নামে পরিচিত হবার এও একটা কারণ হতে পারে। চারদিকে সুন্দর লাল কাঁকরের প্রশস্ত রাস্তা ঘন সবুজ বনসীমা সাজানো বাগানের মধ্য দিয়ে সীমন্তিনীর একফালি সিন্দূরের মত চলে গেছে। অপরাহ্ণ বেলায় হাজারো পদ্মপাতার সবুজে রক্ত-রাঙ্গা ফুলগুলো উন্মুখ হয়ে শেষ আলোর স্পর্শ মাগে—বাতাসে অলস পাখায় মৌমাছির গুন গুন সুর বিদায়ী সন্ধ্যাকে ব্যথাতুর করে তোলে।

আলিবর্দীর কাছ থেকে দূরে নিশ্চিন্ত নির্জনতার মাঝে বাস করবার জন্যই নওয়াজিস খাঁ এই মতিঝিলের সংস্কার করে এর পশ্চিমতীরের আমবাগানের ধারে সুন্দর প্রাসাদ তৈরি করান। গৌড়ের লুণ্ঠিত শ্বেত কৃষ্ণ পাথর—নানা রত্ন এনে মনের মত করে মতিঝিলের প্রাসাদ কক্ষ তৈরি হয়।

সামনের বাগানে ফুটতো অসংখ্য আফগানিস্থানের নার্গিস কাশ্মীরের জাফরান, বসরা, গাজীপুরের খোসবুদার গোলাব। মতিঝিল থেকে ফোয়ারার জল আসছে। নওয়াজিস খাঁ মতিঝিলকে প্রমোদ ভবন, ভোগ-বিলাসের কেন্দ্র করে তুলেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর স্তব্ধতা আজ মতিঝিলের সৌন্দর্যকে আরও মহান সুগম্ভীর করে তুলেছে। কালো মর্মরে তৈরি ছোট মসজিদটা বিশাল প্রমোদভবনকে জীবনের শেষ স্থির নির্দিষ্ট পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আজ নওয়াজিস খাঁ নেই, অতল শ্যাম স্তব্ধতার সুগভীর আর্তি বুকে নিয়ে মতিঝিল দাঁড়িয়ে আছে। কালামসজিদে আশ্রয় নিয়েছে দু'একজন ফকির, দরবেশ আর বীণকার ওয়াজিদ আলি।

এ জীবন তাকে কি এক মোহে জড়িয়ে ফেলেছে। আলো, ঘুঙুরের শব্দ, পেশোয়াজের সলমা জরির কল্‌কায় আলোর ঝলকানি, তবলার লহরা আর মদের তীব্র সুবাসমাখা আমীর ওমরাহের মুশায়েরার দেহ নিবেদনের আকুতি ঢালা সুর আর তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। দিন রাত্রির প্রহর পালা বদলের ক্ষণে চুপে চুপে আসা প্রকৃতির অসীম সুষমার মদিরার সে স্পর্শ পেয়েছে, ধন্য হয়েছে। সেই পরম আনন্দের নেশায় মশগুল হয়ে আছে বীণকার, মানুষের আসরে নয়, অন্য কোন ভিন জগতের মুশায়েরার সে বীণকারের শিরোপা নিয়ে তৃপ্ত হয়েছে।

দরবারী কানাড়া রাগে বীণার তারগুলো কাঁপছে। কাঁপছে আকাশের হাজারো তারা, গাছের মাথায় জোনাকির আলো জ্বালা। সুরের অস্থায়ী অন্তরার ক্ষীণ রেশটুকু সঞ্চারীর খাদের রেশে একসা হয়ে যাচ্চে। কে যেন প্রাণের অসীম আকুতি সুরে ঢেলে দিয়ে ফুটন্ত হৃদকমল কোন আকাশ যোড়া অসীম দেবতার পায়ে নিবেদন করছে।

হঠাৎ কান্নার শব্দে চোখ চাইল ওয়াজিদ! নিজন মতিঝিলে ঘুমিয়ে গেছে হাঁসের দল, একক পদ্মের মিনতিভরা তন্দ্রাহারা রাত্রে কে কাঁদছে এই নির্জন বনসীমায়?

এগিয়ে আসে তারার চুমকি বসানো ওড়না-ঢাকা ছায়া মূর্তি। পায়েলের শব্দে চমকে ওঠে বীণকার। কামনার সাত রং মাখানো রামধনু জেগে উঠেছে বহু অশ্রুবর্ষিত স্মৃতির আকাশে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ঘোমটা সরানো মুখের পানে।

—তুমি বেগম আজ তওফাওয়ালীর সাজে!

ওয়াজিদ যেন স্বপ্ন দেখছে। অশ্রু-ভেজা কণ্ঠে বলে ওঠে মণি,

—তওফাওয়ালীর বেগম হবার সাধ। ভুলো না বীণকার আমি হিন্দুস্থানের সেরা তওফাওয়ালী। তামাম হিন্দুস্থানের ছোটখাট হাজার বেগম আছে, কিন্তু মণিবাঈ, জাহানাবাদের তওফাওয়ালীর কোন দুসরা নেই।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওয়াজিদ ওর দিকে, কান্নায় বৃষ্টিভেজা নীলুফর ফুলের মত সজীব হয়ে উঠেছে ওর মুখ-চোখ। কালো আকাশের ছোঁয়া লাগা কেশপাশ খুলে লুটিয়ে পড়েছে হাঁটুর কাছ অবধি, এত রূপ কোনদিনই যেন দেখেনি সে। মণির কান্না ভেজা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় রাতের অন্ধকারে।

—এ রূপেও কোন কাজ হোল না বীণকার, বরবাদি আমার জোয়ানি, না পাশ আমার রূপ। মরা সোনার তাল এর চেয়ে অনেক দামী।

কোথায় যেন আঘাত ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলে এসেছে মণি। কাঁদছে, রুদ্ধ অশ্রুধারা ঝরে পড়ে শাওনের আকাশকালো অঝোরঝরা বৃষ্টির বেগে।

—মণি! ওয়াজিদ ওর হাতখানা তুলে নেয় নিজের হাতে। ওর বেদনা তার অন্তর ব্যথাতুর করে তুলেছে। কান্নার বেগ থেমে আসছে। অতীতের সেই মণিবাঈর স্বরূপ যেন ফিরে পেয়েছে সে। চিরাগের লালাভ শিখায় একটা লাল ফড়িং এসে লাফ দিয়ে পড়লো, অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে—ডানার জৌলুস পুড়ে গেছে। চমকে ওঠে মণি! সাগ্রহে কি যেন দেখছে!

—দেখছো বীণকার, দেখেছো সমা আর পরওয়ানার মিল ? জলে মরবে তবুও ছুটে আসবে সে। আমার রূপের আগুনেও অমনি করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দোব চারদিক।

মণির দুচোখের জল শুকিয়ে গেছে, ফুটে ওঠে জ্বালা ; ভস্মঢাকা আগুন ফুটে উঠেছে। ওয়াজিদ জবাব দেয়,

—তাতে নিজেও যে জ্বলবে মণি, দেখছো না চেরাগের বুক জ্বলে খাক্ হয়ে গেছে।

ওই প্রদীপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলে ওঠে মণি,

—জ্বলাই তার ধর্ম, জ্বলেই তার শেষ। এ ছাড়া পথ কই ?

ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মণি, এগিয়ে আসছে ওয়াজিদের সামনে, ওর ওড়না খসে গেছে মাটিতে, নীল কাঁচুলি সদ্যজাগ্রত পরিপূর্ণ যৌবনকে ধরে রাখতে পারছে না, গালের লালিমা মস্কটের তাজা ডালিমকেও হার মানায়, চোখের তারায় চেরাগের দীপ্তি ; নিঃশ্বাসে তেমনি জ্বালা ধরানো অস্থিরতা। চমকে ওঠে ওয়াজিদ ! এ কোন সর্বনাশা রূপে আজ তাকে ভাসিয়ে দিতে এসেছে ওই নারী !

—মণিবেগম !

কি যেন জ্বালা ফুটে ওঠে দরবেশের মনে। অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে সে।

কাঁপছে রাতের তারা, সব যেন একাকার হয়ে গেছে ওয়াজিদের সামনে। একটু স্পর্শ, মাতাল করা স্পর্শ।

হাসিতে ফেটে পড়ে মণি—দেখছিলাম রূপের সে জৌলুস আছে না হারিয়ে ফেলেছি।

—কি দেখলে ?

—দেখলুম এতটুকুও কমেনি, নৈলে তোমার মত দেওয়ানা দরবেশও আকুল হয়ে ওঠে। ডরো মৎ। এ আগুনে তুমি পুড়বে না। নিখাদ সোনা, সেরা জহুরীর হাতে পান-মরা সোনা তুমি।

—কি বলছো এসব হেঁয়ালির মতো ? সব চিন্তা যেন জট পাকিয়ে যায় ওয়াজিদের সামনে।

—হেঁয়ালি ক্রমশই পরিষ্কার হবে বীণকার ; আজ থেকে জেনে রেখো মণিবেগম মরে গেছে, এই খোলসের আড়ালে আবার জিন্দা হয়ে উঠছে

নতুন এক তওফাওয়ালী। নিজে সে নাচবে না, নাচাবে সকলকে। জ্বালিয়ে দেবে চারদিক।

এ কোন এক সর্বনাশা নেশায় মেতে উঠেছে মণি; কে জানে কোথায় কোন নিদারুণ অপমানের অসহ্য জ্বালা তাকে নতুন করে ভেঙে গড়তে চলেছে।

একাই বসে আছে ওয়াজিদ, মণিবেগম ঝড়ের বেগে উড়ে আসা ঝরা-পাতার মতই এসেছিল, আবার দমকা হাওয়ায় অন্ধকারের অতলে উধাও হয়ে গেছে। বীণার তারে সুর তুলতে থাকে আনমনে।

সুর আর জমে না, কি আকাশ-পাতাল ভাবছে ওয়াজিদ। সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায় তার কাছে, কি যেন অশুভ একটা কিছু ঘটতে চলেছে। বিশুবেগকে দেখেছে ওয়াজিদ—সাপের চেয়েও নিষ্ঠুর, পিশাচের চেয়েও বীভৎস ওই তওফাওয়ালীর জাত। মণিবেগমকে ওদেরই শ্রেণীতে ফেলতে কোন দিনই চায়নি বীণকার, তার কল্পনার মানসী হবে এ জগতের সব কালিমা মুক্ত, সমস্ত নীচতার ঊর্ধ্বে। কিন্তু মণিবেগমের সমাজ ভোগ-বিলাস, স্বার্থপরতা, হিংসার সমাজ; নীচতা, ব্যভিচার সে সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ; ওর মোহে একবার যে জড়িয়ে পড়বে তার আর নিষ্কৃতি নেই।

খোদা মেহেরবান! দুঃখ দিও ওকে, কিন্তু আর ওই তওফাওয়ালীর দেহফিরির নীচতায় ওকে নামিও না।

মিছে এ ভাবনা, নিজের মনের সমস্ত শান্ত সুষমাকে কেন বিব্রত করে তোলে সে! নিষ্ঠুর—তবু সত্য।

—আতা হ্যায় এক প্যারা এ দিল হর ফোঁগা কে সাথ।
তারে না ফস্ কামান্দে শিকারে আসর হ্যায় আজ॥

একি দুঃসহ ব্যথা। মণিকে সে বহুদিন আগেই পর করে দিয়েছে। আজও মনে হয় কোথায় যেন নিজের সত্তার একটা বড় অংশকেই দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ বেদনার মাঝে উন্মুক্ত করে রেখেছে, যে ব্যথা-বেদনাই সেই সচেতন মনে স্পর্শ করেছে, নিজের বুকেই তখন বেজেছে সেই বেদনা নিবিড়তর হয়ে।

মণিকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি সে, মিথ্যাই তার দরবেশীর লাল পিরহান, বীণার সুরে সুন্দরের সাধনা। স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবছে বীণকার! ত্যাগের গেরুয়া রং তার মনে আজও কোথাও লাগেনি।

নিস্তব্ধ প্রাসাদ ; সব আলো, প্রাণ প্রাচুর্য জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ থেকে চলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে মীরকাশিমের মহলে। সোহিনী রাগে সানাইএর ক্ষীণ আলাপ গঙ্গাতীরের মিনারেট থেকে স্রোতে ভেসে ভেসে চলেছে অন্তহীন অসীমের দিকে। জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের সব আলোই যেন নিভে গেছে, দীপ্তিহীন হয়ে উঠেছে ওর পাশে।

সামনের বাগানে একটু জায়গায় কয়েকটা হরিণ, খাঁচার মধ্যে খরগোস, একজোড়া ময়ুর রাখা ছিল। বেগম নিজের হাতে খাবার দিত ওদের, হরিণগুলোকে দেখে মনে পড়ে ছেলেবেলার দিনগুলো, বালকুণ্ডার ঊষর মরুপ্রান্তরে ছুটে বেড়াতো ছোট একটি মেয়ে। সে ছবি আজও তার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে আছে, শত দুঃখ দারিদ্র্য পেরিয়ে ধন দৌলতের সন্ধান পেয়েও নিজের সেই উজ্জ্বল ছবিটা আজও মন থেকে মুছে যায় নি। স্মরণের বালুকাভূমিতে কচি চঞ্চল পায়ের সেই ছাপ শত বারেও নিশ্চিহ্ন হয়নি।

ময়লা ছেঁড়া ঘাঘরা পরে পাথরের ভাস্কর ইমতাজ আলির কাজ দেখতো, কেমন তাল তাল পাথরের বুকে ছিনি হাতুড়ি মেরে খুঁড়ে বের করতো আশমানী হুরীর ছবি।

—এমনি সুন্দর তুই বুঝলি। ইমতাজ বলতো তাকে।

—ধ্যাৎ!

বুড়ো হলেও ইমতাজকে কেমন ভয় করতো তার ; লোকটা মাঝে মঝে ওর লাল গাল দুটো টিপে ধরতো ; কি যেন সোরাবীর মত চাহনি ফুটে উঠতো তার দুচোখে ; গুন গুন করে তাকে গজলের শায়ের শোনাত,

—গহহর কো আক্‌দে গর্দানে খুঁ বাঁ মে দেখ্‌না।
ক্যা অৌজ পর সিতারাঁ এ, গহহর ফরোশ হ্যায়॥

মণি এ পাথরের ভাস্কর না হয়ে মোতিবেচনা বালা হলে অনেক কিছু মিলতো। হাজারো মাশুক যাকে একটু ছোঁবার জন্য ব্যাকুল হয়, মতিবালা সেই কন্যার গলায়-হাতে স্বচ্ছন্দে হাত দিতে পারে।

কেন জানে না মণি, আজ সেই ইমতাজের কথা মনে পড়ে। সেদিন ইমতাজের কথাগুলো আবোল-তাবোল প্রলাপের মতই বোধ হতো ; বালকুণ্ডার বালিয়াড়িতে ঘুরে বেড়ানো হরিণের স্বপ্ন সে ভোলেনি, তাই নিজের মহালেই পুষেছিল হরিণ, কাকাতুয়া, হীরামন, বুলবুল, আফ্রিকার এক হাবশী এনেছিল একটা লাল টুকটুকে আফ্রিকান প্যারট। দেখতেও অনেক বড়, গায়ে তিন চার

রকম রং—গলার স্বর বেশ ভারি, গম্ভীর। আড়াল থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর বলেই মনে হয়। আরও অনেক পাখি পুষেছিল সে।

সব খাঁচাগুলো আজ শূন্য হয়ে পড়ে আছে। একি! কোন প্রাণী, পাখির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। থমকে দাঁড়াল। প্রহরী একজন ঝিমোচ্ছিল, শশব্যস্তে ছুটে এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

—কোথায় গেল এসব?

শূন্য খাঁচাগুলোর দিকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে। লোকটা আমতা আমতা করে জবাব দেয়—নবাব নাজিমের সেপাই এসেছিল, নতুন মহলে ওসব চিড়িয়া থাকবে, রেজা খাঁ সাহেব হুকুম দিয়েছেন।

—বেয়াদপ! গর্জন করে ওঠে বেগম—নবাব নাজিম এখনও—

কি বলতে গিয়ে থেমে গেল সে। হঠাৎ খেয়াল হয় সেদিন চলে গেছে। কাশিমবাজার কুঠিতে আজ রাত্রেই তার সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে এসেছে। নিষ্ফল এ রোষ, আক্রোশ!

লোকটা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

চোট-খাওয়া সাপের মত মাথা নীচু করে গাড়ি ছেড়ে মহলের জনহীন পথে ঢুকলো মণি। লজ্জায় অপমানে মাথা কাটা যাচ্ছে তার। কে জানে হাবশী প্রহরীটাও বোধ হয় পিছু ফিরে হাসছে, কাল সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তামাম মুর্শিদাবাদের বাজারে গঞ্জে এই কাহিনী রং চং চাপিয়ে বর্ণিত হবে।

মহলের রীতিনীতি, আদব কায়দা একদিনের মধ্যেই বদলে গেছে। নবাব নাজিমের পদচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবাবী রিয়াসাৎ থেকে তন্‌খাধারী প্রহরী খোজা সৈন্যের দল বিদায় নিয়েছে। প্রাসাদ অরক্ষিতই বলা চলে। নিজেদের খাস কয়েকজন মাত্র প্রহরী বাঁদী টিকে আছে। এতবড় প্রাসাদের তুলনায় তারা অতি নগণ্য।

নির্জন দালানে ঝাড়গুলো নিভে গেছে। ম্লান হয়ে গেছে সমস্ত দীপ্তি; শোক-বিষাদের থমথমে আবহাওয়ায় মৃতকল্পের মত পড়ে আছে নবাবী নির্মোক।

হঠাৎ নিচের মহলের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। জাফরির ওপাশের চবুতারায় কারা কথা কইছে ফিসফিস করে। কানে আসতেই চমকে ওঠে; শিউরে ওঠে বেগম। চকিতের মধ্যে মখমলের চটিগুলো ছেড়ে সিঁড়ির

এককোণে বিরাট মর্মর মূর্তির আড়ালে সরে গেল। একজন বাঁদীর সঙ্গে কথা কইছে প্রাসাদের একটি প্রহরী।

এমনতর ঘটনা প্রায়ই বেগম মহলে ঘটে। বাঁদী কেন বেগমরা পর্যন্ত জড়িত থাকে। প্রহরীর উপভোগ্যা শয্যাসঙ্গিনী হতে তাদের বিন্দুমাত্র লজ্জা ঘৃণা করে না। এও বোধ হয় তেমনি কোন অবৈধ মিলনের পূর্বরাগ চলেছে।

কিন্তু ওদের কথা কানে আসতেই চমকে উঠেছে বেগম। মীরজাফর আলি খাঁ উপরের রংমহলে সোরাবী নেশায় মশগুল হয়ে পড়ে রয়েছে। নবাবী যাবার দুঃখ অপমান ভোলবার পথ হিসাবেই ওটাকে বেছে নিয়েছে সে। অর্ধ-অচেতন অবস্থাতেই তাকে হত্যা করতে হবে। ইনাম মিলবে প্রচুর। মীরকাশিমের ফৌজে মনসবদারী পেয়ে যাবে সে।

পাশেই সিরাজের সেই প্রতিমূর্তি; জাফরির ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে-পড়া একফালি ম্লান আলোয় দেখা যায় ও যেন হাসছে। তৃপ্তির হাসি ওই ছবির মুখে।

মণিবেগম অজানা আতঙ্কে সরে দাঁড়াল, ওই জীবন্ত মূর্তিটার দিকে চাইতে পারে না; দ্রুতবেগে নীরবে উপরের দিকে উঠে গেল কম্পিত পদক্ষেপে. ছবিটা যেন জীবন্ত হয়ে তাড়া করেছে তাকে।

নিস্তব্ধ নীরব রাত্রি; তারাগুলো ঢেকে গেছে মেঘে মেঘে।

বিড়ালের মত সন্তর্পণী ছায়া ফেলে এগিয়ে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যু, ঘরের আলোগুলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছে মণি। বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছে হতভাগ্য মীরজাফরের জ্ঞানহীন দেহ; জীবনে সব সাধ যেন তার মিটে গেছে, ভাগ্যের হাতে অসহায়ের মত তুলে দিয়েছে নিজেকে—ক্লান্ত পথিক।

মণিবেগম কি যেন ভাবছে! দখলমে এগিয়ে আসছে মূর্তিটা; হাতে ওর খাপ খোলা ছোট দুধারি খঞ্জর, চাঁদের আলোয় ঝলসে উঠছে মৃত্যুর দীপ্তিতে।

চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেল। একা ও আসেনি। ওর পিছনে আছে মীরকাশিমের ইংরেজের সম্মিলিত শক্তি। প্রাসাদের রক্ষীদের ওরা আগেই হাত করেছে চোপদার মনসবদারীর লোভ দেখিয়ে, বাঁদীরাও বেগম হবার স্বপ্ন দেখছে। চিৎকার করলে কেউ আসবে না, হয়তো ওই পশু মীরজাফরকেও হত্যা করে তাকেও বাদ রেখে যাবে না।

হঠাৎ কি যেন পথ পেয়েছে সে। মরুভূমির বন্য আদিম রক্ত তওফাওয়ালীর লোহুতে মিশ খেয়ে মাতন তুলেছে।

হত্যাকারী নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শব্দ, পিঠের দিকে হাত দিতেই অসহ্য যন্ত্রণায় সে থমকে দাঁড়িয়ে ভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে, একটা সুতোর মত ক্ষীণ রক্তধারা গড়িয়ে পড়ছে। হাতীর বাঁটের তীক্ষ্ণ আসগারী ছোরা আমূল বসে গেছে। নিখুঁত হাতের সাফাই কাজ।

আহত গুপ্তঘাতক শিউরে ওঠে।

একটি মুহূর্ত! হাতের মুঠো শিথিল হয়ে আসে। ধরা পড়বার উপায় নেই। জ্যান্ত মাটিতে গেড়ে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবে হয় মীরজাফর না হয় মীরকাশিম। গুপ্তঘাতকের ভীষণ শাস্তি সে জানে! মীরজাফরের দিকে এগোবার সামর্থ্য তার নেই; হাত থেকে খসে পড়েছে খঞ্জর।

শেষ জীবনীশক্তিটুকু সংগৃহীত করে সে ছুটলো সামনের ছাদের দিকে, ওপাশেই গঙ্গা। একমাত্র ওই পথই খোলা।

তার হাত থেকেই সংক্রমিত মৃত্যুর বীভৎস রূপ দেখে মণিবেগম কাঁপছে। একটা ডিভানের উপর এলিয়ে পড়েছে সে। পরিষ্কার দেখতে পায় মূর্তিটা ছাদ থেকে অসীম শূন্যেই লাফ দিল, পিঠে তখনও গেঁথে রয়েছে বেগমের আসগারী ছোরা, বহুদিন পরে সার্থক কাজে লেগেছে আজ।

গঙ্গার অতল তলেই বোধ হয় হতভাগার প্রাণহীন দেহের সঙ্গে গেঁথে পড়ে থাকবে ওটা, দিনের আলোয় ওর ইতিহাস আর কোন দিনই প্রকাশ পাবে না।

তবুও কাঁদছে মণিবেগম। অসহ্য উত্তেজনায় ঝড়ে কাঁপা বেতলতার মত কাঁপছে সে। নেশার ঘোরে মীরজাফর কি যেন অস্ফুট স্বরে হুকুম করছে। কিন্তু গদিচ্যুত নবাব নাজিমের সে হুকুম তামিল করতে আজ আর কেউ এগিয়ে আসে না।

মণিবেগমও দ্বিতীয় ব্যক্তি কারো কথা চিন্তা করে বের করতে পারে নি, যাকে বিশ্বাস করা যায়। এই বিপদে যার কাছে সাহায্য নির্ভর পাওয়া যেতে পারে। মীরজাফর কেমন অসাড় হয়ে গেছে, সমস্ত চিন্তাশক্তিতে এসেছে জড়তা। মণিবেগম বাধ্য হয়েই এগিয়ে এসেছে সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে।

গঙ্গাস্নান, প্রাতঃ পূজাপাঠ সেরে এসে নন্দকুমার বেগমসাহেবাকে তারই বাড়িতে আসতে দেখে অবাক হয়ে যান। সারা মুখে চোখে ভয়ের জমাট ছায়া, কণ্ঠস্বর কাঁপছে বেগমের।

গত রাতের কাহিনীটা বর্ণনা করে মণিবেগম। চোখের সামনে এখনও ভেসে ওঠে সেই খঞ্জর হাতে জীবন্ত মৃত্যুর অভিযান।

—একবার বাঁচাতে পেরেছি নবাবকে, ওরা ও চেষ্টা ছাড়বে না। মীরজাফরকে নিশ্চিহ্ন না করে থামবে না ওরা।

রুদ্ধ নিশ্বাসে মহারাজ কি যেন ভাবছেন। মীরজাফরের সেই দিনের ভুল আজও ক্ষমা করেননি তিনি। কিন্তু নিমক খেয়েছেন তার। ইংরেজের বিরুদ্ধে তবুও একটি মাত্র লোক আজও প্রতিবাদের ভাষা তুলেছে। বেগমসাহেবা ব্যাকুল কণ্ঠে আবেদন জানায়,

—মহারাজ, আপনি সাহায্য করুন। আজ ওঁর চারপাশে আর কেউ নেই। অসহায় নবাব আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

একদিকে ইংরেজের রোষ, অন্যদিকে আশ্রয়প্রার্থী নারী এবং অসহায় পূর্বতন প্রভু। ধর্ম এবং নিরাপত্তা দুদিকে যেন প্রবল আকর্ষণে টানছে। এ সময় মীরজাফরের সমূহ বিপদ, প্রাণ সংশয়, অন্যদিকে নিজের বিপদ। সমস্ত চিন্তাধারা তার স্তব্ধ হয়ে গেছে কঠিন দুস্তর কোন পরীক্ষার সামনে এসে।

মণিবেগম আজ কাতর কণ্ঠে অনুনয় করে,

—অভয় দেন মহারাজ। আপনার প্রতিভাকে ইংরেজ ভয় করে, মীর-কাশিম, রেজা খাঁ নগণ্য।

কিন্তু নিষ্কাম নিস্পৃহ নিরাসক্ত জীবন যাপন করতে চান তিনি। বাংলার সীমান্তে শ্যামলিমা ঢাকা ভদ্রপুরের বাড়িতে ফিরে গিয়ে আবার নিজেকে নিঃশেষে ফিরে পেতে চান নন্দকুমার। এই স্বার্থপর হিংসা লোলুপ জীবনে আসক্তি আর নেই। ঘৃণা ধরে গেছে এই পরিবেশের উপর।

—আমাকে ক্ষমা করো মা। আমি এসব পরিত্যাগ করতে চাই।

এগিয়ে আসে মণি; দুচোখে তার জল।

—বাংলায় কি একজনও মানুষ নেই মহারাজ, ইংরেজের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে? একজনও নেই অসহায় নারী এবং গদিচ্যুত নবাবকে আশ্রয় দেয়, সাহায্য করে? ধনদৌলত কিছু আছে আমার—

বাধা দেন মহারাজ—ধনদৌলতের প্রয়োজন আমার নেই বেগমসাহেবা। একাহারী ব্রাহ্মণ, একমুঠো আতপান্নের ব্যবস্থা আমার আছে।

—তবে ধর্ম! মনুষ্যত্ব! তার কি কোন দাবী নেই? সে কি ব্যর্থ হয়ে

কেঁদে ফিরে যাবে আপনার দরজা থেকে? মণিবেগম যেন মহারাজের মর্মে আঘাত করেছে।

চমকে ওঠেন মহারাজ! সত্য—ধর্ম! আশ্রিতজনকে বিমুখ করা মানবিকতার সবচেয়ে বড় পরাজয়, আজ ভাগ্য তাকে আবার সেই কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সামনে এনে ফেলেছে। দেবাসনের চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন স্থির দৃষ্টিতে, এ কোন সমস্যার সামনে ফেললে বাসুদেব! কেবল ত্যাগ আর পরীক্ষার বেড়া দিয়েই জীবনকে বিকশিত করবার সুযোগ দিয়েছো তুমি।

মনে পড়ে গীতার বাণী---

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

হে অর্জুন, তুমি সমস্ত কার্য আমাতে অর্পণ করিয়া তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্যই ভগবানের কার্য এবং এ সকল কার্যের ফল তাঁহারই, আমি তাঁহারই অধীন হইয়া কর্ম করিতেছি মাত্র, এই বিশ্বাসে নিষ্কাম দৃঢ়তেজা হইয়া কাজ কর। আজ এই চরম পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে মহারাজ আলো দেখতে পান। যুগ যুগান্তের সত্য নির্দেশ নতুন করে মহারাজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল। অন্ধকার নিবিড়েও পথের আলোক নির্দেশ দেখতে পেয়েছেন তিনি। স্থির নিষ্কম্প কণ্ঠে বলে ওঠেন,

—আমি চেষ্টা করবো বেগমসাহেবা! আমার দুর্বলতার জন্য মাপ করবেন।

মণিবেগমের কণ্ঠে আশার সুর—সাহায্য পাব একমাত্র আপনার কাছেই, এ বিশ্বাস ছিল মহারাজ। মনে হয় মুর্শিদাবাদ আর নিরাপদ নয়, কলকাতাতেই যাবো আমরা।

কি যেন ভাবছেন মহারাজ, বলে ওঠেন—সেই ভাল। হয়তো এই অবিচারের প্রতিকার সেখানে হতে পারে।

—ক্লাইভ আসছেন শুনলাম। মণিবেগম সংবাদটা দেয়।

চমকে ওঠেন মহারাজ—এ সংবাদ আপনি কোথায় পেলেন?

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলো মণিবেগম, কাল রাত্রে কাশিমবাজার কুঠিতে শুনেছিল কথাটা; সে খবর চেপে গিয়ে বলে—এমনিই, কানে এল।

অন্য কোন প্রশ্ন করলেন না মহারাজ, বেগমের তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে বিস্মিত হয়েছেন তিনি। এত দিন যেন ওকে চিনতেই পারেন নি মহারাজ।

মীরজাফরের ধনদৌলত দেখে মণি স্তম্ভিত হয়ে যায়। এত দৌলত জীবনে কেন স্বপ্নেও কোন তওফাওয়ালী কোনকালে দেখেনি। মীরজাফর আজ সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে মণিবেগমের হাতে, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হতাশ সে। যে সিংহাসন, যে বাংলার মসনদের জন্য জীবনে সবচেয়ে বড় অকাজ সে করতে সাহসী হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যই আজ তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। বার বার আজ অতীতের কথা মনে পড়ে।

—বাংলার মসনদের উপর সিরাজের অভিশাপ আছে মণি!

কথা কইলো না মণি, মীরজাফরের দিকে নীরবে চাইল। কাল রাত্রের সেই পানাসক্ত চেহারার ছাপ তখনও মুছে যায় নি। পাথরের ভৃঙ্গায় তখনও রয়েছে টলটলে রাঙ্গা পানীয়। মুখ চোখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। সামনে মূর্তিমান জীবন্ত হতাশা, পাপ আর গ্লানি। যেন আর্তনাদ করছে জাফর আলি খাঁ। সিরাজ বিষিয়ে দিয়ে গেছে ওর সমস্ত সুখশান্তি।

মীরণ গেল। আমিওযাবার পথে। মীরকাশিম গদিতে বসেছে—সেও যাবে। জানি না আরও কত হতভাগার নিঃশ্বাস উঠবে সেখানে—খোদা! তুমি কি মেহেরবান নও!

মণিবেগম আপন মনে কয়েকটা সিন্দুক খুলতে ব্যস্ত, কলকাতা যাবার আয়োজন করছে তারা। টলতে টলতে এগিয়ে আসছে দীর্ঘ মূর্তিটা কয়েকটা বড় বড় চর্মপেটিকা সিন্দুকের দিকে। প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করে মীরজাফর।

—খুলো না। বিষ, জমাট বিষ আছে ওতে। তোমার জীবনও বিষিয়ে তুলবে বেগম।

অবাক হয়ে গেছে মণি। সাতরাজার ধন। এত হেলাফেলা অপব্যয় চুরি করেও ইংরেজ এখনও নবাবের সম্পদের প্রকৃত সন্ধান পায় নি। চামড়ার পেটির ভিতর জলজল করছে রক্তলাল মণিগুলো মৃত্যুনীল আভায়। ঝকমক করে সূর্যের মত তীব্র দীপ্তিতে। স্বপ্নাবিষ্টের মত দাঁড়িয়ে আছে মীরজাফর। ওই সম্পদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মৃত সিরাজের অভিশাপ, রক্তমাখা দীর্ঘশ্বাস।

হীরাঝিলের প্রাসাদে সিরাজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ওগুলো। তারা লুট করেছিল দস্যুর মত সেই গুপ্ত রত্নাগার। নবকৃষ্ণ, রামচাঁদ, আমীর বেগ খাঁ

আর মীরজাফর সেই রত্নাগারের সন্ধান পেয়েছিল। নবকৃষ্ণ ধূর্ত, সে বেশ দাঁও মেরেছিল। তাদের সেই সম্পদ হয়তো সহ্য হয়েছে; কিন্তু মীরজাফর আজও শিউরে ওঠে ওই রক্তমাখা দৌলত দেখে। এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা, বত্রিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, দুই সিন্দুক স্বর্ণপিণ্ড, চার বাক্স জহরত, হীরার অলঙ্কার, দুই বাক্স অখচিত পান্না। কোন রাজার রাজকোষেও এত সম্পদ থাকে না। ওদের সামান্য কিছু দিয়ে মীরজাফর নিজের ভাগের জন্যই রেখেছিল।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে মণি, দিনের আলো জাফরির ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে, থর থর করে কাঁপছে মীরজাফর; মুখ চোখ তার বিবর্ণ রক্তশূন্য হয়ে গেছে।…চোখের সামনে ফুটে ওঠে সিরাজের অন্তিম আর্তনাদ! রাজপথে উন্মত্ত জনতার কোলাহল ছাপিয়ে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ কক্ষে মীর-জাফরের কানে আসছে। হাতে তার রক্তের আভা। টপ টপ করে ঝরছে যেন তাজা খুন।

পড়ন্ত সূর্যের শেষ আলো লুটিয়ে পড়েছে কার্পেটে, চারিদিকে সেই রক্তাভা।

—মণিবেগম! আর্তনাদ করে ওঠে মীরজাফর।

দগদগে বিষাক্ত ঘায়ে ভরে উঠছে ওই পাপীর দুটো হাত, কেমন যেন পঙ্গু হয়ে আসছে। চোখ বুজে আসে অসহায় আর্তনাদে। মণিবেগম এসে ওর পতনোন্মুখ দেহটাকে ধরে শুইয়ে দিল একটা ডিভানের উপর। আর্তনাদ করছে মীরজাফর,

—রক্ত! তাজা রক্ত লেগে রয়েছে হাতে মণি, ওই দৌলতের নীচে আছে সিরাজের মুণ্ডহীন শব। দেখছো আমার দুই হাতের কব্জি অবধি কি বিষাক্ত রক্তমুখী ঘা!

অবাক হয়ে যায় মণি—এসব কি বলছেন জনাব! কই, কোথায় ঘা?

—আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো না। সিরাজী দাও। বেহুঁশ হতে দাও আমাকে।

স্থির অচেতন হয়ে আছে দেহটা। ওর হাত থেকে মদের পাত্রটা নিয়ে উঠে এল মণি।

গঙ্গার পূর্বতীরে সুতানটীতে সবে দিনের আলো ফুটে উঠেছে। কাঁচা রাস্তার দুদিকে বট অশ্বত্থ গাছের জটলা, মাঝে মাঝে পানাভরা ছোট পুকুর। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে গরুর গাড়ি, পালকি।

কেল্লার ঘাট থেকে শুরু করে উত্তরে সুতানটীর ঘাট অবধি ছোটবড় নৌকা থেকে স্লুপে মাল খালাস হচ্ছে। কোম্পানির সাহেবরা ঘোড়ায় চড়ে কোথাও বা ঘোড়া ছেড়ে পিপে, নানান মালপত্র, নুনের পসরা খালি করাচ্ছে। খিস্তী খেউড়ের রং জমেছে। ঘোড়ায় পা ঠুকছে কলকাতায় ঘাটের ধারে। মালবোঝাই হচ্ছে বিলেতগামী জাহাজে। রেশম, তুলো, পাট, আরও কত কি সম্পদ! বাংলার বুক থেকে লুটেরার দল মাল পাঠাচ্ছে দেশে।

ঠেলাগাড়ির ঘটঘট শব্দ. পিপে গড়ানোর গুরু গুরু আওয়াজ, গাঁজার ধোঁয়ায় গঙ্গার ঘাটের কর্মব্যস্ততা বেড়ে গেছে।

প্রথম দেখলো মণিবেগম কোম্পানির শহর কলকাতা। মীরজাফর চেয়ে রয়েছে অবাক হয়ে। সিরাজের কলকাতা আর আজকের শহর! কোথায় একটা বিরাট ভাঙ্গাগড়া ঘটে গেছে। কিল্লার মাথায় নিশান উড়ছে, লাল সিংহ আঁকা নিশান। হাওয়ায় পত পত করে কাঁপছে। গোরার প্রাধান্যও চোখে পড়ে গঙ্গার ধারে। কয়েকজন কুলিকে একটা গোরা ঘোড়ার চাবুক দিয়েই বেদম পিটছে। সরে যাবার নাম করে না কুলিগুলো, সাহেবের জুতো শুদ্ধ পা ধরে ক্ষমা চাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে।

দিনের আলো আর কর্মকোলাহল ছাপিয়ে বেগমের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি রাতের নগ্ন দৃশ্য। সেও অমনি ব্যাকুল হয়েই ছুটে গিয়েছিল এক মামুলী গোরার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্যই; কিন্তু নির্দয়ভাবে অপমানিত হয়ে এসেছে সে। ওদের প্রাধান্যই টিকে গেছে।

ওই চাবুক পিটোনোর দৃশ্য আজ তার কাছে নতুন নয়। শুধু রকমফের মাত্র, চাবুকটা তার পিঠেই নয়, মনেও গেঁথে আছে। চাপা ক্ষোভে ঠোঁট কামড়ে থাকে বেগম। তার জবাব দেওয়া হয় নি।

কলকাতা; ইংরেজ সভ্যতার প্রথম প্রাণকেন্দ্র গড়ে উঠেছে সুতানটী, কলকাতা আর গোবিন্দপুর এলাকায়। চিৎপুরের ডাকাতে কালীবাড়ির দুপাশে থমথমে নির্জনতা। দু'একজন পথচারি আলোয় আলোয় চলাফেরা সারে। সুতানটীতে ছোটবড় বাড়ি উঠেছে। কোম্পানির খাতাঞ্চি, বেনিয়ানের কর্মচারী, মুৎসুদ্দির দল এখানে বাস গেড়েছে। গঙ্গার ধার থেকে পালকি হাঁকিয়ে আসবার সময় মণিবেগম কি যেন ভাবছে! ইংরেজের ব্যবসা আর আজকের আমদানি রপ্তানিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছে শহর। হঠাৎ রাস্তা সাফ হয়ে যায়। সামাজিক পদমর্যাদার মাপকাঠিও ইংরেজের কৃপার

উপর প্রতিষ্ঠিত। জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে নবকেষ্ট সদর্পে চলেছে। বাঙালীদের মধ্যে সেই এ অধিকার পেয়েছে। কোম্পানির হৌসে মাত্র একষট্টি তঙ্কার কর্মচারী। ফারসী ভাষায় পণ্ডিত, খাস হেস্টিংসকে ফারসী শেখাচ্ছে, তা ছাড়া অনেক কিছু করে। তারই জুড়ির ঘোড়ার দাপটে রাস্তা কাঁপছে। চোগা-চাপকানধারী বরকান্দাজ সহিস হাঁক পাড়ে,

—হুঁশিয়ার।

মীরজাফর আলি খাঁ দেখে! হ্যাঁ, কতদিনের পরিচিত নবকেষ্ট; কিন্তু জুড়ি দাঁড়াল না। একবার কৌতূহলী মুখে পাল্লার মাথায় ঝুলন্ত বাদলাগোটার বুটির ফাঁক থেকে নজর দিয়ে কি দেখলো মাত্র; আজ মীরজাফর যেন মরে গেছে। মণিবেগম রুদ্ধ আক্রোশে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে কি যেন অপমান সহ্য করলো।

সামান্য একজন কর্মচারী সুবে বাংলার নবাবের পালকি রুখে দিয়ে তার নাকের উপর দিয়ে জুড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল!

কিন্তু বলবার কিছু নেই। মুর্শিদাবাদের দিন ফুরিয়েছে। মহারাজা নন্দকুমারও নীরবে দৃশ্যটা দেখলেন মাত্র। এ এলাকায় নবকেষ্টর অসীম প্রতাপ। উত্তর ভাগের বহু জমি তার এলাকাভুক্ত, দাদন-সুদী-কারবারও চালাচ্ছে চুটিয়ে, কোম্পানির চোরা ব্যবসার মুনাফা তো আছেই। টাকা উড়ছে এখানে, যে যেমন পারে ধরে নিচ্ছে। নবকেষ্টও বাদ যায় নি।

চার বেহারার পালকি চলেছে। সাদামাটা ভাড়াটে পালকি, জরিসলমার কাজকরা চাঁদোয়াও নেই, চকচকে বার্নিশও উঠে গেছে কবে। বেহারাদের উর্দি-আচকানের বালাই নেই। রোখমেজাজে হুম্ হুম্মো আওয়াজ বের হয় না। বেগমসাহেবা চলেছে নীরবে, আস্ফালন ঘোষণা, সম্পদের প্রাচুর্য আর নেই। রাস্তার লোকজন ফিরেও চায় না। অপরিচিত কোন রাহী তারা, নগরে এসেছে আশ্রয়ের আশায়।

—বেগমসাহেবা!

মহারাজের ডাকে চমক ভাঙলো। ময়দাপটিতে একটা সাদামাটা বাড়ির সামনে থেমেছে পালকি। আপাতত এই তার প্রাসাদ, বেগমমহল শিশমহল সব কিছু।

মীরজাফর নীরবে গৃহপ্রবেশ করলো সন্ধ্যার অন্ধকারে।

চকবাজারের গঞ্জে নিতাব শেখের আমের দোকান। আম ফলসা আনারস আরও হরেকরকম দিশী মেওয়ার কারবারি সে। মেহেদি রং-করা দাড়ি হালকা বাতাসে ফিনফিন করে ওড়ে; গিলে-করা ঢিলে নয়ন সুখের ঘুন্টিদার পাঞ্জাবিতে মানায় চমৎকার। চোখের কোলে সুর্মার কালো গভীর দাগ। নিতাব শেখের খেয়াল ফল বিক্রি করেই খতম হয় নি, চকের সীমানার বাইরে কাঠরার নহরের ধারে বিস্তৃত বাগান নিজের খাসে; দিনের বেশি সময় কাটে সেইখানেই।

এ যেন তার এক নেশা। ল্যাংড়া বোম্বাই ফজলী তিন কিসিমের জাত আমগাছে বাগানকে মনোমত করে গড়ে তুলেছে। যেমনি যত্নে রেখেছে গাছগুলোকে তেমনি ফলনও দেয় তারা। মরসুমের সময় ছোট ছোট কলমের গাছগুলোর পাতা দেখা যায় না, ফলের ভারে নুয়ে আসে, বাঁশের ঠেকা দিয়ে ডালগুলোকে তুলে রাখে।

মুকুল আসবার আগে থেকেই নিতাব শেখ বাগানের প্রতিটি গাছের গোড়ায় সার ও জল দেয়, দিনের অধিকাংশ সময় বাগানেই থাকে।

জিজ্ঞাসা করলে বলে—বাপ্ জান, মা হবার আগে মেয়ে যেমন সেজেগুজে খুব সুরৎ হয়ে ওঠে, গাছগুলোকে তেমনি তেজী জোয়ান করে রাখতে হয়। বুঝলা নি, ওরাও বেগমের জাত, বাঁদীর ধাত নয়। বড়ই আয়েশী।

এক গাছের ডাল অন্যগাছের সঙ্গে একত্রিত করে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সে নতুন এক ধরনের ফল তৈরি করতে শিখেছে; নিস্ফলা গাছের গুঁড়িতে গোঁজ পুরেও দেখেছে—সে গাছে দেদার ফল আসে; গুঁড়ি চেঁছেও ফল পেয়েছে।

চকবাজার কেন, এদিকে কলকাতা ওদিকে কাশিমবাজার-বর্ধমান-নাটোরের রাণীভবানীর সীমানা অবধি তার আমের নাম ডাক। বাঁদী ক্ষেপে ওঠে,

--সারাদিনই চড়া ধুপে বাগানে ঘুরবা মিঞা?

নিতাব শেখ ফলন্ত গাছের গুঁড়িতে হাত বুলিয়ে বলে—মেয়ের রূপ দেখেছিস্ বিমলী। নিজের হাতে তৈরি করা মেয়ে এরা, এদের ভরজোয়ানী দেখে নিজেই তাজ্জব বনে যাই।

বিমলী ফিক্ করে হেসে ফেলে,

—আ মরণ! গাছের আবার ভরজোয়ানী! তোমার মাথা খারাপ হবে এইবার মিঞা।

নিতাব শেখ বোম্বাই আমের কলম থেকে কম বেশি বিজাত আম মিলিয়ে ফলের কম মিষ্টি, টক স্বাদ তৈরি করার কথা ভাবছে। চেষ্টাও করছে তাই নিয়ে।

বলে—বুঝলি বিমলী, এক চাল থেকে ভাত, মুড়ি, পায়েস, পোলাও, বিরিয়ানী, ঘি-ভাত হরেক চিজ হতে দেখেই এও আমার মগজে ঢোকে। দেখ না, এক বোম্বাই আম, তাতে ভিন্ন ভিন্ন বিজাত আমের চারা জোড় কলম করেই বেগমপছন, রাণীপছন, আলফ্রান্সো. দিলসাদার্ কেন হবে না? স্বাদ মেজাজ প্রত্যেকেরই আলাদা।

একটা নতুন গাছের ফল তৈরি হয়েছে। কালো উপরের ছিল্‌কি, কাটলেই ভিতর থেকে রক্তলাল সরস আভা বের হয়।

—দেখ, প্রথম গাছের ফল!

বিমলী মুখ ঝামটে ওঠে—বেগমদিকে চাখ্‌তে দাওগে, বাঁদীকে কেন? তার জিভের কি তার আছে?

কি যেন ভাবছে নিতাব শেখ; বিমলীকে কেন জানে না ভাল লাগে তার। ক্যাঁটকেঁটে কথা, রূপও তার নেই, আছে ভরজোয়ানী। দুপুরের এক-ফালি রোদ গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে বাগানের নীচে ওর মুখের উপর।

সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে কানে আসে মৌচন্দনা পাখির ডাক। নিতাব শেখ যেন স্বপ্ন দেখছে।

—বিমলী! নিতাব শেখ কাছে টেনে নেয় তাকে

বিব্রত হয়ে ওঠে বাঁদী মিঞার দমকা সোহাগের ঠেলায়। হাঁপিয়ে উঠেছে সে। নির্জনতার মাঝে আত্মভোলা নিতাব আজ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদ কেন, সুবে বাংলার বিখ্যাত খেয়ালী আম বাগিচার মালিক আজ বাঁদীর সামনে প্রেম নিবেদন করতে চায় ব্যাকুল ভাবে।

—মিঞা, বেহোঁশ হলে নাকি? লুটিয়ে পড়ে বিমলা খিলখিল করে হেসে।

সরে দাঁড়াল শেখজী; মুহূর্তের ভুলের জন্য যেন নিজেই লজ্জা পায়।

বিমলী হাসছে—মরা ডালে ফলের খোয়াব দেখে মেতে উঠেছো মিঞা?

নিতাব শেখ বলে ওঠে—সেই ভালো বিমলী; আমাদের জ্যান্ত ফলের খোঁজ কেউ রাখতো না। হাজার মানুষের ভিড়ে তারা গোরে যেতো; কিন্তু যা ফল বানিয়ে যাবো বিমলী, তোর আমার মরণের পরও তামাম বাংলা

যতদিন থাকবে ততদিন মুর্শিদাবাদের আমের ইজ্জৎ, খানদান এক চুলও কমবে না।

বিমলী এগিয়ে এসেছে, ফলন্ত বাগানে থোকা থোকা ঝুলছে বিচিত্র আকারের বর্ণের আম। হলদে, লাল, কোনটা বা কালো। বৈশাখের খর রোদ বাগানের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাসে স্বপ্নালু নেশা আনে ; তন্দ্রা আনে দুচোখে।

—এ আমের নাম দিলাম বিমলী ! শেখজী বলে ওঠে।

হাসে বিমলী—আ মরণ, এ যে কালো পোড়াহাঁড়ির তলার মত ভুরকুণ্ডী কালো।

—হোক না কালো। ভিতরে এর ঠাণ্ডা মিষ্টি অফুরান তাজা রস। পেটও ভরবে, দিলভি তর হবে। মুর্শিদাবাদ বাগিচার সেরা আম।

বিমলী যেন খুশির আমেজে চঞ্চল হয়ে ওঠে। আধপাগল লোকটিকে টেনে নিয়ে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া না করালে আরও কতক্ষণ গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরবে কে জানে। নেশায় পেয়ে বসেছে এই বাগিচার সখ, নতুন গাছ করার সখ ওদের গোষ্ঠীতে ওর বাবার আমল থেকেই।

সিরাজই তাকে প্যার করতো। ওমর শেখ প্রথম বাগিচা করে তাতে নিজের পছন্দ মত আম তৈরি করে নবাবকে ভেট দেয়। গাছপাকা আম তুলো-পাতা টুসিতে করে পাড়া হয় ; ডাল দুলিয়ে গাছ আর আম জখম করা বে-আইনী। একবার মাটিতে পড়লেই ওই সরমী আমের দিল জখম হয়ে যাবে। নিজের হাতে পেড়ে নিয়ে গিয়ে ছিলকী ছাড়িয়ে বোঁটায় মধু লাগিয়ে তুলোর আস্তরণের উপর রাখতে হবে একঘণ্টা এ পাশে, আর একঘণ্টা ওপাশে। মাঝে মাঝে শুখোবার জন্য পাখার হাওয়া লাগানো দরকার ; তবে সুন্দর তৈরি হবে। কাটবার সময় সন্তর্পণে ছুরি বসানো দরকার, নিখুঁত ভাবে চাকু চালাতে হবে যেন আমের আঁটিতে ছুরি না লাগে, লাগলেই সে আম হবে বেইজ্জুতি।

নবাব সেদিন এক টুকরো আম মুখে দিয়েই অবাক হয়ে যান, আম না অন্য কিছু ফল ঠিক করতে পারেন না।

সেলাম করে দাঁড়াল ওমর শেখ—জোড়কলমে তৈরি নয়া কিসিমের আম হুজুর, বান্দা বাগিচায় জাঁহাপনার জন্য বানিয়েছে। নবাব পছন্দ।

তারিফ করেন নবাব, হাজার তারিফ। আশরফি-শিরোপা, লালকাশ্মীরী দোশালাও ইনাম দেন তাকে।

বাবার সেই বিদ্যাকে আয়ত্ত করে আরও বাড়িয়েছে নিতাব শেখ। কোহিতুর, দিলসাদার, বীরা-কালাপাহাড়, বিমলী আরও কত আম তৈরি করেছে। পেয়ারাফুলির কলম বানিয়েছে আম ও পেয়ারার সঙ্গে মিশ খাইয়ে। চোকলা তুলে বানিয়ে দিলে বোঝা যাবে না আম না পেয়ারা, আনারস আছে —তেমনি বিচিত্র স্বাদ, কুইন আনারসের মিঠে·গন্ধে ভরে যাবে চারিদিক। আজ হতাশ হয়েছে নিতাব শেখ।

—কিন্তু সেই সমঝদার নেই বিমলী।

নবাব সিরাজ নেই ; তবু মীরজাফরও ছিল। মণিবেগম তারিফ করতো তার আম। মীরজাফরও আজ মুর্শিদাবাদ ছেড়ে গেছে, নবাব হয়েছে মীরকাশিম, এদিকে নজর দেবার সময় তার নেই। মুর্শিদাবাদ ছেড়ে সেও মুঙ্গেরে পাড়ি জমাচ্ছে। চারিদিকের হাওয়া বদলে গেছে।

—কেন কোম্পানির সাহেবেরা ?

বিমলীর কথায় হেসে ফেলে নিতাব শেখ—ওরা নবাবী আমের কদর কি বুঝবে বিমলী ? জিভে মিঠে ঠেকল, পেট ভরলো ব্যস। সেই-ই আম। চকের পঞ্চাশ কিসিম আমের পঞ্চাশ রকম মেজাজ, পঞ্চাশ রকম নিখুঁতি তার গোরার জিবে মালুম হবে ? ছ্যাঃ।

আপশোশ করে শেখ , মুর্শিদাবাদের সেই গৌরবময় দিনগুলো কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। এই নিখুঁত শিল্পের তারিফদার ক'জন আছে আর ?

ইমামবাড়ার ঘাটের ধারে বাঁধানো বট-বকুলের জটলা। গঙ্গার হাওয়ায় কাঁপছে শিরশিরে পাতা। কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলে আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে, পাকা লিচুর গায়ের মত ঘোর ঘন লাল আমেজ।

শহরের বাউণ্ডুলে ছেলে যুবার দল হুল্লোড় করছে। মুর্শিদাবাদের জীবনযাত্রায় একটা ঢিলেঢালা ভাব এসেছে। জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ খালি। রিয়াসতের কাছারি, সদরউল্ হকের সেরেস্তায় আর ভিড় জমে না। মীরকাশিম রাজধানী তুলে নিয়ে গেছে মুঙ্গেরে। মুর্শিদাবাদ পরিত্যক্ত নগরীর মত পড়ে আছে। রোশনীবাগে আর আলোর বর্ণচ্ছটা খেলে না, ইমামবাড়ার ফটকে থেমে গেছে নহবত। চকবাজারের কারবারীরাও একটু চমকে উঠেছে। আমীর-ওমরাহ, ফৌজী লোক—কর্মচারীর দলই কাঁচা পয়সার লেনদেন

করতো, তাদের চলে যাবার পরই সব জাঁকজমক জৌলুস থেমে গেছে। কাশিমবাজার থেকে কিছু গোরা সেপাই এসে তার ঠাঁই নিয়েছে, কিন্তু তারা পয়সা দিয়ে বিশেষ জিনিসপত্র কেনে না, লুটের মৌকা খোঁজে।

তাছাড়াও ব্যস্ত তারা, মীরকাশিম পাটনার কুঠি লুঠ করেছে। গোরা লোকজন সেপাই হত্যা করেছে অনেক। টাকার জন্য জগৎশেঠের গদি লুঠ করতেও দ্বিধা করে নি। ধ্বংস করেছে তাদের। নৌকা নৌকা ফৌজ চলেছে, টেনে তুলছে বজরায় বড় বড় ভারি কামানগুলো। শহর ছেড়ে তারা এগিয়ে চলেছে।

—ক্যা বে, আভি স্থবে বাংলাকা নবাব তু বন যা।

এক ইয়ার কানে গাজীপুরী আতরগোঁজা অন্য দোস্তকে বলে ওঠে।

দোস্ত কি যেন ভাবছে। নবাব না বন্ধুক অন্য একটা কিছু বনা যায় না কি এই মৌকায় তাই ভাবছে। বন্ধুর কথায় বলে ওঠে ইয়ার জঙ্গ,

—তব বেগম তু বনেগী।

—বেগম বহুৎ মিলেগা জনাব।

বেগমের অভাব থোড়াই। সারা বিবিমহল আজ বেওয়ারিশ পড়ে আছে। টিকে আছে অক্ষত অব্যয় অবস্থায় খোজা পিক্রর কারবার আর কর্মচারী বলতে রেজা খাঁ। বেগমমহলের সেরা বিবি দিলজান, দিলখোসের ঝাঁকের কথা ভাবছে ইয়ার জঙ্গের দোস্তরা। রংবাহারের বিবি মহলের খোয়াব দেখছে তারা।

কে যেন বলে ওঠে দোস্তদের মধ্যে।

—ফৌজে যাবি ?

—ধ্যাৎ, কাঁহাতক ঝুটমুট জান দিতে যাবো বাবা! তোফা খাচ্ছি দাচ্ছি; গোরাকে বাবা বলছি আর বিবিমহলে নাচের মুজরো দেখছি। স্থখে থাকতে কি ভূতে কিলোচ্ছে, যে মরতে যাবো ?

গঙ্গার ধারে বকুল তলাতেই খুলেছে তারা ফরাসী মদের বোতল,

—পিক্র বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক কোম্পানি।

গলার কাছে ঝাঁঝালো পানীয় ঢেলে দেয় একজন।

—মৌলভী সাহেব বলেছিল বিদেশী সরাবে গোনাহ হয়।

—কে ? ইয়ার জঙ্গ গর্জে ওঠে—ধুত্তোর, বেশি ট্যাফুঁ করলে ধরে আনবি সেই মৌলভীকে, দোব একদিন গলার কাছে এক বোতল উপুড় করে।

মদের নেশা আর মাংসের ক্ষুধা, নারী মাংসের ক্ষুধা জারিয়ে তুলেছে সারা

মুর্শিদাবাদের আগামী জীবনকে। বিবিমহলের ফটকও খোলা, দরকার কিছু অর্থের। তাহলেই সব মিলবে।

গঙ্গার বুকে সন্ধ্যা নেমে আসছে। বইছে আমেজী দখিন হাওয়া, নেশার গোলাপী আমেজে মন ভরে ওঠে।

—ইয়ার জঙ্গ!

কে একজন সঙ্গী আঙ্গুল দিয়ে দেখালো, একখানি সওয়ারী নৌকা একা চলেছে। মালপত্রও কিছু আছে তাদের সঙ্গে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা নিশ্চিন্ত মনেই চলেছে।

ওদের শয়তানি বুদ্ধি খেলে যায়; একটা নৌকাতে উঠে পড়লো তারা। ওটাকে দেখে মনে হয় হিন্দুর সওয়ারী নৌকা; পিছু নিল সন্তর্পণে, মুর্শিদাবাদের সীমানা ছাড়িয়ে কুঞ্জঘাটার মধ্যে আর কোন বসতি বিশেষ নেই; তার আগেই সন্ধ্যার ওই আবছা অন্ধকারে তারা চড়াও হবে নৌকায়, মাঝে মাঝে এই বিদ্যাও ধরেছে তারা। দরকার পড়লে দু'একটা খুনখারাপি করে বসে। বিবিমহলের শতরঞ্চ খেলার খরচাও যোগাড় করে এইভাবেই।

—যদি নালিশ করে?

ইয়ার জঙ্গ অভয় দেয়—চাচা হ্যায় না?

রেজা খাঁয়ের দূর সম্পর্কের ভাইপো, লতায়-পাতায় জড়ানো সম্বন্ধ। হোক না তবু তার বিরুদ্ধে নালিশ কোনদিনই টেকে নি। কত কাণ্ড সে নির্বিচারে করে আসছে, শহরের সুপরিচিত স্বনামধন্য মহম্মদী ইয়ার বেগ জঙ্গ সে; এক ডাকে শিউরে ওঠে সকলে।

ইয়ার দোস্তি মহলে ইয়ার জঙ্গের খুব খাতির। শহরের যত কুখ্যাত গুণ্ডা বদমাশ তার হাতের মুঠোয়। তাদের একমাত্র আশ্রয় ওই ইয়ার জঙ্গ।

মুর্শিদাবাদ আজ নীরব আতঙ্কে ভরে উঠেছে। ব্যবসায়ীরাও সাঁঝবাতি জেলে দোকান বন্ধ করে। কে জানে কার উপর কে চড়াও হবে এখুনি।

দরবারে এর কোন বিচার নেই; মীরকাশিমকে নিয়েই বিব্রত হয়ে উঠেছে কোম্পানির ফৌজ। বাংলা স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখছে সে; মুঙ্গেরে বসে কোম্পানির আসন টলিয়েছে।

রাতারাতি ফৌজ চলেছে গঙ্গার বুক বেয়ে, ছাপঘাটির মুখে পদ্মার বুকে উজানে চলেছে নৌবহর সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। অদূরে রাজমহলের খাড়া পাহাড়, কালো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে গুপ্তপ্রহরী; বাংলা বিহার কেঁপে

উঠেছে। কাঁপছে ইংরেজ মীরকাশিমের দাপে। সামান্য কিছু অর্থ সোনা-দানার বদলে এমন সর্বনাশ ডেকে আনবে তারা এ কল্পনাও করেনি।

কলকাতার আকাশ বাতাসে পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে। বাবু, হৌসের মুৎসুদ্দি থেকে শুরু করে কালা কর্মচারীর দল দুহাতে পয়সা কামাচ্ছে। অপচয়ের দিকটাও তৈরি হতে দেরী হয় না। মদ আনুষঙ্গিকের ছড়াছড়ি এখানের সর্বত্র।

গাড়ি ঘোড়া লোনা পানি, আউর রাণ্ডিকা ধাক্কা হ্যায়।
এস্‌মে যো বঁচে মোসাফির, মৌজ করে কলকাত্তা হ্যায়।

মাটি ফুঁড়ে বাবুর দল গজিয়ে উঠেছে। নবকৃষ্ণ, নবুধর, গোবিন্দ মিত্র, নন্দরাম সেন ইত্যাদি অনেকেই তখন কলকাতার সমাজের মাথা। আতর দিয়ে ঘর বারান্দা ধোয়া হয়, অম্বুরী তামাক পোড়ে রাশ রাশ, ইয়ার দোস্তি নিয়ে হৈ-চৈ বসে। কলকাতা এলাকায় এন্তার পয়সা রোজকার করে, কিন্তু বিলেতী সমাজে তাদের আর কোন অধিকাব নেই। পয়সার গুমোরটা তাই বাইরের সমাজেই দেখাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সবাই।

প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে

—খুড়ি তুড়ি জস দান
আখড়া বুলবুলি মানিয়া গান
অষ্টাহে বনভোজন
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।

বাবুর পর্যায়ে উঠতে গেলে এই নটি গুণে ভূষিত হতে হবে। চারদিকে তাই অযথা পয়সার ছড়াছড়ি।

হাটখোলার মাঠে বুলবুলের লড়াই চলেছে। বাবরি চুল, আদ্দি নয়ন-সুখের হাঁটুঝুল পাঞ্জাবি, কোঁচানো কালো ইঞ্চিপাড় ফরাসডাঙ্গার ধুতি, লাল লপেটা পায়ে জমা হয়েছে খোলা মাঠে। বাবুদের হাতের দাঁড়ে শিকলী বাঁধা বুলবুল, তেল চুকচুকে কালো রং, মাথায় রাঙা টুকটুকে ঝুঁটি। বাবুদের ভিড়ের একপাশে মদের ফোয়ারা ছুটছে। ভিড় করে দাঁড়িয়েছে কুটনী নষ্টা মেয়ের দল, পান চিবুচ্ছে আর পিচ্ পিচ্ করে পিক্ ছিটোচ্ছে চারপাশে।

কে যেন রসিকতা করে—রক্তখাগী মা।

—আয়না মুখপোড়া।

মুখপোড়াও তৎক্ষণাৎ ভিড়ে উধাও হয়ে যায়। বেনেদের কর্তাবাবু এসেছেন, নামলেন জুড়ি থেকে ; বুড়োর কদমছাট পাকা চুলে কলপের তামাটে আভা, মোমমাজা গোঁপ চিকচিক করছে ; হাতে রূপোর মকর মুখো ছড়ি, কোম্পানির হৌসে সরকারের খাতানবিশ, অঢেল পয়সা ; পিছনে নামছে এক-গা সোনার গহনাপরা উটকো মেয়েমানুষ। বনেদী ঘরের খানদানী চাল। মেয়েমানুষের হাতে রূপোর কাজকরা পানের ডিবে। বাবুর চোখ লাল, গায়ের ভুরভুরে আতরের গন্ধ ভেদ করে উঠছে বিদেশী মদের তাজা খোসবু।

পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। ওদিকে ঝটপট বুলবুলি উড়ছে, বাবরি চুল নেড়ে দু-আঙুল মুখে পুরে শিস দিচ্ছে ভেরুয়ার দল।

ভিড়ের মধ্যে গোকুল সোনারের বোন কাদম্বিনী এসেছে। ন বাবু জুড়ি থামিয়ে নেমেছে : হালফিল ধনী। কোম্পানির ঘরে মান-খাতির আছে। রাতের অন্ধকারে তার জুড়িতে অনেক রকম সজীব ভেটও নাকি চালান হয় সুতানটীর সাহেবদের কুঠিতে, রাতের শেষে আবার ফিরে আসে দু-ঘোড়ার জুড়ি।

হঠাৎ ন বাবুর চোখ পড়লো ওদিকে, একটা কামরাঙ্গা গাছের কালো গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি ফর্সা টকটকে মেয়ে। দোহারা নিটোল গড়ন। একতাল মাখন দিয়ে কে যেন তৈরি করেছে প্রতিমা। পরণে লাল পাছাপেড়ে শাড়ি, ভারি কোমর ঘিরে দেখা যায় সোনার গোটগাছটা। হর্তেলের মত চিকচিকে সুন্দর রং ; কালো কামরাঙ্গা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে উৎসুক চোখে বুলবুলের লড়াই দেখছে। মাজা দুলিয়ে নাচছে দত্তবাবুর মোসাহেবদল, কলুটোলার শীলেদের বুলবুল উড়ে গেছে হেরে যাবার ভয়ে ; হাসছে মেয়েরা ; কাদম্বিনীও ঠোঁটে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে, মিষ্টি ঝিলিক মাখা হাসি, সঙ্গীর গা টিপে বলে ওঠে,

—মরণ দেখ না মিনসের। এই দিকে চেয়েই মাজা দুলোচ্ছে। মনে হয় ক্যাঁৎ করে এক লাথি মারি।

পাশ থেকে কে বলে ওঠে—তাই মার না চাঁদ, ধন্যি হয়ে যাই গুষ্টিশুদ্ধ।

সরে গেল কাদু। ন'বাবু চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। মোসাহেব পদ মল্লিকের সন্ধানী চোখ। বাবুর কাছে এসে ফিসফিস করে বলে ওঠে,
—খোঁজ নোব ?

ঘাড় নাড়ে ন'বাবু। অঢেল কাঁচা পয়সা, অমনি ভেট যোগাতে পারলে মুন মহাজনী পেয়ে যাবে। কলকাতার কালা জমিদারকেও সেদিন পরোয়া করতে হবে না। ভিড়ের মধ্যে স্যাঁৎ করে পদ মল্লিক ঢুকে গেল ; আনমনে এগিয়ে চলেছে কাদম্বিনীর দিকে।

ব্যাপারটা নজর এড়ায় না আর একজনের ; গাড়িতে বসে একমুখ পান পুরে দোনা থেকে রুপোলী পাতি জর্দা একলোট মুখে চালান করছিল।

নিভাননী, ন'বাবুর বাঁধা মেয়েমানুষ, হঠাৎ তাকে কামরাঙ্গা গাছতলার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে একটু অবাক হয়। চোখ পড়তেই বুঝতে পারে ব্যাপারটা। নিভাননী বামুনের ঘরে কড়ে রাঁড়ী। ন'বাবুর ফুসলানিতে বের হয়ে এসেছে—কোম্পানির সাহেব কুঠিতে যেতে চায়নি। ন'বাবু অনেক বলে কয়েও মত করাতে পারেনি, তবে আশায় আছে। সোনাগাছিতে বাড়ি করে দিয়েছে।

হঠাৎ ধ্যানভঙ্গ হয় ন'বাবুর।

নিভাননী বলে চলেছে কর্কশ কণ্ঠে।

—তাই বলি এমন উদোস কেন ? ওগো ভাল মানুষের ছেলে, মুখে যে রা নেই, হরে গেল নাকি ?

নিভাননীর সব যেতে বসেছে, মুখ যায়নি। এখুনি সাতখানা করে হাটেই হাঁড়ি ভাঙবে, এমন মেয়েমানুষ ও। ন'বাবু বাধা দেয়।

—চল, চল বাবু। দেখছিলাম কেমন বুলবুলির লড়াই হচ্ছে।

—তা আর দেখি নি, বলি মিনসে হাঁ করে গিলছে কি ? গু-খাওয়া গরু কি নেশা ছাড়তে পারে! মেয়েমানুষ দেখলো কি নোলায় জল সরতে লাগলো। মরণ!

ন'বাবু নিভাননীকে নিয়ে গাড়িতে উঠে ইজ্জত বাঁচাবার চেষ্টা করে। মনে মনে তখনও ভুলতে পারে না কামরাঙ্গা তলার সেই ছবিটা, হ্যাঁ—রূপ বটে!

ন'বাবু জুড়িতে বসে বসে কথাটা ভাবছে। নবকেষ্টবাবুর প্রিয়পাত্র ন'বাবু। কলকাতার বাবু মহালে অত্যন্ত পরিচিত। অনেকেরই অনেক অকায কুকাযের সঙ্গী, হাতিয়ার। যেখানে সূচ চলে না, ন'বাবু সেখানে ফাল চালাবার এলেম রাখেন। সুতরাং সাহেব তুষ্টির কাযে ন'বাবুর মত লোক অপরিহার্য।

নবকেষ্টর ডান হাত ওই ন'বাবু। ন'বাবুও মনে মনে অনেক আশা পোষণ করে। অপরের জন্যই গড়ে তুলবে না সে, এবার নিজেই এগিয়ে যাবে।

পথে নিভাননীকে পৌঁছে দিয়ে জুড়িটা নবকেষ্টর বাড়ির দিকে চলে। আজ বৈকালের নোতুন শিকার আবিষ্কারের কথাটা প্রকাশ না করে পারে না।

এর জন্য ভালো দামও আদায় করবে। অনুচর পদ মল্লিক তখনও খবরটা আনেনি। খবরটার জন্য একটু উদ্বিগ্ন হয়।

সন্ধ্যা নেমেছে। জনহীন পথে গাড়িটা এগিয়ে চলে। বার বার সেই কামরাঙ্গা তলার মেয়েটির মুখখানা মনে পড়ে। নিভাননীর চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর।

মীরজাফর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। বৈকালের দিকে মহারাজ আসেন তাঁর কোম্পানি বাগানের কাছের বাড়ি থেকে, দুজনে বের হন গঙ্গার ধারে। বসতি বিশেষ নেই। শ্মশানকালীর মন্দিরে আরতি সারা হবার পরই নেমে আসে স্তব্ধ নির্জন অন্ধকার। শিয়ালের ডাকে ভরে ওঠে চারদিক। শ্মশানের চিতার লালাভ শিখা আঁধারে কেঁপে উঠছে, মাঝে মাঝে খোয়ার রাস্তায় ছুটে যায় নৈশবিহারী বাবুর দল, মদের নেশায় হৈ-চৈ করছে, কোন গাড়িতে মেয়েমানুষও রয়েছে। গোড়ের মালায় বাবুরা তাকে আগাগোড়া ঢেকে নিয়ে চলেছে প্রমোদ ভবনে।

এ যেন সারা জাত মাথা মুখ নীচু করে কোন ভোগবিলাসের অন্ধকার নরকের দিকে ছুটে চলেছে। মীরজাফর ভাবছে। মীরকাশিমের পরাজয় সংবাদ আসছে। উদয়নালা-ঘেরিয়ার যুদ্ধে সে হেরে গেছে, বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ তার সমস্ত শক্তি একত্রিত করেছে; হয় উত্থান না হয় পতন। মীরকাশিম আজ ঝড় তুলেছে সারা দেশে।

—এতেও খুশি হয়েছি মহারাজ। সে ইংরেজের শয়তানির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। নিজে যা পারিনি, আমার বংশের জামাই তা পেরেছে; আমি আদৌ দুঃখিত হইনি মহারাজ।

নন্দকুমার নীরবে চেয়ে রয়েছেন। নিস্তরঙ্গ গঙ্গার জলে দোল খাচ্ছে দু-একটা তারা। জলস্রোত বয়ে চলেছে অন্তহীন আঁধার-ঘেরা সমুদ্রের দিকে।

বলে ওঠেন মহারাজ—একটা সুযোগ হারালাম জনাব। ইংরেজকে উৎখাত করবার মহাসুযোগেও নীরব দর্শক হয়ে রইলাম মাত্র।

মীরজাফর চুপ করে আছে। মহারাজ বলে ওঠেন,

—ওর হঠকারিতাকে স্বীকার করতে বেধেছিল, নইলে ওর আদর্শকে আজও শ্রদ্ধা করি নবাব।

—প্রকাশ্যে এসব আলোচনা না করাই ভালো।

চারদিকে চেয়ে মহারাজকে সাবধান করে দেয় মীরজাফর। কোথাও কোন গুপ্তচর রয়েছে কিনা কে জানে? ইংরেজ ওর উপর এখানেও কড়া নজর রেখেছে। দূর আকাশে জ্বালাময় দৃষ্টিতে জ্বলছে কয়েকটা তারা, উৎসবময় কলকাতার জনারণ্যে দুটি অতৃপ্ত অন্তর নিভৃতে জ্বলছে অসহ্য জ্বালায়।

ফোর্ট উইলিয়মের হাতার অদূরে একটা বাংলোয় সবে আলো জ্বলছে, লাল বেলজিয়ান কাঁচের ঘেরাটোপ ঢাকা মিঠেগোলাবী আলো। বিস্তৃত হাতার মধ্যে কয়েকটা তালগাছ, বাগানে কয়েকজন মালী তখনও গোলাবের কেয়ারিতে ডালপালা ছেঁটে চলেছে, কেউ বা ঝারিতে করে জল দিচ্ছে ক্যানা-ক্রোটন লতার গোড়ায়। বাংলোর পাঁচিলের গায়ে দুটো উইপিং উইলোর চারা পোঁতা হয়েছে। কালো ঢোলা চিরল পাতাগুলো রাতের বাতাসে পতপত করে নড়ছে।

ওপাশে খোলার ছাউনি-করা চাকর, বাবুর্চির ঘরে পিদিমের আলোর সামনে বসে আছে ভুলো মালী আর পাতু কাহার। দক্ষিণের দিকে বাড়ি। জাতজ্ঞায়াত ছেড়ে এসেছে পাতু, চোখে তার কল্পনার রং। এসেছে কলকাতায় নানা ধনদৌলত ছড়ান আছে, তারই সন্ধানে।

সাহেব বলেছে খেরেস্তান হলে মেম বিয়ে দেবে। পাতু কাহার সাহেবের পাখা টানে। দেওয়ালের ফাঁকে খড়খড়ি লাগানো, লকলাইনের দড়িটা লম্বা মেদিনীপুরী পাটিতে তৈরি সালুর ঝালর বসানো পাখার কাঠে বাঁধা, টানে আর ঢোলে দরজার বাইরে বসে। মাঝে মাঝে নজর দেয় ঘরের মেজের দিকে।

ভুলো বলে ওঠে—মেম! হাঃ, নিজেরাই বলে মালী জোলা ডোমের মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করে, তোকে তারা মেম দেবে! ওই আশাতেই থাক তুই।

পাতু বলে—তা যা বলেছো। গেল রাতের আগের রাতে দেখছি মামা। সাহেব সিদিন বলছিল—তুদের গাঁয়ে ভাল মেয়েমানুষ আছে? টাকা যত লাগে দোব।

পাতু কি যেন ভাবছে! টাকা, রাশি রাশি টাকা!

– তুই কি বললি সমুন্ধীরে ?

—কি আর বলবো, চুপ করি রইনু।

গলা খাটো করে পাতু বলে—আছে মামা, লক্ষ্মী ; তেলিদের ঘরের মেয়ে, বড় গরীব। তবে রূপ ! হ্যাঁ, চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

ভোলা মালী কি ভাবছে—আসবে সে ? দেখ না চেষ্টা মেষ্টা করে।

পাতু কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দূরে গাড়ির শব্দ শুনে থেমে গেল।

—নবকেষ্টর জুড়ি ত লয়রে ?

রাতের আঁধারে নবকেষ্টর জুড়ি প্রায়ই আসে সাহেবের বাংলোয়, কিন্তু এখন অন্য কার গাড়ি।

—হবে বা, আর কেউ এল ? সাহেবদের লীলা খেলা বোঝা দায়। মদ আর মাগী নিয়েই আছে, আর তাল তাল টাকা। রাজত্বি একেই বলে মামা।

ভোলা মালী বলে ওঠে—হ্যারে তোদের গাঁয়ের সেই লক্ষ্মী আসবে ? আন কেন্নে ভুলিয়ে ভালিয়ে।

অন্ধকারে ভোলা এগিয়ে গেল গাছের ফাঁক দিয়ে সাহেবের বাংলোর দিকে। মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আলবোলা টানছে সাহেব। গোলাবী মদের নেশার উপর অম্বুরী তামাকের ছোঁয়া যেন গাঢ়তর করে তুলেছে নেশা। স্বপ্ন দেখছে হেষ্টিংস হ্যাম্পস্টেডের পাড়ার সেই অ্যানি তার সামনে দাঁড়িয়ে, পরনে হায়দ্রাবাদী দামী হিমরুর ঘাঘরা ; হর্তেলের বর্ণ বুকের আভায় ফুটে বের হয়েছে কাঁচুলির বাঁধন ভেদ করে, গায়ে আশমানী রংএ খেসের ওড়নী ; সাচ্চা রূপালী চুমকি বসানো—যেন তারা-ঢাকা আকাশ কোল থেকে উঁকি মারছে আধখানা চাঁদ। এগিয়ে আসছে তার দিকে !

অ্যানি !···উঠে দাঁড়িয়েছে হেষ্টিংস।

একটি মুহূর্ত। অন্তরের সব তৃষ্ণা উদগ্র হয়ে তার ইন্দ্রিয়ে সঞ্চারিত হয় তিলে তিলে। চোখের দৃষ্টির মধ্যে কি যেন ব্যাকুলতা !

হেষ্টিংস স্পর্শ করেছে তাকে। কামনা ব্যাকুল উত্তপ্ত উদগ্র সে স্পর্শ, সারা দেহ থর থর করে কাঁপছে। কাছে টেনে নেয় তাকে, ওড়নার আবরণ খসে পড়ে। বাতাসে ভেসে আসছে বাগান থেকে রাতের আঁধারজাগানো তীব্র মদির সুবাস। বাধাভাঙ্গা ঝড় উঠেছে রাতের বাতাসে। কোথায় আকাশকোলে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চমকে পিছিয়ে দাঁড়ালো হেষ্টিংস।

—বেগমসাহেবা! কশুর মাপ্ করবেন।

মণিবেগমকে এমনি নির্জন রাতে তারই বাংলোয় এ ভাবে দেখবে কল্পনাও করে নি।

মণিবেগম কাঁপছে। দুচোখে তার উদগ্র যৌবনের কামনা শিখার দীপ্তি। বিদেশী তরুণের উত্তপ্ত স্পর্শে ঝড় উঠেছে তওফাওয়ালী বালকুণ্ডা, জাহানাবাদের সেরা তওফাওয়ালীর আদিম বন্য রক্তে। কোন কথা বললো না সে, মাথা নামালো মণিবেগম। যেন নিজের আদিম সত্তার নগ্ন নির্লজ্জ প্রকাশে শিউরে উঠেছে আজকের এই মণিবেগম।

হেস্টিংস চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। কাশিমবাজারে একটি রাত্রি, রাজমহলের পথে সামান্য অপরিচিত এক বিদেশী কর্মচারীর চোখের সামনে ফুটে ওঠে পদ্মবনের ছবি ; পরক্ষণেই মনে পড়ে মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্টকে রাস্তার মাঝে দাঁড় করিয়ে সেলাম জানাতে বলেছিল—আজ!

বুঝতে পেরেছে হেস্টিংস ওর আসার উদ্দেশ্য। পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে এগিয়ে গেল কোণে শ্বেত পাথরের টেবিলের দিকে। শূন্য বোতলটাই পড়ে রয়েছে। মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায় বাধা পেয়ে। গর্জন করে ওঠে,

—বেয়ারা! শূয়ারকা বাচ্চা।

কাছাকাছি ছিল ভোলা মালী, বকশিশের লোভে ছুটে যায়। এ সময়ে সাহেবরা খোশ মেজাজে থাকে। বাইরের মাগীর সামনে দরাজদিলের পরিচয় দেবার জন্যই অকারণে হাক-ডাক করে, পকেট থেকে আশরফি বের করে দেয়। আশাভরে ছুটে আসে ভোলা।

—পেগ কোথায়? সন্ অব এ বিচ।

জুতো সমেত এক লাথি মারতেই ছিটকে পড়লো সে। উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বোতল এগিয়ে দেয়।

—গেট আউট! গর্জে উঠে সাহেব। ভোলা এক দৌড়ে নেমে আসে বাংলো থেকে।

গলার কাছে বোতল থেকে তাজা পানীয় খানিকটা ঢকঢক করে ঢেলে দিয়ে ফিরে দাঁড়ালো সাহেব। মণিবেগম তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। গা থেকে খসে পড়েছে ওড়না, মেজেতে লুটোচ্ছে, ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কাঁপন উঠুক বিদেশীর নেশালাগা রক্তে। ঝাঁপি খোলা বিষধর ফণা তোলা সাপের সামনে বশীকরণের কাজল পরে দাঁড়িয়েছে কোন নাগিনী কন্যা।

বেবশ সাপ ফণা নামায় না! সহজে পোষ মানতে তার স্বভাবে বাধে। তাজা পানীয় পেটে যেতে সাহেব যেন দুর্বলতা কাটিয়ে ফেলে, পরিষ্কার কণ্ঠে বলে ওঠে ব্যবসাদারী কথাগুলো,

—কোম্পানির টাকার দরকার বেগমসাহেবা। যে ভাবেই হোক টাকা আমাদের চাই।

—বাংলার মসনদ কি নীলামে তুলেছেন সাহেব? মনে মনে ফুঁসছে বেগম, অসহায় নির্লজ্জের মত হাসছে হেষ্টিংস—তাই-ই। আপনাকে ধোকা দেব না!

ওর দিকে চেয়ে থাকে মণিবেগম, কাশিমবাজারের সেই রাতের দৃশ্যটা মনে পড়ে, মীরকাশিম ইনাম দিয়েছিল। মণিবেগমের রূপ সে ইনামের চেয়েও ঢের দামী। কি যেন ভেবে কঠিন কণ্ঠেই বলে ওঠে বেগম,

—বেশ, লাখ টাকা দোব।

হাসছে হেষ্টিংস—ওতো কোম্পানির ঘরে জমা পড়বে; আমরা কত পাচ্ছি? অবশ্য সেইটার উপরেই সব নির্ভর করছে। সেটাও ধরুন আরও কয়েক লাখ টাকা। ক্লিয়ার!

পরিষ্কার ব্যবসার কথা, মদ খেয়ে ওরা টনটনে জ্ঞান নিয়ে ব্যবসাদারী কথা বলে, এক চুল এদিক ওদিক হয় না। রূপের নেশাতেও দুনিয়া রঙীন দেখে না। এত শয়তান হৃদয়হীন ধাতের লোক। এর কথায় মত দেওয়া ছাড়া পথ নেই। কিন্তু শেষ সম্বল ওদের হাতে তুলে দেবার পর যদি বেইমানি করে? তাও অসম্ভব নয়। মণিবেগম যেন বিপদে পড়েছে।

—বিশ্বাস করতে পারছেন না? হেষ্টিংস কথাটা পরিষ্কার করে।

মনের অতলের খবর ওরা জানতে পারে।

—না, ভেবে দেখি। মণিবেগম জবাব দেয় চিন্তিত মনে।

—তাই দেখুন। আর একদিন এলে খুশি হবো। এসব কথা রাতের বেলাতেই হলে ভাল হয়; ইট ইজ সিক্রেট। গোপনীয় কথা কিনা।

কি যেন ইঙ্গিত করতে চায় ওই বিদেশী। হাসছে মুখ টিপে, শ্বাপদ হাসির আভা ওর মুখে।

মণিবেগম চিন্তিত মনে বের হয়ে আসছে কুঠি থেকে। জনহীন রাস্তা, গাড়িখানা ক্লান্ত গতিতে টিকিয়ে চলেছে। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বেগম। পাঁচ লক্ষ টাকার কমে কাজ হবে না। বাংলার নবাবীর এ দাম দিয়েও তাকে

নবাবী নিতে হবে। মীরজাফর নামে মাত্র নবাব থাকবে, যা করার সেই-ই করবে। জাহানাবাদের তওফাওয়ালীর বাঁদী হবে বাংলার মসনদের গর্দানসীন বেগম।

রাতের তারাজ্বলা আকাশে কোথায় ডেকে গেছে রাতজাগা পাখি। চৌরঙ্গীর বন থেকে হরিণের ডাক শোনা যায়; বিশাল বনস্পতির বুকে থমথমে আঁধার। হঠাৎ চমকে ওঠে বেগম, হ্যাঁ, ঠিক সেই আলাপ, তেমনি মূর্ছনা। বাজবাহাদুরের ঘরওয়ানার বিলম্বিত রাগের টোড়ি, মাণ্ডুতে থেকে বহুদিন সাগরেদি করেছে বীণকার, এ হাত তার খুব চেনা। কি এক আকর্ষণে ওই আবছা আলো-মাখা গাছগুলোর দিকে এগিয়ে চলে বেগম জঙ্গলের মধ্যে। দূরে গোবিন্দপুরের দু'একটা টিমটিমে আলো দেখা দেয় ঘন গাছের ফাঁকে।

বটগাছের ছমছমে অন্ধকারের অতলে একটা কাঠের গুঁড়িতে আগুন জ্বলছে। সামনে ছেঁড়া নোংরা পোশাক-পরা লোকটা। কাঠের গুঁড়ির লালচে ম্লান আভায় তার দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা মুখ ঠিক চেনা যায় না। চোখ-বুজে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে একমনে আলাপ করছে সে।

এগিয়ে গেল মণি।

সুতানটী, কলকাতা ছাড়িয়ে গোবিন্দপুরের নাগাড় বনে রাত্রি নেমেছে। ডাকাত ঠ্যাঙাড়ের ভয়, তবু দুঃসাহসী বেগম এগিয়ে চলেছে পরম আগ্রহে।

—বীণকার তুমি এখানে? অবাক হয়ে গেছে বেগম।

ধীরে ধীরে পিছনের দিকে চাইল ওয়াজিদ। দূর থেকে কার ডাক কানে আসে, বহুদিনের ফেলে-আসা সুরের মত। একটু বিস্মিত হয়েছে সে। আবছা আলোয় মণিবেগমের দিকে চেয়ে থাকে। পরনে দামী পেশোয়াজ নীল আকাশে তারার চুমকি বসানো আশমানি ওড়না। পরী যেন নেমে এসেছে মাটির বুকে। একটা মাদকতাময় সুবাস ঘিরে রয়েছে ওর কামনা মদির নীল দেহকে।

ওয়াজিদ মুর্শিদাবাদে থাকতে পারে নি। অরাজক মুর্শিদাবাদ। মন হু হু করে অসীম শূন্যতায়। মতিঝিলের প্রাসাদ থেকে বের হয়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। কোথাও কোন সুন্দর সুর যেন খুঁজে পায় না! বিস্মিত হয় বীণকার, আলাপ করতেও মন বসে না। একি বিপদে পড়লো সে? নিজের মন অজানতেই কবে নিঃশেষে তাকে ছেড়ে গেছে সে খবর পায় নি। যেদিন গেল তখন আর সমঝোতা করবার দিন ফুরিয়ে গেছে। দিয়ানা হয়েছে

বীণকার। কারো বজরায় কিছুটা পথ আসে, আবার আসে পায়দল। এমনি করে পরের দয়ায় দরবেশ কলকাতা পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। কিন্তু কি দেখলো সে এখানে এসে!

মণির মুখেচোখে সেই নটীর লাস্য, কামনা আর লালসার আগুন জ্বালানো নেশা!

হতাশ সুরে বলে ওঠে—এমনিই। দরবেশ মানুষের ঘরের ঠিকানা সব জায়গাতেই।

—তাই নাকি?

হাসছে বেগম। মনে তার নবাব বেগম হবার আশা; দুচোখে হেস্টিংসের পানীয়ের উচ্ছলতা; ওয়াজিদ বিস্মিত হয়ে গেছে। মণিবেগমকে এত চটুল হতে বড় একটা দেখেনি।

—আমি তো ভাবলাম আমার জন্যই বীণকার বোধ হয় দিয়ানা হয়ে গেছে।

বীণকার ওর দিকে চেয়ে আছে। মণিবেগম বদলে গেছে; কলকাতার বিলাস ব্যসন তাকে মাতোয়ারা করেছে।

—হাঁ করে দেখছো কি বেকুফ? সোরাবীর নেশায় বুঁদ হয়ে বেগমসাহেবা হেস্টিংসের কুঠি থেকে মাঝ রাতে সেজেগুজে ফিরে আসছে। বুঝতে পারো কিছু আহাম্মক?

কি এক হাসির স্রোতে ভেসে চলেছে সে।

কথা কইল না বীণকার, অলস হাতে বীণের তীব্র মধ্যমের তারে টোকা দিয়ে একটা সুরেলা আওয়াজ তুলতে চেষ্টা করে। হঠাৎ সমস্ত তারগুলা নিদারুণ বেদনায় ঝন ঝন আর্তনাদ করে ওঠে, বেগমসাহেবা সজোরে ঘা মেরেছে ওর বীণে; চিৎকার করে ওঠে মণি,

—থামো তুমি!

মণি অবাক হয়ে চেয়েছিল ওর দিকে; এত বড় খবরটাতেও ওর মুখ-চোখের পরিবর্তন আসেনি। ওর চরম উদাসীনতায় রেগে ওঠে বেগম, নীরবে চাইলো ওয়াজিদ ওর দিকে। মণিবেগমের দুচোখে জল টলটল করছে।

কি যেন পাপের ছায়া ফুটে উঠে ছিল দুচোখে, অনুশোচনার ধোঁয়ায় মুছে যাচ্ছে সেটা। বলে ওঠে বেগম অশ্রুভিজে কণ্ঠে,

—এমনি করে কার জন্যে পথে পথে ঘুরছো বীণকার? যদি সত্যি এত-

টুকুও ভালবেসে থাক তাকে, সাবধান করে দিচ্ছি—সরে যাও, ভুলে যাও তাকে। তার নিঃশ্বাসে বিষ আছে। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কেন এই ভাবে পথে পথে ঘুরে মরছো, কিসের নেশায়?

হাসছে বীণকার, মিষ্টি প্রশান্তি মাখা হাসি; এ ভালবাসার স্বাদ মণি তওফাওয়ালী আজ বেগমসাহেবাই হোক না কেন—বোঝবার সামর্থ্য অর্জন করেনি। ধূপের মত মিষ্টি গন্ধে এই ক্ষীণ প্রেমের সৌরভ মনোজগৎ ভরিয়ে তোলে। কোনও চাওয়া-পাওয়ার ব্যর্থতার কান্না ব্যাকুলতা এখানে নেই।

মণির জীবনে একটা ব্যর্থতা কোথায় রয়ে গেছে। একটি লোকের কাছে সে নিষ্ঠুরভাবে পরাজিত হয়েছে। মীরজাফরকে আজ দয়া করে বেগম, নন্দকুমারকে প্রয়োজনবোধে শ্রদ্ধা করে আর হেষ্টিংসকে ঘৃণা করে; কিন্তু ভালবাসলো একটি মানুষকে যার ধরাছোঁয়া কোনদিনই সে পেল না। দূর থেকে আঁধার পথে আলেয়ার ইশারায় পথ দেখিয়ে কাছের দিকে ডাক দিয়েই সরে গেছে আবার হারিয়ে যাওয়ার তমসায়। মণি এইখানে ব্যর্থ হয়েছে, হার মেনেছে।

বীণকার চমকে ওঠে; মণির এ চাহনি চেনে। ঝড় ওঠার পরই মনে ওর এমনি পাবার সুর ধ্বনিত হয়।

—মুর্শিদাবাদে ফিরে চল বীণকার।

—যাবো বই কি।

—আমাদের সঙ্গে চল। আমরাও ফিরছি।

—ফিরছো?

—তারই আয়োজন সারা করতে সাহেবকুঠিতে গিইছিলাম মাঝরাতে এই বেশে। বুঝতে পারছো না বাংলার বেগমের কিস্মৎ আজ কোথায় নেমেছে?

কথা কইলে না বীণকার, স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ঝিকিমিকি তারাজ্বলা আঁধারে। কোথায় আজানার স্রোতে ভেসে গেল একটা মালগুজারী নৌকা, কিল্লার বুরুজের মাথায় আলো জ্বলছে। বিচিত্র এক রাত্রি ঢাকা স্বপ্নঘেরা জগৎ। চুপ করে বসে আছে ওয়াজিদ। বেগমসাহেবা কখন চলে গেছে টের পায়নি।

বীণকার কাঠের জ্বলন্ত গুঁড়িটা আগুনের দিকে ঠেলে দিল, নীল ফিরফিরে আগুনের শিখা উঠছে বাতাসে কেঁপে কেঁপে; নীল প্রকম্প শিখা, আশমানী

ওড়না, আগুনজ্বালা রূপ, আঁধার কালো চুলে ঢেকে গেছে মুখ। মণিবেগম! হ্যাঁ, যেন আগুনের শিখা, ধিকি ধিকি জ্বলছে কি অসীম বুভুক্ষায়; সুযোগ পেলে তামাম দুনিয়া পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। অসংখ্য পোকা উড়ছে ওর চারপাশে।

পদ মল্লিক সন্ধানী লোক। বাস্তুঘুঘু, একপুরুষের মোসাহেব হলে হয় কি, এ অঞ্চলের দিগর লোক। যদু সোনারের ছোট সোনারুপোর দোকান খুঁজে বের করে তার ভাই রামের সঙ্গে বেশ দহরম মহরম করে তুলে একজোড়া নারকেল ফুলও গড়তে দিয়ে এসেছে। তারই তাগাদায় দুবেলা সোনাগাছির পাড়ায় বসে থাকে, পিছনে দত্তদের খিড়কি পুকুরের দিকে নজর রেখে। কাদম্বিনী পড়ন্ত বেলায় স্নান করতে নামে। টিপচালতে যজ্ঞি ডুমুর গোদালে লতার জঙ্গলে ঘাটের দিকে ভালো করে নজর যায় না; পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় কাদম্বিনীর হর্তেলের বর্ণ আদুড় গা। কালো জলে যেন পদ্মফুল ফুটেছে; কিন্তু পদ মল্লিকের ওতে নজর নেই; কোথায় যাবে ওই ভেট তা জানবার দরকার নেই। ন'বাবুর কবকরে টাকার দিকেই তার লোভ। তার পরের কথা জানার দরকার তার নেই!

সেদিনের নির্জন দুপুরে একটা শিসের শব্দে চমকে ওঠে কাদম্বিনী, আদুড় গা পুকুরের জলে ডুবিয়ে চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চাইতে থাকে। হঠাৎ দেখে পদ মল্লিক পানের ছোপ-লাগানো তরমুজের বিচির মত কালো দাঁত বের করে হাসছে।

—ইস্ কি লজ্জা, একেবারে হড়বড় করে গলাজলে নামলে। পা পিছলে ডুব জলে গেলে কি হতো বল দিকি?

কাদম্বিনী কথা কইল না, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বেহায়া পুরুষের নজরের সামনে উঠে দাঁড়াতে লজ্জা হয়,ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সারা গা পুকুরের জলের নীচেই।

এর ক'দিন পরেই ঘটনাটা ঘটলো। মুখ আঁধারি সন্ধ্যার অন্ধকারে সেদিন কাদম্বিনী ঘাটে গেছে, হঠাৎ ঘন জঙ্গলের ফাঁক থেকে কারা বের হয়ে এসে তার মুখ টিপে ধরল, চিৎকার করতে যাবে, তার মুখের মধ্যে পুরে দেয় জোর করে খানিকটা গামছার খুঁট, শক্ত কঠিন হাতের চাপে ঠোঁট বেয়ে দু'এক

ফোঁটা রক্তের ধারা বের হয়। রাস্তার দিকে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, ধরাধরি করে সেটাতে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে গেল তারা রাতের অন্ধকারে। কোনদিকে যাচ্ছে জানে না সে, গাড়িটা বেগে ছুটে চলেছে। স্বপ্নাবিষ্টের মত অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে আছে কাদম্বিনী। অসহায় আক্রোশে হাত-পা ছুঁড়ছে।

কে একজন বলে ওঠে—দে তো মাগীর হাত পা দুটো বেঁধে। চুপ মেরে যাবি তা নয় আপ্সাচ্ছে।

ওদের দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে কাদম্বিনী। কাপড়-চোপড় ঠিক করে নেবার চেষ্টা করে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সারা দেহ।

সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে এসেছে যত মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো বখাটে বাউণ্ডুলের দল। ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে বাংলা মুলুকে। ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, থাকলেও তা চিরদিনের মত ছিঁড়ে এসেছে। দুর্বার ক্ষমতা পেয়েছে এখানে, অর্থের অভাব নেই। ফলে মদ আর মেয়েমানুষই প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজ্যশাসনের। প্রথমে রাইটার, থাকা খাওয়া ঘর সবই তো পাবে, উপরি তঙ্কা, চাকর-বাকর। তারপর পদস্থ কর্মচারী, কয়েক বৎসর পর রেসিডেণ্ট, তারপর চাই কি গভর্নর জেনারেল। অর্থাৎ সুবে বাংলার জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রাখালের রাজ্যলাভ। ইংলণ্ড সেই দুরন্ত রাখালদিকে এখানে নির্বাসিত করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে।

হেষ্টিংসও তাদেরই একজন পদস্থ কর্মচারী। ইতিমধ্যেই সে কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনায় বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছে। কর্মচারী গোষ্ঠীও তৈরি করেছে মনের মত। শাসনবিভাগে, সৈন্যদলে ইংরেজ যারা আছে, হেষ্টিংস তাদের অনেককেই টাকা মদ আর অন্য উপকরণের স্বাদ পাইয়ে নিজের দলভুক্ত করেছে, কালা আদমীর উপর জাঁকালো শাসন আর শোষণ চালাবার জন্য।

কালা জমিদার কর্মচারীও রেখেছে। গঙ্গাগোবিন্দ সিং, দেবী সিং, বিহারের রাজস্ব সংগ্রাহক সিতাব রায়, কলকাতার নবকেষ্ট, কান্তমুদী, রেজা খাঁ সকলেই তার অনুগ্রহপুষ্ট। একটা চক্র, নিখুঁত যন্ত্র গড়ে তুলেছে।

গঙ্গাগোবিন্দ সিং কতকগুলো কাগজপত্র এনেছে। দেখেশুনে সই করছে হেষ্টিংস। হিসাবের তালগোল পাকাতে এবং সেই ফাঁক দিয়ে সুচের জায়গায়

ফাল গলিয়ে দিতে গঙ্গাগোবিন্দের জুড়ি নেই। অবশ্য এই কাজের জন্যই হেস্টিংস তাকে বেশি খাতির করে। অত্যন্ত বিশ্বাসী, চোখ কান বন্ধ করে কাজ করতে জানে গঙ্গাগোবিন্দ। কুঠির বাইরে বিশাল চত্বরে খাতাঞ্চিখানা—আমদরবার।

হঠাৎ পিছনের দিকে শব্দ শুনে উঠে দাঁড়াল হেস্টিংস, গঙ্গাগোবিন্দও এই সংকেতের অর্থ জানে। বিশেষ প্রয়োজনে এসেছে নবকেষ্ট। ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

নেটিভ কর্মচারীদের মধ্যে নবকেষ্ট সাহেবদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, নানা ভাবে হেস্টিংসকে সাহায্য করেছে সে এই শোষণ যন্ত্রটা চালু রাখতে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং-এর প্রয়োজন যেখানে শেষ হয়েছে, নবকেষ্টবাবুর প্রয়োজন শুরু হয়েছে সেইখানে।

গঙ্গাগোবিন্দ চলে যেতেই নবকেষ্ট এগিয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে ঢেকে গেছে চারিদিক। গাছ গাছালির মাথায় জোনাকীর মৃদু জমাট আভা।

নবকেষ্টর চাওয়ার শেষ নেই। একগুণ দিয়ে দুগুণ চাইবে সে। হেস্টিংস ওর দিকে চেয়ে থাকে। নবকেষ্ট কাযের কথা সেরে বের হয়ে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে হেস্টিংস; নবকেষ্টর গাড়িটা সশব্দে বাইরের দিকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ দরজার কাছে শব্দ হতেই ফিরে চাইল। অনুচর তখনও দাঁড়িয়ে। ন'বাবু সেলাম করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—হুজুর!

হেস্টিংস পানপাত্র নামিয়ে রেখে বলে ওঠে—কাল দেখা করো খাতাঞ্চীখানায়।

একগাল হেসে সরে গেল মূর্তিটা।

সবাই সুযোগ নিতে চায়, তা জানে হেস্টিংস। তাজা পানীয়টা ক্রমশ সমস্ত শরীর উষ্ণ করে তুলেছে; মনে হালকা একটা নেশার আমেজ।

হেস্টিংস হলের ওদিকে ছোটঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে যায়। এককোণে দাঁড়িয়ে কাদম্বিনী আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। কাঁপছে মেয়েটা ঝড়ে-কাঁপা পাতার মত থরথর করে। সেজের মৃদু আলোয় দেখা যায় পাতলা শাড়ির আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠেছে হার্তেলের মত উজ্জ্বল সুগৌর বর্ণ, নিটোল পুরুষ্ট গা থেকে কাপড়খানা পিছলে পড়ছে। একবার ওর দিকে চেয়েই মুখ নামাল। আবার চোখ তুলে চাইল, করুণ আর্তিভরা সেই দৃষ্টি।

একদৃষ্টে চেয়ে আছে সাহেব ওর মুখের দিকে। হ্যাঁ, টোপ ধরেছে। ধরতেই হবে। কালা কর্মচারীর নজর আছে। খাসা জিনিস এনেছে।

কালই আসবে নেটিভ কর্মচারীর দল: এই ভেটের কি দাম দিতে হবে তাও জানে হেস্টিং'স। জমিদারীর সনন্দ—না হয় নুন মহাজনী, হয়তো বা আর কিছু চেয়ে বসবে।

মনে মনে হাসে ধূর্ত ইংরেজ।

কাদম্বিনী ওর হাসি দেখে কাঁপছে অজানা আতঙ্কে। কল্পনাও করেনি সে তাকে এমনি পণ্য দ্রব্যের সামিল করে এখানে ধরে আনা হবে। পাশের ঘরে ওদের কথাগুলো শুনেছে, একা সে নয়—আরও কতজন এমনি করে ওদের হাতে শিকার হয়ে এসেছে জানে না।

কাঁদছে সে; অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কাদম্বিনী।

—স্টপ ইট!

হেস্টিংস পাশের ঘরে বের হয়ে আসে। এই সব ন্যাকামি যেন তার অসহ্য।

রাত বেড়ে চলেছে। পায়চারি করছে হেস্টিংস। কেন জানে না বার বার এই পরিবেশে একটি মুখ মনে পড়ে। মণিবেগমকে আজও ভোলেনি সে—সাগ্রহে অধীর প্রতীক্ষায় যেন বার বার ডাক দিয়ে গেছে তাকে।

সব চাওয়া পাওয়ার নেশা ভোলানো সেই আহ্বান—কি যেন কল্পলোকের নেশা সারা মনে।

সন্ধ্যার আঁধারঢাকা নির্জন চারদিক, ঝড়ো হাওয়া চলেছে বাইরে। একটা শার্সি বাতাসের ধাক্কায় আছড়ে পড়েছে দেওয়ালে—ঝনঝন করে ভেঙ্গে পড়ল কাচ টুকরো টুকরো হয়ে।

গ্লাসটা নামাল সাহেব। সফেন লাল পানীয় উপছে পড়ছে, হ্যাঁ পাশের ঘরেই রয়েছে সেই হরিণের চোখ-আঁকা সুঠাম মেয়েটা। কাঁপছে ভয়ে।

ওদিকেই জয় করে আনন্দ পায় নিষ্ঠুর পিশাচ। ভীত চকিত আর্তনাদে ভরে উঠবে অন্ধকার আকাশ বাতাস; কাঁদবে ওরা, অসহায় কান্নায় ফুটে উঠবে বিদেশী পৌরুষের জয় ঘোষণা। মর্মে মর্মে অনুভব করবে সাহেব—হ্যাঁ, শাসন করার দাবী, অধিকার তার আছে।

হঠাৎ এই ঝড় বাদলে কাদের আসতে দেখে দাঁড়াল। একটু চমকে উঠেছে সাহেব, রাত্রেই এসেছেন নন্দকুমার, সঙ্গে দুজন লোক। এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন তিনি। বেশ কঠিন কণ্ঠেই অভিযোগ করেন নন্দকুমার।

—আজ বৈকালে এদের বোনকে কোন কুঠিয়াল সাহেবের লোক জোর করে এনেছে, তোমার কাছে আমি নালিশ জানাতে এসেছি এদের হয়ে। একটু চমকে ওঠে হেস্টিংস। তবে কি এদেরই বোনকে তুলে এনে তাকে ভেট দিয়েছে কেষ্টবাবুর অনুচর ওই ন'বাবুর দল!

কি ভেবে হেস্টিংস বলে ওঠে নিস্পৃহ কণ্ঠে—আমি তার কি করব?

—তল্লাস করবে। খুঁজে বের করবে কোথায় কি ভাবে আছে সে। মহারাজ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেন।

—আমার সময় নেই। কাটিয়ে দিতে চায় হেস্টিংস।

গেলাসটা তুলে গলায় এক ঝলক মদ ঢেলে পরামর্শ দেয়,

—কোতোয়ালীতে নালিশ করগে। আমার কাছে এসেছো কেন?

মহারাজা কাঁপছেন রাগে। মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন সাহেবের সামনে। শাসনের নামে এই বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

—তার ফল কিছুই হবে না তা তুমি জানো। তোমার মা-বোনের নামে অনুরোধ করছি সাহেব—এদের সাহায্য করো তুমি।

মা! বোন! মায়ের মুখখানা আবছা মনে পড়ে হেস্টিংসের। অপরিচিতের কলঙ্কের আঁধারে ডুবে গেছে সে। তার মা! বোধ হয় কোন বন্য উচ্ছৃঙ্খল রক্ত তার ধমনীতে বয়, আজ হঠাৎ সেই কলঙ্কের কথা যেন জোর করে তুলে ওই ব্রাহ্মণ তাকে অপমান করতে চায়। ধক করে জ্বলে ওঠে নৃশংস দুটো চোখ। মাথা ঘুরছে! হাতের কাছে বোতলটাও খালি।

হেঁকে ওঠে সাহেব—এ্যাই কুত্তার বাচ্চা! পেগ।

পাতু কাহার বারান্দা থেকে হলঘরের ওদিকে ছোটঘরে ছুটে যায় বোতল আনতে, হঠাৎ দরজার কাছে এসেই আর্তনাদ করে ওঠে; কাঁপছে সে। হাত থেকে পড়ে গেল মদের বোতলটা, ইটালিয়ান কাট গ্লাসের গবলেট চুরমার হয়ে গেল সশব্দে। আকাশে একটা মেঘ গর্জন করে ওঠে—চারিদিকে এক ঝলক তীব্র আলোর ক্ষণিক আভা।

হেস্টিংস ঘরের ভিতর গিয়েই অবাক হয়ে যায়। মহারাজ নন্দকুমার, যদু, রামও ঢুকেছে সাহেবের খাস কামরায়। শ্বেতপাথরের উপর চুর হয়ে পড়েছে বোতল গ্লাস। ওদিকের কড়িকাঠে পাখাটানার লক লাইনে দড়ি বেঁধে ঝুলছে কাদম্বিনীর প্রাণহীন দেহটা। জানালা দিয়ে দমকা বাতাসে উড়ছে তার এলোচুল।

সুন্দর চোখ দুটো ঠেলে বের হয়ে এসেছে, জিভটা দীর্ঘতর হয়ে একদিকে বীভৎসভাবে ঝুলছে। শাড়িটা খসে পড়ে লুটোচ্ছে মেঝেতে।

মৃত্যুর পদধ্বনি তখন চারিদিকে যেন ছড়িয়ে রয়েছে।

সব বাঁধনমুক্ত হয়ে তার দেহাতীত আত্মা কোন সুদূরে চলে গেছে এ জগতের মান অপমানের উর্ধ্বে। একটি মুহূর্ত! অসীম স্তব্ধতায় ভরে ওঠে। মনের সব জ্বালা গ্লানি অসীমের পর্যায়ে পৌঁচেছে।

—নারায়ণ! নারায়ণ! বেদনাভরা অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে ওঠেন মহারাজ। সব শেষ হয়ে গেছে হতভাগিনীর; নিজের মুক্তির পথ নিজেই সে খুঁজে নিয়েছে। সব দুঃখ অপমান থেকে চরম মুক্তি।

মাথা নামিয়ে বের হয়ে এলেন বাইরের হলঘরে।

হেষ্টিংস গর্জন করছে আপন মনে—দি সোয়াইন! দি বাস্টার্ড নেটিভস্!

তাদের দোষেই যেন হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে, কোন জবাব দেবার কিছু নেই। চোখ পড়ে মহারাজের দিকে। অসহ্য সে চাহনি, সমস্ত শরীর মন জ্বালা করে ওঠে। চোখ নামাল হেষ্টিংস। ঘৃণাভরা স্বরে নন্দকুমার বলে ওঠেন,

—এত পশু পিশাচ তোমাদের জাত জানতাম না। তোমাদের দেশে যদি কোনও মানুষ থাকে, সে একদিন এর বিচার চাইবে সাহেব! ভগবানের বিচারেও তুমি রেহাই পাবে না।

নিস্ফল আক্রোশে মাথা নীচু করে বের হয়ে এলেন মহারাজ। আজ হেষ্টিংসের মনে হয় নন্দকুমারই তার বিচার করে গেলেন, রায় দিয়ে গেলেন অসহ্য অমানুষিক ঘৃণার কলঙ্কে কালো দাগ ছিটিয়ে। মনে মনে গজরায় হেষ্টিংস।

—গড্। গড ইজ ডেড।

গোলমাল শুনে ভোলা মালী এসে জুটেছে, মেজর স্কট তদারক করছে। হেষ্টিংস বলে ওঠে—স্কট, ও লাশ বাইরে যাবে না। বাগানের কোণেই জ্বালিয়ে দিতে হবে।

—ইয়েস স্যার।

রাম আর যদুকে আগেই বের করে দেওয়া হয়েছে। কোন গোলমাল তারা করবে না, এ নিয়ে গোলমাল করলে তাদেরও ওই দশা হবে। সেদিন মহারাজের গ্রেট গ্রাণ্ডফাদারও বাঁচাতে পারবে না। তাছাড়া মহারাজ কয়েকদিনের মধ্যেই মুর্শিদাবাদে ফিরে যাচ্ছে। সেই ব্যবস্থাই করবে হেষ্টিংস।

ও এখানে থাকলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। চারিদিক থেকে গোলমাল বাধাবে।

সাত পাঁচ ভেবে হেস্টিংস আপাতত মহারাজকে মীরজাফরের সঙ্গে পাঠিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়, ওর কথা পরে ভাবা যাবে। আপাতত এই ঘটনার প্রসঙ্গে নানা আলোচনা হবে, সেই সব তথ্য সংগ্রহ করবার আগেই মহারাজকে সরাতে চায় সে।

এইসব ভেবে চিন্তে মীরজাফরকে সেই নির্দেশ দিয়ে চিঠি লিখতে বসে। নন্দকুমারকে তার কাছে রাখতে কোম্পানির কোন আপত্তি নেই। নন্দকুমার মুর্শিদাবাদ যেতে পারেন।

রাত্রি। আগুন জলে নিভে গেছে। বারান্দা থেকে চেয়ে রয়েছে হেস্টিংস ওই গনগনে আভার দিকে। একটা দুর্বলতা যেন তাকে পেয়ে বসেছে।

—গড্।

—স্যার!

তরুণ রাইটার জন ডাওলির কথায় ফিরে চাইল। টিকলো নাক, জ্বলজ্বলে চোখ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বেশ লেখাপড়া জানে। বলে ওঠে,

—গড্! তার দিন অতীত হয়ে আসছে স্যার।

ওর মুখের দিকে চাইল হেস্টিংস। তারই চিন্তার পুনরাবৃত্তি করছে ও। বলে চলেছে—They have not yet heard of it that God is dead, Dead are all the gods ; now do we desire the superman to live.

সুপারম্যান শুধু বাঁচবে? সুপারম্যান! হেস্টিংস তার নীতির সমর্থন পেয়েছে মনে হয়।

—হ্যাঁ স্যার, জার্মান পণ্ডিত নীট্‌শে তাই বলেছেন।

পায়চারি করছে হেস্টিংস। কথাগুলো যেন তার কাছে অতি বড় সত্য বলে মনে হয়। মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধি-হিংসা-শক্তি সব দিক থেকে প্রধান হবে, সেই শাসন করবে আর সকলকে। এ যেন অতি সোজা—সহজ তথ্য। কোথাও কোন ফাঁকি এর মধ্যে নেই। আজ যদি সে এই যোগ্যতা অর্জন করতে পারে—তারই বা সবার মাথার উপরে উঠতে বাধা থাকবে কোথায়?

—ড্যাম ইয়োর গড্। বিড় বিড় করতে থাকে হেস্টিংস। পায়চারি করছে উত্তেজিত অবস্থায়। মধ্য আকাশে নীল আভাময় একটা তারা জ্বলজ্বল করছে অস্বাভাবিক দীপ্তিতে।

পাতু কাহার শিউরে ওঠে, ভুলতে পারে না সে সন্ধ্যাবেলার দেখা সেই মূর্তিটা। ঝুলছে পাখার দড়িতে বাঁধা অবস্থায়। নিজেকে লজ্জা অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার অন্য কোন পথ না পেয়েই ওই পথ নিয়েছিল সে।

—মামা! লক্ষ্মী যদি গলায় দড়ি দেয়? তাকে আনবো না।

ভোলা মালী গাঁজায় দম দিয়ে ঝিম মেরে বসেছে। সাহেবের কুঠিতে কাজ করতে গেলে যে ডোম মুদ্দোফরাশের মত লাদনা ঠেঙিয়ে অপঘাতের মড়া পোড়াতে হবে জানত না, বিরক্ত হয়ে ওঠে ওর কথায়।

—থাম দিকি শালা ডোম। লক্ষ্মীর সাতকেলে ভাতার কিনা, তাই দরদ উথলে উঠলো মাঝ থেকে।

—গাল দিছ কেন গো মামা?

—মামা! তুই আমার ছেলের মামা। শালা আঁকুড়ে। পারিস লিয়ে আয়, বর্তে যাবি। সাহেবের ঘর করবে আবার বৌবাজারেও বাসা নিবি, গাছেরও খাবি, তলারও কুড়োবি। না পারিস এমনি লাথি চাবুক খেয়ে পড়ে থাক খাপরার ঘরে। মেলা দিক্ করিস না। তিন টাকার মালী আর বেয়ারা-গিরি কর জনমভোর।

ভাবছে পাতু। আসমানে উড়ন্ত টাকাগুলো ধরে ফেলবে না কি? কিন্তু আজ রাত্রির দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে ওঠে।

কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছে ওরা মুর্শিদাবাদে। মীরজাফরের শেষ অনুরোধ রক্ষা করেছে সাহেব। মহারাজকে ওর সঙ্গে নিয়ে যেতে কোন আপত্তি নেই। মহারাজও সরে যেতে চান কলকাতা থেকে। গত সন্ধ্যার সেই মূর্তিটা এখনও ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

ভারতের মর্ম সত্যকে এমনি করে কলুষিত কলঙ্কিত করেছে বিদেশী শয়তানের দল। নিস্ফল মনে অসহায়ের মত নীরবে অসহ্য জ্বালা নিয়ে ফিরে এসেছেন তিনি। হেস্টিংস হত্যাকারী, একটা নয়—কত যে অমনতর নিষ্ঠুর হত্যার নীরব উদ্যোক্তা সে তার ইয়ত্তা নেই।

মণিবেগম বের হয়েছে ওয়াজিদের সন্ধানে। কুড়িয়ে নিয়ে আঁচলে বাঁধবে সে পথের ধুলো থেকে তার পরশমানিককে। অমনি উদাসী মনের প্রতিই ভোগবিলাসের স্রোতে মত্ত মনের একটা অন্তর্নিহিত নিবিড় আকর্ষণ

ফল্গুধারার মত বয়ে চলেছে চিরকাল। অতর্কিতে সেই অমৃতধারার সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছে মণি।

আবছা অন্ধকার গাছতলায় এসে দাঁড়াল বেগম।

—বীণকার। অস্ফুট আবেগভরা কণ্ঠে ডাকে।

কোন সাড়া নেই। পড়ে আছে আগুন-নেভা কাঠগুলো ; উষ্ণ আবেশময় পরিবেশের পরিবেষ্টন মুছে গেছে, সেই উদাত্ত মধুর সুরের আলাপ ভরা ঠাঁইটা আজ অসীম স্তব্ধতায় আবৃত। বীণকার নেই, কোথায় কোন অজানায় হারিয়ে গেছে সে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল মণিবেগম। নিষ্ফল হতাশায় ভরে উঠেছে সারা মন। সে হয়তো আর ফিরবে না কোনদিনই মুর্শিদাবাদে, ক্ষুদ্র মুর্শিদাবাদের সীমা ছেড়ে বের হয়েছে সে বিশাল পৃথিবীর পথে। আজ মনে হয় হারিয়ে গেল বীণকার।

সেই রাত্রে বেগমের দুচোখে কি এক আবেগ মত্ততার ছায়া দেখে শিউরে উঠেছিল। জবাব দেয় নি তার কথার। বীণকার কোথায় নিদারুণ আঘাত পেয়েছিল মনে।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আশাভরে চাইল। তারার আলোজ্বলা ম্লান অন্ধকারে এগিয়ে আসছে মূর্তিটা। উৎফুল্ল হয়ে ছুটে যায় তার দিকে—বীণকার!

হঠাৎ থেমে গেল বেগম। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না। অন্ধকারে এগিয়ে আসছে ওয়ারেন হেস্টিংসের মূর্তি! সাহেবও দরবেশের সন্ধানে এসেছিল, কিন্তু বেগমসাহেবাকে এখানে দেখবে কল্পনা করেনি সে।

মণিবেগমের সারা মন শিউরে ওঠে! সমস্ত সুন্দরের কল্পনা দিয়ে যে মনের মানুষের কাছে এসেছিল, তার ঠাঁই যে এমনি এক দানব বিস্মৃতির তমসা ভেদ করে এসে দখল করবে এ কল্পনাও সে করে নি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সেই ব্যর্থ অভিসারিকা।

—সেলাম বেগমসাহেবা।

পাঁচলাখ টাকায় কেনা সেলাম। মণিবেগম দাঁড়িয়ে সেইটুকু নিয়েই এগিয়ে গেল রাস্তায় রাখা পালকির দিকে।

—শুনুন! হেস্টিংস এগিয়ে গেল ; চোখের সামনে ভেসে ওঠে মণির কামনাব্যাকুল আগেকার সেই নেশা লাগানো চাহনি, আজ সেই রহস্যময়ী নারীর চিহ্নমাত্রও পায় না খুঁজে ; এ যেন সম্পূর্ণ অন্য কোন নারী। একটু থমকে দাঁড়াল সাহেব। দরবেশের কথাগুলো কানে আসে তার,

—কোন সুন্দরী মেয়ের নেশায় আপনি নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন।

নক্ষত্রের রোশনী প্রতিবিম্ব তুলেছে মণির কালো অথৈ চোখের তারায় তারায়, কি যেন সন্ধান করছে সেখানে হেস্টিংস। নিজের কোন দুর্বলতার আভাস রয়েছে কিনা ওর চোখের মুকুরে তাই দেখতে চায় সে।

নাঃ! হেসে ফেলে ওয়ারেন হেস্টিংস। নারীমাংস অর্থ দিয়ে কিনতে পাওয়া যায়। তাতে মশগুল হয়ে নিজেকে হারাবার কোন সঙ্গত কারণই নেই।

মণিবেগম দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সরু পথে। আজ হেস্টিংসকে প্রকৃতিস্থ দেখে নিজেও যেন বিস্মিত হয়েছে। মদ খেলে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে পশুতে পরিণত হয়। ওর ধাত ঠিক উলটো, মদ না খেলেই ওর অন্তরের প্রকৃত পরিচয় সেই পশুত্ব জেগে ওঠে। মদের জ্বালায় ও ফিরে পায় সাধারণ মানুষের মত একটু বিবেচনার আভাস।

মদ না খাওয়া অবস্থাতেই ওরা ভীষণ কাজগুলো করতে পারে। ঠাণ্ডা রক্তে মানুষ খুন করা ওদের স্বভাব, সাপের মত ক্রুর সে প্রকৃতি। হেস্টিংস তাদেরই একজন।

নির্জন অন্ধকারে লাল আভায় পাইপটা জ্বলছে। ডার্বি জুতোর ডগা দিয়ে ধুনির কাঠকয়লাগুলোকে উড়িয়ে চলেছে আনমনে।

মণিবেগম! সে আজ নীল আকাশের দীপ্তিমাখা তারা, কি যেন অভূত-পূর্ব চাঞ্চল্য জেগে উঠছে সারা মনে, উত্তেজনায় কি যেন নেশার ঘোরে মেতে উঠেছে মন। দুটো কালো চোখ, নিটোল হালকা ছন্দবদ্ধ গতিময় দেহ! হাসির ঝিলিকে ওর আসগারী ছুরির ধার। হেস্টিংস-এর সারা মনে জ্বালা ধরিয়েছে, ব্যর্থ কামনার নীরব জ্বালা।

নিতাব শেখ হন্তদন্ত হয়ে বাগিচায় ঢুকল। চকবাজারে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। ব্যাপারীরা আবার দোকান খুলে বসেছে নতুন চালানি মাল সাজিয়ে। বাজার, চক, গঞ্জ আবার জেঁকে উঠেছে। কোতোয়ালীতে পড়েছে সাজ সাজ রব।

বিবিমহলের মহল্লায় আবার পাহারা বসেছে, উদ্দাম বেলেল্লাপনা আর চলবে না। ইয়ার জঙ্গ দোস্তিদের নিয়ে একটু চিন্তায় পড়েছে। মণিবেগম

আবার মুর্শিদাবাদে আসছে, গদিতে বসছে মীরজাফর। তাকে বিশেষ ভয় করে না কেউ কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারই একটু কঠিন প্রকৃতির লোক। নিজামতের ঢিলেঢালা মরচে-পড়া চাকাটাকে কয়েকদিনের মধ্যেই তেল শান দিয়ে দুরন্ত চালু করে দেবে।

বাগিচায় নিতাব শেখ নিজে তদ্বির করে আম পাড়াচ্ছে তুলোর টুসি লাগিয়ে। হুকুম করে,

—বিমলী, আমগুলো আজই আরকে দিতে হবে।

বাঁদী বিমলী হাসে—কি হবে মিঞা?

—নতুন নবাব বেগম আসছে। কাল ফতোয়া হবে, প্রথম ডালি যাবে মির্জার বাগানের সেরা আম, ওই বিমলী! ওই নামই বহাল হল।

—বাঁদীর বরাত জোর বল?

দাড়ি চুমরোতে থাকে মিঞা। হঠাৎ ইয়ার জঙ্গের দলকে ঢুকতে দেখে একটু বিব্রত হয় নিতাব শেখ। বেহুদ্দা বেসরম জোয়ান। জিবের আড় নেই। কথায় কথায় চাকু চালাতে ওস্তাদ। খানদানী ঘরের বেবশ লেড়কা।

—সেলাম মিঞা।

এগিয়ে এসে টুকরি থেকে না বলে কয়েই কয়েকটা আম তুলে নেয়।

—খাশা দানা দেখছি। যেমন বাঁদী, তেমনি আম। এ যে কালোপাথর। হাবশী খোজার জুড়ি।

ইয়ার জঙ্গের কথায় বাধা দিয়ে ওঠে মিঞা—বেসহবৎ কথা কয়ো না সাহেব। ও আম রেখে দাও। নবাবের খেলাৎ যাবে। পহলা খেলাৎ।

ইয়ার জঙ্গ হেসে ওঠে হো হো শব্দে, ব্যঙ্গের হাসি।

—নবাব! মীরজাফর আবার নবাব, তার জন্য খেলাৎ! আম্‌লা আবার পাখি! আমাকেই দাও মিঞা, ইয়ার দোস্তি নিয়ে বিবিমহলে গিয়ে ফুর্তি করি। তোল বে।

একজন সঙ্গী আমের টুকরিটা তুলে নিতেই বাধা দেয় মিঞা।

—ভাল হবে না বলছি। রাখো ওই আম।

লাফ দিয়ে গিয়ে টুকরিটা ধরে, টানাটানিতে পড়ে গেল আমগুলো মাটিতে। বিলকুল বরবাদ হয়ে গেল এতগুলো ভাল দানা চোখের সামনে। তার সাধের বিমলী গাছের প্রথম ফল। ক্ষেপে ওঠে মিঞা, সঙ্গী দোস্তের কাঁধ ধরে টানতে থাকে—বেরিয়ে যাও বাগিচা থেকে। এখুনিই বেরিয়ে যাও।

—খবরদার!

ইয়ার জঙ্গ নিমেষের মধ্যে কোমরের খাপ থেকে বের করেছে মোরাদাবাদী বিছুয়া, বাধা পেতে মিঞার কাঁধেই বসিয়ে দেয় সেটা। আর্তনাদ করে ওঠে নিতাব শেখ। বিমলী ছুটে গিয়ে তার অবশ দেহটাকে ধরে ফেলে, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়ছে। ইয়ার জঙ্গ দলবল নিয়ে উধাও হয়ে যায়। নিস্তব্ধ বাগানের ঘন সবুজ পাতায় ঝরে পড়ে নিতাব শেখের তাজা খুন। বেদনায় ছটফট করছে লোকটা। গাছ গাছালির মাথায় অভ্ররোদ মাখানো, ওরা যেন শিউরে উঠেছে।

—মিঞা! বিমলী অস্ফুট আর্তকণ্ঠে ডাকছে ওকে।

কথা কইবার সামর্থ্যও নেই। নির্বাক নিস্পন্দ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নিতাব শেখ তার নিজের হাতে গড়া বাগানের দিকে। অবিবাহিত বৃদ্ধ। নিজের ছেলের মতই স্নেহ-মায়া দিয়ে এক একটি গাছকে জন্ম দিয়েছে, বড় করে তুলেছে। তাদের দিকে চেয়ে থাকে, জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে।

দিনের আলোর উষর প্রখরতা মুছে গেছে। শ্যাম সবুজের শান্ত প্রলেপে চোখ বুজে আসে। পাখি ডাকা বাগিচার শুষ্ক পাতার বিছানাতেই শেষ নিঃশ্বাস বের হল নিতাব শেখের।

বিমলী চুপ করে দেখল অসহায় নিবিরোধ লোকটি নীরবে কতবড় অবিচার সয়ে গেল।

বিবিমহলের রাস্তায় সোরগোল করা নিষেধ। জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে আবার আলো জ্বলেছে। রাস্তায় রাস্তায় আবার মশালচী জ্বলন্ত মশাল হাতে ঘুরে নিভু নিভু আলোর খবরদারি করে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বড়নগরের মাথায় দিনের শেষ আলো মুছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সানাইএ বাজে সাহানার সুর। ভোরে পাখির কাকলীতে যোগ দেয় ফৈজাবাদী সানাইদার এরফান শেখের সানাইএর ভৈরো আশাবরীর আলাপ।

প্রাণ স্পন্দন ফিরে আসছে মুর্শিদাবাদে। রাতের আঁধারে পথ-ঘাটে আর মানসুরে-ছ্যাঁচড়ের দল ঘুরে বেড়ায় না। মহারাজ নন্দকুমার নিজের হাতে ভার নিয়েছেন ওদের শায়েস্তার, সদর-উল-হক সাহেবের কাজ বেড়েছে। চোর-ডাকাতের বিচারও চলেছে সমানে। শাস্তি দিতেও কশুর হচ্ছে না।

এমন সময় ঘটল ইয়ার জঙ্গের এই খুনের মামলা। কোতোয়ালিতে নালিশ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি বিমলী বাঁদী, ভয় দেখিয়েছে, দরকার হয় মণিবেগমের কাছেও যাবে। নিতাব শেখ মুর্শিদাবাদে সুপরিচিত লোক, নিরীহ আপন ভোলা মানুষটিকে অনেকেই ভালবাসত। ইয়ার জঙ্গের প্রতাপে ওরা প্রকাশ্যে এতদিন কিছু বলতে সাহস করেনি। যে কোন কথা বলবে, পরদিনই ইয়ারের দল তার সর্বনাশ করে দেবে, বিচারেও কিছু হবে না। সব তালগোল পাকিয়ে দেবে, সদর-উল-হক সাজা দেবার মত কোনই অপরাধের চিহ্ন খুঁজে পাবে না। এই চলছিল এতদিন।

এ হেন ইয়ার জঙ্গ আজ বিপদে পড়ে গেছে। কোতোয়ালি থেকে ফৌজ এসে বিবিমহলে ঢুকে ফুর্তিরত অবস্থায় দলবল সমেত তাকে ধরে নিয়ে গেছে। এই প্রথম টের পায় ইয়ার জঙ্গ জমানা বদলে গেছে। রেজা খাঁয়ের মুলুকের লাল আমেজ ফিকে হয়ে এসেছে। নইলে একটা মামুলি বাঁদীর ফরিয়াদে এমন কড়াকড়ি হবে কেন! সিপাইদের ধমকায় ইয়ার জঙ্গ,

—ছেড়ে দাও বলছি।

রিসালদার বলে—হুকুম নেই সাহেব। কোতোয়ালিতে এত্তেলা দিতেই হবে।

বিবিরা মুখ টিপে হাসে, ইয়ারের কাহিল অবস্থা দেখে রসিকতা করে,

—তোমাকে দামাদ করবে ইয়ার জঙ্গ সাহেব। জল্‌দি যাও।

কে যেন বলে ওঠে—উঁহু, বেগমসাহেবা নওজোয়ান খসম খুঁজছেন কি না, তাই এত্তেলা পাঠিয়েছেন।

কথা কইল না ইয়ার জঙ্গ। বেইমান মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে মনে মনে গজরায়। কম সোনা দানা দিয়েছে ওদের? তবুও যে বেইমান বে-কবুল, তেমনিই রয়ে গেল ওরা।

—শরাবীর পেয়ালা শেষ করে যাও সাহেব। বলে ওঠে কম বয়সী একটা ফচ্‌কে মেয়ে।

—চোপরও।

ইয়ার জঙ্গ হাতের শূন্য গেলাসটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নেমে গেল ফৌজের সঙ্গে। ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল তারা। এতদিন এত খুন জখম রাহাজানি ফ্যালসানি কেসেও কিছু হয়নি, আজ বিমলী বাঁদীর নালিশে ধরা পড়ল ইয়ার জঙ্গ।

রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পিক্র সাহেব দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার ধারে সেই বটতলায়। কোম্পানি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করে; দেশী বণিকরাও বাণিজ্য করে, তবে তাদের শুল্ক চৌলিশা, চল্লিশ টাকায় এক টাকা হারে। কিন্তু পিক্রকে যদিও বা শুল্ক দিতে হয় তাও অর্ধেক মাত্র। কোম্পানির নিশান তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঝ গঙ্গায় কয়েকখানা মালগুজারী নৌকা। মুঙ্গের থেকে এসেছে তামাক; মির্জাপুর থেকে রেশম আর আছে কলকাতা থেকে খালাস করে পিছনকার দরজা দিয়ে পাঠান বিদেশী মদের পিপে বোঝাই নৌকা।

ছোট ডিঙ্গিতে নিঃশব্দে খালাস হচ্ছে মালগুলো। নদীর ধারেই পিক্র সাহেবের গুদামে উঠছে কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠিতে না গিয়ে। কোম্পানির সাহেবদের চোরা চালানের এই মালগুলোর মালিক পিক্র সাহেব, এই ভাবে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করার জন্য তার জিনিসের দাম বাজারের আরও অন্যের চেয়ে অনেক কম, অবশ্য এর জন্য একটা মুনাফার অংশ সাহেব-দিকে দিতে হয়, হেস্টিংস নিজেও এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। মাস মাস বেশ কিছু টাকা জমা পড়ে তার নামে।

আজ হঠাৎ কোন দিকে কি হয়ে গেল! পিক্র সাহেবও অবাক। তার মাল গুদামে নবাবী কোতোয়াল নিজে এসে হাজির। সঙ্গে কয়েকজন ফৌজ। নৌকা বজরা মালপত্র সব আটক করতে হবে। পাকাপাকি হুকুম।

—কোতোয়াল সাহেব! গা ঢাকা অন্ধকারে পিক্র সাহেব প্যান্টের পকেট থেকে কিছু রেস্ত বের করে এগিয়ে দেয়।

—মাপ করবেন সাহেব। আজ আর উপায় নেই। ও মালপত্র ছাড়তে পারবো না।

—হঠাৎ সাধু ফকির হয়ে গেলে যে?

—নিজামত বড় কড়া, জানেন তো মহারাজ নন্দকুমারকে? তার সামনে দিয়ে স্ুঁচ গলবার উপায় নেই। চারদিকে তাঁর হুঁশিয়ারি নজর।

—হুঁ। কি যেন ভাবছে পিক্র। রেজা খাঁ থেকে শুরু করে সাহেব সুবো অবধি তার হাতের মুঠোয়। কোম্পানির কুঠিতে নানা মালপত্রের সঙ্গে নবাব মহলের তাজা সাচ্চা মতির টুকরোর মত খবরও পাঠায় সে। অথচ তারই লাখো টাকার মালপত্র ধরা পড়বে, শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করার অপরাধে কয়েদীর মত তাকে হাজতে থাকতে হবে এ সংবাদটা সে নিজেই পায় নি এতদিন।

পিক্র বলে ওঠে—কারবার করতে দেবেন না মহারাজ দেখছি। চলো, কোতোয়ালিতেই যাই। তবে মালপত্রগুলোর দিকে একটু নজর রেখো বাবা, যেন রক্ষক আবার ভক্ষক না হয়। তোমরাই সাফ করে দিও না।

হাসে এতাবৎ খাঁ কোতোয়াল—তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে সাহেব। তাজ্জব মুরশুদাবাদে রাতারাতি নিজামতের হুকুম বদলায়, এখানে তাও সম্ভব। আমরা হুকুম তামিল করছি মাত্র।

এতাবৎ খাঁ বাধ্য হয়েই এই কাজ করছে উপরের হুকুম মোতাবেক, এ অনুমান করতে পারে পিক্র সাহেব।

মহারাজ নিজামতে ফিরে এসেই সব গোলমাল দেখে অবাক হন। ক'বছর যেন ঝড় বয়ে গেছে। কাগজপত্র হিসাব নিকাশ সবই এদিক ওদিক হয়ে আছে। বিচার বিভাগের কাজে প্রভূত গণ্ডগোল, কোন কিছুরই নিষ্পত্তি হয় নি। রাজা-জমিদারকে বাকি করের জন্য কেবল জুলুম করে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে, কারো কারো নাম জমিদারী নাকচের জন্য তৈরি রাখা হয়েছে। তাদের জমিদারী লাটে উঠিয়ে নিশ্চিন্ত হবার ব্যবস্থা করে রেখেছে রেজা খাঁ।

বর্ধমান, নাটোর, দিনাজপুর, বাহিরবন্দ কাছারী থেকে অনেক অনুরোধ উপরোধ আসা সত্ত্বেও তাদের কোন আর্জিই নিজামতে পেশ করা হয়নি।

মনে হয় কেবল বাঁ হাতের তঙ্কাতেই নিজামতের কর্মচারীরা কাজ চালিয়েছে। কোতোয়ালির বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ। রেজা খাঁ, সদর উল হককে নিজের খাস কামরায় ডাকিয়ে এ সম্বন্ধে জানিয়ে দেন পরিষ্কার ভাবে।

—খাঁ সাহেব, অতীতে যা ঘটেছে তাতে হাত নেই। এ সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন বর্তমানে না ঘটে।

রেজা খাঁ সাহেব কথাটা বেশ বুঁঝতে পারে। অনুরোধ না আদেশ তাও জানে, সুবে বাংলার মসনদের ডানহাত হয়ে কাটিয়েছে ক'বছর। ইংরেজ সরকারের হুকুম তামিল করেছে আর নিজের সঞ্চিত ধনের পরিমাণ বাড়িয়েছে। সেই শান্তির জীবনে হঠাৎ ধুমকেতুর মত আবির্ভাব হয়েছে এই মহারাজের।

তাঁর সম্বন্ধে নবাবকে নানা অভিযোগ করবার চেষ্টা করেছে আগেই। ধনদৌলত কিছু ভেট দিতেও গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পর মীরজাফর

খাঁকে দেখে শিউরে ওঠে রেজা খাঁ, মনে মনে খুশিই হয়। চোখে মুখে হতাশার নিবিড় ছায়া। হাত-পায়ের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে। দুরারোগ্য রোগে বিকৃত হয়ে গেছে মুখের আদল। ওকে অবাক হয়ে যেতে দেখেই হেসে ফেলে নবাব, পরিষ্কার কণ্ঠে বলে ওঠে,

—ভয় পেয়ে গেছেন খাঁ সাহেব? ভবিষ্যতের জন্য আপনিও সাবধান হোন। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখেও নিজামতের আর সবাই শিখুক, তাতেই কাজ হবে।

ভাঙে তবু মচকায় না। মরতে বসেছে তবুও হাড় জ্বালা করা কথা যায় নি।

মনে মনে গজরাতে থাকে রেজা খাঁ। মুখে বলে।

—না জনাব, খোদার মেহেরবানিতে গোনাহ্ এখনও লাগেনি।

—পুণ্যের শরীর। গোনাহ্ সইবে না আপনার।

মীরজাফর খাঁ যেন ব্যঙ্গই করছে রেজা খাঁকে। তার কাছে নবাব নিজামতে মহারাজের কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলার চেষ্টা করাও বাতুলতা মাত্র। হঠাৎ পাশের ঝরোখার দিকে নজর যেতেই মাথা নামিয়ে কুর্নিশ করতে থাকে রেজা খাঁ, এলেমবাজ আমলা। বেগমকে সেলাম জানিয়ে বের হয়ে এল। কি যেন একটা ফন্দি খেলে যায় মাথায়। জবর ফন্দি।

একেবারে সোজা মীরজাফরের কাছে নালিশ করতে এসে ভুলই করেছিল খাঁ সাহেব। উর্বর মস্তিষ্কে গজিয়ে চলেছে মতলব। বাংলার নবাবী এখন বেগমের কব্জায়; সুতরাং আর্জি খিলাত সব তারই দরবারে সোজা পৌঁছান দরকার। এবার থেকে নতুন পথে চলতে চিন্তা করে তীক্ষ্ণধী রেজা খাঁ।

মীরজাফর মানুষের জগৎ থেকে বাতিল হয়ে আসছে।

দখলম থেকে দেখা যায় দীর্ঘ দেহটা পড়ে আছে ডিভানের উপর। পাশে কে এক খুবসুরৎ বাঁদী শরাব ঢেলে মুখের কাছে ধরছে। শূন্য গ্লাস পূর্ণ করে আবার এগিয়ে দিচ্ছে। জীবনের সব স্মৃতি ভুলে যাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে মীরজাফর। কোন পুণ্য স্মৃতির স্পর্শ ওর জীবনে নেই। মনের বৃশ্চিক জ্বালা আর দুরারোগ্য রোগের দুঃসহ ব্যথা ভোলবার জন্যই ওই পথ তাকে নিতে হয়েছে। নিজামত পুড়ে খাক হয়ে যাক, মহারাজ নন্দকুমার যা ইচ্ছে তাই করুক, তাতেও বিন্দুমাত্র আপত্তি সে তুলবে না।

পিক্র সাহেবের পিছনে একটি বড় চক্র আছে। পুকুরজোড়া জালের

শিরদাড়ি ওই পিক্র। তাকে কায়দা করে টেনে তুলতে পারলে কোম্পানির সাহেবদের অনেক গুহ্য সংবাদ পাওয়া যাবে। কাশিমবাজার কুঠির হালচাল, বেনামীতে লাখো লাখো টাকার কারবার, বিনা শুল্কে মদের ব্যবসা ; এমন কি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ওর গুপ্তচর বৃত্তির অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্যও বের হয়ে পড়বে।

রেজা খাঁ সাহেব গোপনে কাশিমবাজার কুঠিয়াল স্কটের সঙ্গে দেখা করে। পিক্রসাহেবের চিঠি নিয়ে, খোদ হেস্টিংসকে লেখা সীলমোহর করা সে চিঠি। কয়েদখানা থেকে পিক্র সাহেব সব কথাই জানিয়েছে। স্কট একটু বিস্মিত হয়, যেন ঘাবড়ে গেছে তারা। তখুনিই সোয়ার ছেড়ে দিল কলকাতার কুঠিতে জরুরি সংবাদ পৌঁছানর জন্য। পিক্রকে ধরে মহারাজ যেন মৌচাকে ঢিল মেরেছেন। কে জানে মহারাজ সব টের পেয়েই হয়তো কয়েদ করেছেন ওকে।

ক্লাইভ এসেছেন কলকাতায়, তিনি যদি জানতে পারেন কোম্পানির সাহেবরা কোম্পানির নিশান উড়িয়ে নিজেরাই বিনা শুল্কে বাণিজ্য করে লাখো টাকা মুনাফা করছে, সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে।

স্পষ্ট বলে ওঠে স্কট,

—আপনিও একটা কিছু উপায় ভাবুন খাঁ সাহেব। অবশ্য কাজ হাসিল হলে যথাযোগ্য ইনাম পাবেন। ওকে খালাস করতেই হবে।

ভাবছে খাঁ সাহেব ; পথের আলো যেন একচিলতে দেখতে পাচ্ছে সে। অবশ্য কিছু লাগবে ; রেজা খাঁ দাড়িতে হাত বুলোয়।

—দেখি সাহেব। বড় শক্ত মানুষ ওই নন্দকুমার। হেস্টিংস সাহেব জেনে শুনেও ওই সব লোককে রাখবেন। ওরা না নেবে ঘুষের বখরা, না নেবে কিছু। দিনরাত যেন শিং উঁচিয়ে আছে। ওসব লোক দিয়ে আর যেখানকার কাজ হোক চলতে পারে কিন্তু নিজামতের কাজ অচল। দেখুন দিকি কি এক ঝামেলায় ফেলেছে। ঝুট ঝামেলা।

—আই এম হেল্পলেস রেজা খাঁ।

স্কট নিরুপায়। তবে মহারাজের ওপর কড়া নজর রাখা দরকার। পিক্রর অন্যান্য লোকজন বাইরেই আছে, নিজামতের কর্মচারীদের দু-চার জনও মাস মাইনে পায় তার কাছ থেকে, তাদের একটু সতর্ক থাকতে বলে দেন তিনি রেজা খাঁয়ের মারফত।

—সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সাহেব। কোম্পানির সাহেবদের গায়ে আঁচড়টি লাগতে দোব না। তবে আমার কথাটা?

রেজা খাঁ এই সুযোগে দরবারও সেরে ফেলে। কাজ উদ্ধারের জন্য ইংরেজ যাকেই হোক না কেন প্রতিশ্রুতি দিতে কখনই পিছুপা নয়। রেজা খাঁ ওদের সেই প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করে।

নাটোরের রাণী ভবানীর স্টেটের নায়েব এসেছেন—ছোটখাটো কয়েকটি স্টেটের জন্য দরবার করতে। বাকি করের দায়ে তাদের সবকিছু যেতে বসেছে। রেজা খাঁয়ের সঙ্গে কোন আপোশ আলোচনা সম্ভব হয়নি, মিটমাটের যে দর তিনি বকশিশ বাবদ হেঁকেছেন তাতে ন্যায্য রাজস্বই মিটিয়ে দেওয়া যায়।

নন্দকুমার ওদের অভয় দেন,

—আপনারা একবারে না পারেন ন্যায্য খাজনা সুদসমেত কিস্তীবন্দীতে মিটিয়ে দিন। আমি তিন কিস্তীতে দেবার ফরমান বের করে দিচ্ছি।

—হবে? ওঁরা যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না কথাটা। সব সম্পত্তি হস্তচ্যুত হয়ে যেতে বসেছিল, ঢুকতো কোন মুসলমান ফৌজদারের কবলে মোটা টাকায় বন্দোবস্ত হয়ে, সেটা রদ হয়ে যাবে, উপরন্তু কিস্তীতে বাকি কর শোধ করতে পারবেন এ যেন পরম সৌভাগ্য তাঁদের।

আশ্বাস দেন নন্দকুমার—আপনারা এবেলা নিশ্চিন্তে অতিথিশালায় গিয়ে স্নানাহার সেরে বিশ্রাম করুন, ওবেলায় এসে নবাবের পাঞ্জা বসানো ফরমান পেয়ে যাবেন।

নায়েব বলে ওঠেন—দীর্ঘজীবী হোন মহারাজ।

মণিবেগম প্রথম সেদিন দেখেছিল খাঁ সাহেবকে। তীক্ষ্ণ বাজপাখির মত নাকের কোলে দুটো জলজলে চোখের চাহনি, ওর চলাফেরার মধ্যেই কেমন একটা সাবধানী ভাব ফুটে ওঠে। ওর বাইরে যদি একভাগ প্রকাশ হয়ে থাকে কোথাও, অন্তরে না বলা রয়ে গেছে তার অনেক বেশি।

এদের শ্রেণীকে চিনতে দেরি হয় না।

আজ খাসবাঁদীর মারফত খবর পাঠিয়ে এত্তেলার অপেক্ষা করছে খাঁ সাহেব বাইরে।

মীরজাফর নেশায় অচৈতন্যপ্রায় হয়ে পড়ে আছে। এই সময় রাজ্যে যত অনাচার অত্যাচার ঘটবে, তা নয় মহারাজ শক্ত খুঁটির মত বসে আছে সব পথ আগলে।

প্রথম নজরানা দিয়ে সেলাম করল রেজা খাঁ পর্দানসীন বেগমকে। বালুচরী সিল্কের সবুজ কল্কাদার রুমালে কয়েকটা আশরফি সামনে রেখে হাঁটু মুড়ে অভিবাদন জানাল। একটু চমকে ওঠে বেগম। এ স্বীকৃতি কেউ তাকে দেয় নি। এই মহলেই সে কয়েক বৎসর আগে তওফাওয়ালী হয়ে এসেছিল, আজ কালের বিবর্তনে সেইখানেই বসে মণিবেগম তার পদস্থ কর্মচারীর কাছে নজরানা নিয়ে দরবার করছে।

কোথায় একসঙ্গে টিকটিক করে উঠল একজোড়া টিকটিকি। বেগম-সাহেবার নবচেতনার প্রথম উন্মেষক্ষণ শুভদা না অমঙ্গলভরা কে জানে! বেগমসাহেবার ওদিকে নজর দেবার সময় নেই। রেজা খাঁ বলে চলেছে,

—মহারাজ নন্দকুমারই নিজামতের সব কাজ পণ্ড করে তুলেছেন বেগম-সাহেবা। ইংরেজের স্বার্থে কোন ঘা লাগলে তারা সহ্য করবে না, মীরকাশিমের অবস্থা দেখে তা অনুমান করেছেন বোধ হয়।

একটু চমকে ওঠে মণিবেগম। পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে কেনা মসনদ; এত সহজে বানচাল হয়ে যায় তা ঠিক চায় না সে! জীবনের মান প্রতিপত্তির এই আরম্ভ, অতর্কিতে শেষ করে দিতে চায় না এই বিচিত্র স্বপ্ন।

—কেন? মহারাজ আবার কি করলেন? প্রশ্ন করে বেগম।

বলে ওঠে রেজা খাঁ--কোম্পানির তিনটে মালবোঝাই নিশান তোলা জাহাজ আটক করেছেন, ওদের লোক পিক্র সাহেবকে কয়েদখানায় পুরবার আয়োজন চলেছে। বান্দার ভাইপো ইয়ার জঙ্গকেও মিথ্যে খুনের মামলায় জড়িয়ে আমাকে অপদস্থ করতে চান লোকের চোখে।

—ইয়ার জঙ্গকে! বেগম একটু বিস্মিত হয়। হাতের ক্ষমতার ব্যবহার করার জন্য কেমন যেন নিশপিশ করছে মন।

—হ্যাঁ বেগমসাহেবা। দেখেছেন তাকে। খুবসুরৎ ইমানদার লেড়কা, তাকেও রেহাই দেননি মহারাজ।

—তাজ্জব!

একটু চটে ওঠে মণিবেগম। সে মীরজাফরের ইচ্ছাকে পূর্ণ করবার জন্যই হেস্টিংসের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল মহারাজকে বহাল করবার জন্য। কিন্তু বিষবৃক্ষ রোপণ করা হবে ভাবে নি তখন।

— নবাব কি বলেন?

—গোস্তাকী মাপ হয় বেগমসাহেবা, তিনি প্রকৃতিস্থ নন। তাঁকে মহারাজ হাতের মুঠোয় করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তার নাম নিয়ে নিজেই নবাবী চালাচ্ছেন। এতে বিপদ আপনারই; গদির নেশাটা একবার পেয়ে বসলে সর্বনাশ ঘটাতেও কশুর করবে না। আপনার ছেলেরও ভবিষ্যৎ আছে।

রেজা কথাগুলো বলে চলেছে আর তির্যক দৃষ্টিতে দেখছে বেগমের মুখের প্রতিটি রেখার সূক্ষ্ম পরিবর্তন। মনের ঝড় মুখের উপর ফুটে উঠছে। শক্ত হয়ে ওঠে বেগমসাহেবা। পায়চারি করতে থাকে। স্বামী অকর্মণ্য, অপদার্থ। মহারাজার কর্মদক্ষতাকে মনে মনে আজ ভয় করে মণিবেগম। রেজা খাঁ চুপ করল। জিব দিয়ে যতখানি গরল ছড়ান সম্ভব ছড়িয়ে ক্ষান্ত হয়েছে সে। গরলের জ্বালায় ছটফট করছে বেগম।

—আপনি এখন আসুন খাঁ সাহেব, এ সম্বন্ধে ভেবে দেখি। দরকার হয় পরে স্মরণ করব।

বেগম চিন্তিত হয়ে পড়েছে। মসনদের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে।

রেজা খাঁ গদগদ কণ্ঠে বলে,—বহুৎ মেহেরবানি আপনার। তবে ইংরেজ যাতে খুশি থাকে তার ব্যবস্থা করাই ভাল বেগমসাহেবা। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করতে নেই। বান্দার কথাটা ভেবে দেখবেন। কুর্নিশ করে বিদায় নিল খাঁ সাহেব।

জানালার বাইরে গঙ্গার বিস্তীর্ণ নিস্তরঙ্গ জলে পড়েছে দিনের আলো; হাজারো মানিক মাথায় নিয়ে আনন্দে ঝলমল করছে সে। বেগম শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে আরও দূরে হীরাঝিলের দিকে; রাক্ষসী গঙ্গা এগিয়ে চলেছে ওর দিকে হাজারো ফণা মেলে যেন সিরাজের শেষ কাহিনীটুকুকেও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিতে চায়। রেজা খাঁয়ের সাবধানী কথাগুলো মনে পড়ে বার বার।

মীরজাফরের ঘরে বুব্বুকে প্রায়ই যাতায়াত করতে দেখে মণিবেগম। বুব্বুকেও যৌতুক স্বরূপ গছিয়ে গেছে বিশুবেগ। আজ হঠাৎ তাকে মীরজাফরের বিছানায় বসে থাকতে দেখে যেন জ্বলে ওঠে সে। উঠে গেল বুব্বু ওকে দেখে। মণিবেগম নবাবের ডিভানের দিকে এগিয়ে যায়।

মীরজাফরও ওর থমথমে মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—মহারাজের নামে অনেক নালিশ আসছে। বেগমের কণ্ঠস্বরে উষ্মা ফুটে ওঠে।

হালকা স্বরে বলে ওঠে মীরজাফর—বেগমসাহেবা দেখছি আজকাল দরবার নিজেই করছেন। নালিশ করেছে কে? রেজা খাঁ বোধ হয়?

একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে মণিবেগম মীরজাফরের মুখের হাসি দেখে।

মীরজাফর বলে—ওদের চেয়ে আমার বদবুদ্ধি কোন অংশেই কম ছিল না বেগম, জীবনে বহুৎ অনাচার পাপ বিশ্বাসঘাতকতা করে ভেবেছিলাম দুনিয়াতে অনেক করলাম। হম্ সে দিগর নাস্তি। কিন্তু আজ আমাকে দেখে শেখো বেগমসাহেবা পাপের পরিণাম কি। মীরণ গেছে, মীরকাশিম গেলো—ও ভুল আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছে তার। বেগম এই হতাশার সুর সইতে পারে না। বলে ওঠে—মহারাজের হাতে সব ভার তুলে দেওয়া নিরাপদ নয়।

বিছানায় উঠে ব'সে জাফর আলি খাঁ দৃঢ় কণ্ঠে বলে,

—অনেক সুখ দুঃখের মাঝে ওকে চিনেছি আমি, সারা বাংলায় সোনার চেয়ে খাঁটি এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি চোখে পড়ে নি। একটা কথা স্মরণ রেখো—মুসলমান হয়েও এ-কথা বলছি; হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রতিদিন খাবার পর পাতে শতান্ন ফেলে ওঠে, অন্য প্রাণীদের জন্য। তাদের সংস্কারই পরোপকার করা, তাদের হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়; কিন্তু আমার জাত ভাই মুসলমানের হাতে রাজ্য দিলে—রাজ্য সে নেবেই; সিংহাসন নিষ্কণ্টক করে বেগমসাহেবাকেও দখল করবার জন্য নবাবকে হত্যা করতেও কশুর করবে না। বাদশাহী আমলের ইতিহাসও তাই বলে।

চটে ওঠে মণিবেগম, কি যেন ইঙ্গিত করতে চায় ওই অপদার্থ নবাব।

মীরজাফর হাসছে, বেগমের মুখ চোখ রাগে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

—অন্য কোন ইঙ্গিতই আমি করিনি বেগমসাহেবা।

—নন্দকুমারকে কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ করেন না?

—না। ছোট একটু জবাব দিয়ে মীরজাফর মুখ ফিরিয়ে নিল। এ সম্বন্ধে বাক্যালাপ করার প্রয়োজনও বোধ করল না। মণিবেগম নীরবে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে, মনে মনে আজ শিউরে উঠছে সে। সামনে একটা সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে। সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে হবে ওই ব্রাহ্মণকে?

নন্দকুমার আর নবাব একদিকে, অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারী, নিজামতের ওই রেজা খাঁ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাংলার মসনদের সমস্যা। মণিবেগম মুখ বুজে কি যেন ভাবছে, হালকা ঠোঁটে ফুটে ওঠে নিষ্ঠুর দৃঢ়তার ছাপ।

বের হয়ে আসছে বেগম। বুব্বু যেন বাইরে কান পেতে ওদের কথাগুলো শুনছিল সাগ্রহে। মণিবেগম বের হয়ে আসতেই সে এগিয়ে আসে। সাবধানে মীরজাফরের রোগজীর্ণ দেহ তুলে শুইয়ে দিল বিছানায়। গায়ে ছড়িয়ে দিল গোলাবী আতর, ধূপদানে একমুঠো সুগন্ধি গুগ্‌গুল গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়ে সরবতের গেলাসটা এগিয়ে দিল।

আজ আর ওকে হিংসা করে না মণিবেগম। রোগজীর্ণ অকর্মণ্য দেহটাকে নিয়ে শিয়াল শকুনের দল ছেঁড়াছেঁড়ি করুক, ফিরেও চাইবে না সে।

তার চোখের সামনে বেগমের পদমর্যাদা, দরবারের সম্মান আর রূপের প্লাবন তুলে বাংলার শাসনভার চালানোই একমাত্র স্বপ্ন বলে মনে হয়। এর জন্য যেটুকু চেষ্টা, ত্যাগ স্বীকার করা দরকার সে করবে। নেশার মত পেয়ে বসেছে তাকে প্রভুত্বের স্বাদ।

কয়েদখানায় মৌজসে বসে আছে দোস্তদের নিয়ে ইয়ার জঙ্গ। পিক্রুসাহেবও এসে জুটেছে দলে। পাহারাদারই যুগিয়েছে মদের বোতল, মোরগ মোসল্লেম। পিক্রুসাহেব হিসাব করছে কদিনে তার কয়েক হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে। বের হয়ে কোম্পানির ফরমান নজির দেখিয়ে নিজামত থেকে সব খেসারৎ দাবী করবে। ইয়ার জঙ্গ বলে ওঠে,

—দিল চাঙ্গা করো সাহেব। ও হিসেব-কিতেব পরে করো। নিক্ না নিজামত কত নেবে, দুধে হাত পড়বে না। বোতল খুলে অর্ধেক জল মিশালেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমার পয়সা খায় কে বাবা, ধরো।

পিক্রুসাহেবের দিকে এগিয়ে দেয় গেলাসটা আর একটা মুরগীর ঝলসানো দাবনা। ওদিকে বাঈজী ঢংএ ঠুংরী গজলের শের গাইছে একজন রসিক দোস্ত, লক্ষ্ণৌ থেকে নবাবী মুলুকে এসে ঝামেলায় পড়ে গেছে। চোখ ইশারা করে বাবরি চুল দুলিয়ে গাইছে সে,

—দিদার বাদা হস্ লা সাকী নিগাহ হে মস্ত!
বাজ মে খেয়াল ম্যয় কাদহ্‌এ বে খরোশ্ হায়॥

প্রিয়াকে কাছে পাবার আশা মদের নেশার মত ঘিরে ধরেছে আমার সারা মন ; কিন্তু যখনই কল্পনা করি তাকে আর কোনদিনই পাবো না, সে দূরের তারার মতই অধরা, তখন ব্যাকুল হয়ে উঠি, সে নেশা বিলকুল কেটে যায়।

গজলের সুর তালিমী তালে কেঁপে উঠেছে পাথরের বন্ধঘরের খিলানে। একফালি আলোয় রাঙ্গা হয়ে উঠেছে ওদের মুখ চোখ, জেলখানাতেই মহ্‌ফিল বসিয়েছে। নেশার ঘোরে ইয়ার জঙ্গ গজলদারের গালে একটু চুম খেয়ে বলে ওঠে,

—সাবাস, তোকে নিয়ে গোরে যেতেও রাজী আছি মেরাজান।

সুরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। পিক্রসাহেব এ সব বোঝে না, নিবিষ্ট মনে মুরগীর ঠ্যাং চুষছে আর মাঝে মাঝে চুমুক মারছে পিয়ালায়।

হঠাৎ কয়েদখানায় যেন আশমানের হুরী নেমে এসেছে। গজলদার খামোস হয়ে গেছে। দুহাতে ঢোলা পাঞ্জাবির খুঁট ধরে ঘাঘরার ইশারা এনেছিল, হাত নামিয়ে সেও তাজ্জব বনে গেছে। ওরা উঠে দাঁড়ায় সকলেই।

ইয়ার জঙ্গ অবাক হয়ে যায়—বেগমসাহেবা!

পিক্রসাহেব হাতের ঠ্যাং সমেত উঠে দাঁড়িয়েছে। রেজা খাঁ পিছনে রয়েছে। একনজর দেখেই বুঝতে পারে কয়েদখানায় কেমন দুঃখে আছে তার পিয়ারের ভাতিজা।

ইয়ার জঙ্গ আর পিক্রসাহেবকে নিয়ে প্রহরী বের হয়ে এল ওদের সঙ্গে। পিছনে পড়ে রইল দোস্ত ইয়ারীর দল। ওরা দুজনে বের হয়ে যেতেই দরজাটা আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

—কি হলো মেরাজান? একজন ইয়ার চেঁচিয়ে ওঠে।

গজলদার বলে ওঠে—চিড়িয়া উড় গিয়া।

বাইরে থেকে সিপাই ধমক দিয়ে ওঠে,

—সোর মৎ করনা। খামোশ রহ উল্লুকা বাচ্চোঁ।

সেই চিরন্তন ব্যবহার। যারা যাবার তারা চলে গেছে, পিছনে পড়ে রইল কমজোরী মোসাহেব দল। কে জানে নিতাব শেখের খুনের নতুন আসামী আবার কে হবে! একটা ভয়ের কালোছায়া নেমে আসে ওদের মুখে চোখে, সোরগোল, সুর সব স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে সন্ধ্যারতি চলেছে। ঘন বনছায়া ঢাকা জায়গাটা

কাঁসর ঘণ্টা টিকারার শব্দে ভরে উঠছে। সতীর কিরীট পড়েছিল এখানে, হিন্দুদের বাহান্ন পীঠের একটি পীঠস্থান। বিজন ছায়াঘেরা বনে কালের প্রহরা এড়িয়ে টিকে রয়েছে সেই মন্দির। নাটোরের দানশীলা রাণীভবানীই সেবা-ভোগ রাগের ব্যবস্থা করেছেন।

প্রশস্ত নাটমন্দিরে দর্শকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন মহারাজ নন্দকুমার। পঞ্চপ্রদীপের শিখা কাঁপছে, ধূপের ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে মন্দির মনোমুগ্ধকর সৌরভে; চোখ বুজে কি যেন অনুভব করছেন মহারাজ সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। সেই অনুভূতির স্পর্শ সঞ্জীবিত করে তোলে সমস্ত দেহ মন নিষ্কাম সেবায় বিলিয়ে দিতে। জ্যোতির্ময় একটি শান্ত মধুর অনুভূতি, আরতি শেষে ভক্তিভরে প্রণাম করেন ব্রাহ্মণ, অন্তরের সমস্ত আকুতি নিঃশেষ নিবেদনে ঝরে পড়ে অপূর্ব একটি আনন্দশ্রীমণ্ডিত রূপে। প্রায়ই আসেন তিনি মনোরম এই শান্তিঢালা স্থানে উদাস অপরাহ্ণ বেলায়। অল্পক্ষণের জন্যও রাজনীতির পঙ্ককুণ্ড থেকে অপূর্ব মুক্তির স্বাদ পান।

গঙ্গার শান্ত জলের বুকে দাঁড়ের শব্দ উঠছে; নৌকার গলুইএ স্রোতের ধারা কলকল আঘাত হেনে সুর বাজায়, দেখা যায় মাঝ গাংএ কয়েকটা নোঙর করা মালগুজারী নৌকা। কোম্পানির নিশান লটকে পিক্রুসাহেব এতেই মাল পাচার করে, হঠাৎ নৌবহরের কাছে এসেই একটু অবাক হয়ে যান মহারাজ, ছোট ডিঙ্গি বেয়ে পিক্রুসাহেব এসে উঠল বজরায়; আশেপাশে আরও কয়েকখানা নৌকা বাঁধা, মালপত্র খালাস হচ্ছে তার থেকে। অথচ ওই বজরা আটক করবার আদেশ দিয়ে পিক্রুকে কয়েদখানায় রাখা হয়েছিল।

সেই পিক্রুসাহেব কয়েদখানা থেকে কি করে খালাস পেল ভাবতেই পারেন না তিনি।

মাল-নৌকা থেকে হেঁকে ওঠে কে একজন বাজখাঁই গলায়—কার নৌকা?

অর্থাৎ অন্য কোন নৌকা তাদের গোপন কার্যকলাপ দেখে শুনে যায় তা চায় না তারা। এ নৌকার মাঝি নন্দকুমারের ইশারায় জবাব দেয়,

—রাহী নৌকা।

আসল পরিচয় চেপে গেল তারা।

মহারাজের মুখে ফুটে ওঠে চিন্তার সুস্পষ্ট রেখা। কি ভাবছেন তিনি!

কয়েকদিনের মধ্যেই ঘটে গেছে ব্যাপারটা। একেবারে শিরে সর্পাঘাত।

পিড়কে যদি চাপ দেন নন্দকুমার, সব তথ্য, গুপ্তচরবৃত্তি—এমন কি নন্দকুমারের সেই ধরাপড়া চিঠিপত্র, আরও অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যাবে। কলকাতার কুঠিতে খবর পৌছতেই শশব্যস্ত হয়ে কাশিমবাজারে ছুটে এসেছে ওয়ারেন হেষ্টিংস নিজেই।

মণিবেগম আজ এগিয়ে যায় না। শিখার চারপাশে আছড়ে-পড়া পতঙ্গের মত এসে পড়েছে হেষ্টিংস। যোগাযোগ ঘটতেও দেরী হয় না। এবার বেগমকে তারই প্রয়োজন।

আজ প্রথম এসেছে হেষ্টিংস, রেজা খাঁয়ের মত সেও এনেছে নজরানা; দুটো কমল হীরার টুকরো, হল্যাণ্ডের জহুরীর হাতে নিখুঁত ভাবে কাটাই করা, চারিপাশেই তার তীব্র শিখা ঠিকরে পড়ছে; হাঁটু ভেঙ্গে ঈষৎ মাথা নামিয়ে দাঁড়াল সাহেব। কলকাতার সেই উদ্ধত কামনা বিহ্বল বিদেশী এ নয়।

—নবাব কেমন আছেন? নেহাত ভদ্রতা হিসেবেই প্রশ্ন করে হেষ্টিংস।

—তেমনিই, আরও খারাপ হয়ে পড়েছে শরীর।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হেষ্টিংস তার মুখের দিকে চাইল। অর্থ অতি পরিষ্কার। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত দিতে চায়, সেটা মণিবেগমও বুঝতে পারে।

—একটু আলাপ-আলোচনা ছিল। হেষ্টিংস কি যেন নিভৃতে বলতে চায়।

দুজনকে নিয়ে মতিঝিলের পাশ দিয়ে গাড়িখানা চলেছে। ছায়াচ্ছন্ন সবুজ দিগন্ত সীমায় বৈকালের গিনিগলা রোদ ম্লান, গাঢ়তর হয়ে আসছে। পাখির কাকলিতে মুখর আকাশ, বাতাসে মতিঝিলের অগণিত পদ্মের সুবাস। পদ্মবন থেকে মাঝে মাঝে উড়ছে বকের ঝাঁক, গুনগুন সুরে মৌমাছির গুঞ্জন। দু'একটা ভ্রমর পথ ভুলে গাড়ির আশে-পাশে ঘুরছে, হেষ্টিংসের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কয়েক বৎসর আগে রাজমহলের কাছে এমনি এক পদ্মদিঘির ধারে নির্জন অপরাহ্ণ বেলা।

উদাস স্মৃতির সায়রে তুফান উঠেছে; এক ঝলক দেখা সেই কল্পনা আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে মণিবেগম এসে পড়ছে সাহেবের গায়ে। একটু ওর উত্তপ্ত স্পর্শ সারা শরীরে শিহরণ আনে। কোন এক দুরন্ত মন জেগে উঠছে ধীরে ধীরে, যাকে হেষ্টিংস নিজেই ভয় পায়। এই তার স্বাভাবিক পরিচয়। পেগ, কয়েক পেগ মদ গলায় ঢাললে বোধ হয় এই দুরন্ত অচেনা মনকে কিছুটা

শান্ত করতে পারত। কিন্তু তারও উপায় নেই এখানে। নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছে সে।

বেগম ওর মুখচোখের দিকে চেয়ে কিছুটা যেন অনুমান করতে পারে। আজ মণি নিস্পৃহ নিরাসক্ত হয়েই বসে আছে, ওর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। হেস্টিংসের মনে সাড়া জাগানোই তার দরকার ছিল, এতদিন সেই চেষ্টাই করেছে। আজ উদ্বেল হয়ে এগিয়ে এসেছে সাহেব, ধূর্ত নারী আজ নিজের গহনে তাই সমাহিত রয়ে গেছে অপরিসীম ঔদাসীন্যে।

আবছা আলোর শেষ আভা মুছে গেল গাছগাছালির মাথায়।

—বেগমসাহেবা! হেস্টিংস আজ তার কাছে ছুটে এসেছে নিজের অপকীর্তির সঙ্গী ওই পিক্রকে খালাস করবার জন্য।

—আপনার আর্জি মঞ্জুর করেছি সাহেব। পিক্র সাহেব, ইয়ার জঙ্গকে আমি খালস করে দোব, বিচারেও তারা সাজা পাবে না।

সাহেব আরও যেন কি চেয়েছিল, সে কথার কোন জবাবই দিল না বেগম। কাঁপছে হেস্টিংসএর বুক, বেগম ওর দিকে চেয়ে থাকে ডাগর চাহনি মেলে। বালকুণ্ডার হরিণীর মনভোলানো সেই চাহনি।

পাখির কাকলিতে আকাশ-বাতাস ভরে উঠেছে। ঝিলের জলের ধারে বসে আছে তারা দুজন। কোন স্বপ্নময় জগতের মাঝে হারিয়ে গেছে দুটি সত্তা।

—রাজমহলের পথে সেই পদ্মদিঘির কথা মনে পড়ে?

মণি কথা কইল না। সবহারানো চাহনিতে বিদেশীর দিকে চাইল। সেদিনের সেই নেশা আজও তাকে চঞ্চল করে তোলে। তরুণ বলিষ্ঠ উদ্দাম বিদেশী, ঝড়ের মাতন লুকিয়ে আছে ওর অন্তরে; সেই ঘূর্ণি ঝড়ের বুকে ঝরা-পাতার মত নিজেকে উধাও করে দিতে চায় মণির দুরন্ত রিক্ত মন।

কালামসজিদে মীরজাফর বহুদিন পর এসেছে। বুব্বুর সিরনী মানত আছে দরগায় তারই কল্যাণে। অসুস্থ শরীর নিয়েও এসেছে নবাব। ঘাটলার ধারে বসে আছে তারা। শুব্ধ ঝিলের কালো জলে আবির রংএর তুলি বুলিয়েছে কোন অদেখা শিল্পী, পশ্চিম আকাশে সেই অনভ্যস্ত তুলির কয়েকটা মোটা লাল পোঁচড়া টানার দাগ।

হঠাৎ অদূরে একটা মল্লিকা গাছের নীচে জলের ধারে দুজনকে বসে থাকতে দেখে চমকে ওঠে নবাব। মণিবেগম এতদূর এগিয়েছে তা ভাবতেই পারেনি সে। হেস্টিংসের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতায় একটু বিস্মিত হয়। কলকাতা থেকে

সাহেব ছুটে এসেছে ওর সঙ্গে নিভৃতালাপ করবার জন্য; মণির হাতখানা সাহেবের হাতে, দুজনেই যেন কোন অসীম স্বপ্নসায়রের অতলে ডুবে গেছে। উষ্ণ রক্ত স্রোত মীরজাফরের সারা দেহ মনে বইতে থাকে। এক নিমিষেই দুজনকেই শেষ করে দিতে ইচ্ছে হয়, ওদের এই হোক শেষ অভিসার। কিন্তু কি ভেবে সরে চলে এল অসহায় নবাব।

বুব্বু অবাক হয় ওর কথা শুনে।

—এখনই ফিরতে হবে।

মীরজাফর আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চায় না।

—সে কি জাঁহাপনা! খোলা হাওয়ায় শরীর সুস্থ হবে।

—এখানের হাওয়ায় বিষ আছে বুব্বু। এখুনি যেতে চাই আমি। চল।

ওদের গাড়ি বের হয়ে গেল অলক্ষ্যে। ঘটনাটা একজনের নজর এড়াল না, সে সেই দরবেশ বীণকার। আবার পথের পরিক্রমা সেরে মুর্শিদাবাদেই ফিরেছে, রাজধানীর সচল জীবনযাত্রায় তার মত অচল মালের খতিয়ান কেউ রাখেনি। মীরজাফরের চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা তার নজর এড়ায় নি, মণিবেগমের সঙ্গে মন্ত্র-মুগ্ধের মত সাহেবকে যেতেও দেখেছে সে।

নীরবে দৃশ্যগুলো দেখে মাত্র সকলের অলক্ষ্যে থেকে সেই উদাসীন বীণকার।

হেস্টিংস চলে গেছে কাশিমবাজার কুঠিতে। মণিবেগম একাই অন্ধকার থেকে এগিয়ে আসছে আলোর দিকে। ঘন গাছের ছায়ার মাঝে কালো পাথরে তৈরি মসজিদটা জমাট আঁধারের মত দাঁড়িয়ে আছে। গোলাববাগের খোসবুমাখা বাতাস যেন ভুল করে আঁধারে পথ খুঁজছে আলোর জগতের। পাখির ডাকও থেমে গেছে।

—সেলাম বেগমসাহেবা!

চেনা কণ্ঠস্বর। অন্যমনে আজ কি এক নিবিড় পাওয়া-না-পাওয়া ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল হয়ে ছিল, হঠাৎ ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ফিরে এল অতর্কিতে অন্য জগতে। সামনে দাঁড়িয়ে ওয়াজিদ।

—বীণকার! কবে এলে?

—সাহেব আসার আগেই।

—সাহেব! একটু চমকে ওঠে মণিবেগম; উষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে—মানে?

হাসছে ওয়াজিদ—গহহর কো আকৃদে গর্দানে খুঁ বাঁ মে দেখ্না।

ক্যা ঔজপর সিতারাঁ এ গহহর ফরোশ হ্যায়॥

—কি বলতে চাও বীণকার? কি এমন অন্যায় করেছি বলতে পারো? আমার মন বলে কি কোন পদার্থ নেই, কি তার আশা পূর্ণ হয়েছে?

ওয়াজিদ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে আসে। জীর্ণ ময়লা একটা বিবর্ণ আলখাল্লা, পথের ধূলোয় তার রং বোঝা যায় না, দাড়িতে এসেছে সাদা আমেজ। বলে ওঠে,

—মতিবেচনেবালার নসিবের কথা বলছি বেগমসাহেবা, খুবসুরৎ লেড়কীর নরম গলায় তার হাতের ছোঁয়া পড়ে সহজেই, যার জন্য হাজারো মাশুক ব্যাকুল হয়ে দিনের পর দিন গুজরান করে!

হাসছে বেগম, আঁধারের মাঝে জেগে ওঠে তওফাওয়ালীর মন। কণ্ঠে ওর অভিযোগ,

—ভালবাসতে চাও তুমি? পারো সে ভালবাসার জন্য কোনও প্রতিদান দিতে? বেফায়দা তোমার কান্না বীণকার, মন বলে কোন পদার্থ তোমার নেই।

হাসছে বীণকার; তওফাওয়ালী কি বুঝবে মোহব্বতের ধারা। হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ বীণকার ওয়াজিদ আজ পথের ধুলোয় নেমেছে দরবেশ দিয়ানা হয়ে; ধনদৌলত তার নেই; কিন্তু সেরা দৌলত অন্তর; তাই বিলিয়ে দিয়েছে নিঃশেষে। তার খবর কি কোনদিন বেগম পেয়েছে? ও কথা বলতে চায়নি ওয়াজিদ। সহজ কণ্ঠে বলে ওঠে,

—রাত হয়েছে, পথঘাট নিরাপদ নয় বেগমসাহেবা!

প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চায় ওয়াজিদ। বেগমও কথা বলল না। আজ মনে হয় যেন অন্য কোন বিচিত্র জগতের সন্ধান সে পেয়েছে। এতদিন সবাই চেয়েছিল তার দিকে বাঁধভাঙ্গার দিন গুনে; আজ সে নিজে এগিয়ে আসতেই ওরা দাবী জানাতে এসেছে। বীণকারও যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওদের মন, অন্তর জলছে; তার জন্য জলছে তাদের মন; এ যেন মণিবেগমের এক অন্তরসত্তার নবজাগরণের শুভক্ষণ বলে মনে হয়। নিজেকে আজ ভাগ্যবান ভাবে সে। কোথায় একটা সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে সে বাঁচবার।

প্রতাপ, সম্মান, ক্ষমতা; রূপের আগুনে পতঙ্গের মত পুরুষকে পোড়াবার মত্ত আনন্দ আজ সারা মনে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে। জলুক ওরা, পুড়ুক হেস্টিংস, জলুক বীণকার; মণিবেগম আজ আনন্দ পায়, নিদারুণ গর্ববোধ করে।

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করছে মীরজাফর, সুবে বাংলার নবাব। জীর্ণ দেহ সতেজ হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঝিলের ধারে সেই দৃশ্যটা। বেগম আজ ইংরেজের হাতে তার ধনদৌলত, এমন কি নবাবের ইজ্জতও তুলে দিয়েছে, এই হীন জঘন্য দৃশ্য নিজেই দেখে অনাগত চরম বিপদের কথা স্মরণ করে শিউরে ওঠে। আজ এ সবের চরম মীমাংসা করতে চায় নবাব।

হালকা মনে ফিরছে বেগম। চটুল ভঙ্গীতে এসে দাঁড়াল অঙ্গুরীবাগের প্রশস্ত চত্বরের সামনে। নাসিক আর্কট চমন থেকে নানা জাতের আঙ্গুরলতা এনে সাজান হয়েছে প্রশস্ত অঙ্গন। দড়ির মত মোটা মোটা কর্কশ লতাগুলো ঢেকে গেছে ঘন সবুজ পত্রাবরণে, থেলো থেলো রক্তের মত রাঙ্গা টুসটুসে আঙ্গুরগুলো দুলছে।

আলোর সামনে দাঁড়ে বসে ঝিমুচ্ছে আফ্রিকান প্যারট। ওর পায়ের শব্দে একবার মুখ তুলে চাইল, যন্ত্রের মত বলে ওঠে সে,

—সেলাম বেগমসাহেবা।

একবার দাঁড়টাকে দোল দিতেই বিরক্তি ভরে চিৎকার করে ওঠে পাখিটা —বেসরম, বেইমান।

পাখিটা বাঁদীদের গালিগালাজগুলোও দুরস্ত করে ফেলেছে। মাঝে মাঝে বলে ফেলে। হাসতে হাসতে গালচেপাতা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল বেগম। লুটুচ্ছে পাঞ্জাবি খেস, গা থেকে খসে পড়ে ওড়নাটা, উপরে উঠে গিয়ে নীচের দিকে ছুঁড়ে দিল জরির কাজ-করা সেলিমশাহী নাগরা, বাঁদী ধরে নিল জুতো দুটো। ইতালীর ভেলভেটের তৈরি হালকা চটি পায়ে দিয়ে ভিতরের দিকে চলেছে, হঠাৎ সামনে নবাবকে দেখে দাঁড়াল। এ সময়ে এখানে তাকে উঠে আসতে দেখবে কল্পনাই করতে পারেনি মণিবেগম। চোখেমুখে ঝড়ের পূর্বাভাষের মত থমথমে একটা ভাব, জীর্ণ দেহ কোনরকমে খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে যেন নখদন্তহীন সিংহ, নেকড়ের দলের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করছে শেষবারের মত।

তীক্ষ্ণ পরিহাসভরা কণ্ঠে বলে ওঠে মীরজাফর—অভিসার শেষ হল বেগমসাহেবা ?

থমকে দাঁড়াল মণিবেগম। আজ সন্ধ্যার কাহিনী এরই মধ্যে রটে গেছে বিকৃতভাবে এবং সে সংবাদ নবাবের কানে এসেও পৌঁছেছে। সেটা

যে নবাব বিশ্বাস করবে এবং এমনি গুরুতরভাবে নেবে তা কল্পনাও করতে পারেনি মণিবেগম। স্বার্থসিদ্ধির জন্য হেস্টিংসকে একটু প্রশ্রয় দিয়েছে সত্যি, কিন্তু এমন অপমানজনক কিছুই ঘটেনি। ওই অপদার্থ অবিশ্বাসী মীরজাফরের মনের নগ্ন পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়, ঘৃণা করে বেগম এ কথার জবাব দিতে।

এগিয়ে এসে মীরজাফর কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে,

—ফৈজীর কাহিনী জানা আছে বোধ হয়? নবাব হারেমে ব্যভিচারের জন্য সিরাজ তাকে হীরাঝিলের কক্ষে ইট দিয়ে রুদ্ধ করে গেঁথে হত্যা করেছে। আকাশে বাতাসে এখনও তার দীর্ঘশ্বাস ভেসে ওঠে। আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চাও?

হেসে ফেলে মণিবেগম। হাসি থামিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে,

—তওফাওয়ালীর জীবনে ব্যভিচার আজ নতুন নয় নবাব সাহেব!

গর্জন করে ওঠে মীরজাফর,

—বাংলার নবাব এখনও মরেনি। অপরিচিত ছোট খানদানী একটা বিদেশী বেনিয়ার কাছে বাংলার বেগমের ইজ্জত যাবে এটা সহ্য করবার মত করুণ অবস্থা এখনও আসেনি।

—কি করতে চান? এগিয়ে যায় বেগম। মনে মনে ফুঁসছে আগ্নেয়-গিরির মত।

কাঁপছে মীরজাফর, তার মুখের উপর জবাব দেবে সামান্য এক তওফাওয়ালী এ সহ্য করতে পারবে না কোন দিনই। বাংলার সিপাহশালার আজ স্তম্ভিত হয়ে গেছে ওর আকাশছোঁয়া স্পর্ধা দেখে। কেঁপে উঠছে ছলনাময়ী নারী মাংসের স্বাদ পেয়ে ক্ষেপে-ওঠা বাঘিনীর মত। ওর সব সাধ মিটিয়ে দেবে মীরজাফর। বিকৃত চিৎকারে প্রাসাদ কেঁপে ওঠে।

—আমার পিস্তল!

বাঁদী পারস্য উপসাগরের শুক্তি ঝিনুকের বাঁটের তৈরি পিস্তলটা এগিয়ে দেয়; মণিবেগম তখনও দাঁড়িয়ে আছে স্থির ভাবে, ঝড় উঠেছে আকাশে। কি এক উন্মাদনায় আত্মহারা হয়ে আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে! একদিকে বাংলার মসনদ, অন্যদিকে ওই শয়তান মীরজাফর। হঠাৎ ধরতে গিয়ে পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে যায় তার। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নবাব। কুষ্ঠরোগে হাতগুলো পঙ্গু হয়ে গেছে, অকেজো হয়ে গেছে সব আঙুল; পিস্তল

ব্যবহার করার সাধ জন্মের মত মিটে গেছে। ও হাতে রাজদণ্ড ধরাও যাবে না, আঙ্গুল তুলে শাসন করাও যাবে না। বিষাক্ত দগদগে ঘায়ে ভরে উঠেছে দেহ মন !

—খোদা মেহেরবান ! অসহ্য নিষ্ফল উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে নবাব। কে যেন ওকে ধরে নিয়ে গেল মহলের দিকে। তখনও স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে বেগম। আজ তাদের ক্ষমতার লড়াই এবং তার ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গেছে। জয়লাভ করেছে মণিবেগম। আজ তার হাতেই আসবে সব কিছু। পরিষ্কার দুটো দিকের ছবি ভেসে ওঠে তার মনে—একদিকে ইংরেজের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা করে টিকে থাকা, অন্য দিকে প্রতিবাদ করে নিশ্চিত ধ্বংস এবং সবনাশ ডেকে আনা। বেঁচে থাকবার পথই নেবে সে।

বাংলার মসনদ থেকে আজ মীরজাফরের সব অধিকার চলে গেছে। সর্বশক্তিমান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মণিবেগম !

—বেগমসাহেবা।

বাঁদীর ডাকে ফিরে চাইল। কাঁপছে তারা। নবাবের পিস্তলের মুখে মৃত্যুকে ব্যঙ্গ করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে বেগম, তাকে আজ তারা আবার নতুন করে সমীহ করতে শেখে। হুকুম দেয় বেগমসাহেবা.

—রেজা খাঁকে এখুনি আসতে বল। আমি পোশাক বদলে আসছি।

গোসলঘরে ঠাণ্ডা পানিতে গোলাব জল ঢালা হচ্ছে, চন্দন তেল নিয়ে তৈরি হয়ে আসে একজন বাঁদী। বেগমসাহেবা গোসল করে তবে কাজে বের হবে।

তটস্থ হয়ে রয়েছে বাঁদীমহল ; এদিক ওদিক হলেই চাবুক পড়বে পিঠে। আজ বেগমের মুখের দিকে চাওয়া যায় না।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে মীরজাফর, জীবন তাকে এমনি নিষ্ঠুর ভাবে ব্যঙ্গ করবে তা স্বপ্নেও ভাবে নি। অসহায় পঙ্গু নবাব আজ প্রাণ ভয়ে শিউরে উঠেছে। বেগমের চোখে মুখে সে দেখেছে নিষ্ঠুর পাশবিকতার ছায়া, ওর হাত হত্যার রক্তে রাঙ্গিয়ে তুলতেও দ্বিধা করবে না

সে। আজ মনে হয় সিরাজের দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ হয়নি। বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে লুৎফার অভিশাপ। বিবর্ণ বীভৎস মৃত্যুকে আজ ভয় করে মীরজাফর। দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পায় বাংলার মসনদের ভবিষ্যৎ। ইংরেজের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে বাংলার নবাবের মুকুট। বাদশাহী ফরমান নিতে পারেনি সে, মীরণ গেছে, মীরকাশিমও নেই; আজ মীরজাফরের সামনে তমসা ভেদ করে জেগে রয়েছে নিষ্ঠুর মৃত্যু! একটা সাদা গোখরো যেন বাতাসে ফণা মেলে নাচছে; যে কোন মুহূর্তে ছিটকে পড়বে শিকারের উপর, মৃত্যুনীল বিষে ঢলে পড়বে হতভাগ্য। মণিবেগম সেই উন্নত-ফণা নৃত্যরতা কালনাগিনী।

হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে ওঠে! ভীত চকিত কণ্ঠে আর্তনাদ করবার চেষ্টা করে, কিন্তু কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে! আবছা আলোয় দেখতে পায় মহম্মদী বেগের মত কে যেন এগিয়ে আসছে। কানে ভেসে আসে অস্ফুট আর্তনাদ—সিরাজের কণ্ঠস্বর। শেষবারের মত বাংলার আকাশ নিষ্ফল কান্নায় ব্যথাতুর করে দিল। ফিনকি দিয়ে ঊষর মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। বাতাসে বাতাসে আর্তনাদ!

তেমনি করেই ওই অদেখা হত্যাকারী নিষ্ঠুর বেগমের ইঙ্গিতে তার বুকে অস্ত্র হানবে। লুটিয়ে পড়বে রোগজীর্ণ দেহ।…অসহ্য সে যন্ত্রণা।

রাতের আবছা অন্ধকারে মনে হয় কে মুক্ত কৃপাণ হাতে এগিয়ে আসছে এই দিকে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে।

বিছানার একদিকে উঠে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে মীরজাফর। আর্তনাদ করছে ব্যাকুল কণ্ঠে,

—দোহাই! আল্লার দোহাই! হত্যা করো না বেগম, তোমার নবাবীর সামনে কোনদিনই বাধা হয়ে দাঁড়াব না; বাঁচতে দাও আমাকে। আল্লার নামে কসম খাচ্ছি কোন বাধা আমি দেব না।

প্রতিবাদের উদ্দেশে ঘরে ঢুকেছেন মহারাজ নন্দকুমার। ঢুকেই চমকে ওঠেন মীরজাফরের বিস্ফারিত ওই চাহনি দেখে। উন্মাদ হয়ে গেছে মনে হয়। কিন্তু এ কি আর্তনাদ অনুনয় করছে সে! হঠাৎ যেন চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে আসে মীরজাফরের। ক্লান্তি, উত্তেজনায় বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ক্লান্ত অসহায় মানুষটি।

—জল! একটু জল মহারাজ। হাঁপাচ্ছে জীবনের শেষ শক্তি সংগ্রহ করতে।

কেউ নেই। একটা বান্দা খোজা প্রহরীও এগিয়ে আসে না। মহারাজ নিজেই ওঁকে সন্তর্পণে তুলে বিছানায় আনেন, বুব্বু বেগম এসে পড়ে পানীয় হাতে নিয়ে। অসহায় মৃতকল্প নবাবের কাছে আর কোন ফরিয়াদ করতে পারেন না মহারাজ। সবই অনুমান করতে পেরেছেন তিনি ওর টুকরো প্রলাপের মধ্যে। মণিবেগমই আজ সব কর্তৃত্ব হাতে নিয়েছে; পিক্র সাহেব ইয়ার জঙ্গকে সেই-ই খালাস করবার হুকুম দিয়েছে। সদর-উল-হকও বুঝতে পেরেছে ঘটনাটা।

আবার সেই অরাজকতাই শুরু হবে। মণিবেগমের কর্তৃত্বের কথা ভাবতেও শিউরে ওঠেন মহারাজ। রেজা খাঁয়ের শাসন একবার দেখেছেন তিনি ইতিপূর্বে।

কিরীটেশ্বরী মন্দির থেকে আজ ফেরবার পথে মাঝগঙ্গায় পিক্র সাহেবকে আবার সেই বজরাগুলোর মাল খালাস করতে দেখেই মহারাজ সদর-উল-হকের কৈফিয়ত তলব করেন। কয়েদখানায় তল্লাস করতেই সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়।

মহারাজের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কয়েক বৎসর আগেকার ঘটনা। কলকাতায় পালাবার আগে মণিবেগমের সেই কাতর অনুরোধ তিনি ভোলেন নি। মীরজাফরের নিরাপত্তার জন্যই তখন সেই অনুরোধ মেনেছিলেন তিনি। সে দিন কোথায় চলে গেছে।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইলেন মহারাজ। মণিবেগম ঢুকছে; মহারাজকে এ সময় আসতে দেখে সেও বিস্মিত হয়েছে। ওঁর সম্বন্ধে রেজা খাঁ আর ইংরেজের কথাগুলো সত্যিই বলে মনে হয় হেস্টিংস কালও সাবধান করে দিয়েছে তাকে বার বার।

—মহারাজকে প্রশ্রয় দেবেন না বেগম, ওর সম্বন্ধে কোম্পানির ঘরে রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ। ওর উপর কোম্পানির কড়া নজর।

নন্দকুমার কূটনৈতিক; কিন্তু কূটনৈতিকতার আসল মর্মসত্যটাকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি সত্যবাদী, সংযমী, ধর্মভীরু। কূটনৈতিক হবার পথে এই তিনটি গুণই চরম অযোগ্যতার পরিচয়। তবু কোথায় ওই লোকটিকে মনে মনে ভয় করে মণিবেগম। ওর চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তির দিকে চাওয়া যায় না।

বলে ওঠেন মহারাজ—অপরাধীদিকে খালাস দিয়ে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন

বেগমসাহেবা। এতে অরাজকতা বাড়বে বই কমবে না। নিজামতের কাজ চালান অসম্ভব হয়ে পড়বে ক্রমশ।

মণিবেগম কি জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল। প্রকাশ্যে ওই ব্রাহ্মণকে চটাতে চায় না। চুপ করে চেয়ে রইল ওর দিকে, কোন স্বার্থপরতার ছায়া ওতে ফুটে ওঠে কিনা দেখছে সন্ধানী দৃষ্টিতে।

মহারাজের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়—আপনিই একদিন অনুরোধ করেছিলেন সমস্ত কাজের ভার নিতে। আজ যদি প্রয়োজন বোধ করেন সেই দায়িত্ব থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দেন।

চমকে ওঠে মীরজাফর, চলে যেতে চাইছেন মহারাজ! ওদিকে দাঁড়িয়ে বেগম. রক্তমুখী নীলা! আলোয় ওর সর্বনাশের ইশারা।

—মহারাজ! যে কটা দিন বাঁচি আমাকে ফেলে যাবেন না, কথা দিন আপনি। মীরজাফরের দুহাতে কুষ্ঠের দগদগে ক্ষত, হাত ধরবার মত সাহস নিজেরই নেই।

ব্যাকুলভাবে উঠে এগিয়ে আসে ওঁর দিকে। অসহায় পঙ্গু বিচিত্র এক জীবে পরিণত হয়েছে মীরজাফর। ঘৃণাভরে সরে গেল মণিবেগম।

মহারাজ নবাবের চোখের অসহায় কান্নাঝরা মিনতি ঠেলতে পারেন না। অদৃশ্য বাঁধনে কোথায় নিবিড়ভাবে বাঁধা পড়ে গেছেন তিনি।

রেজা খাঁ এগিয়ে চলেছে দৃঢ়পদে হুঁশিয়ারি চালে। মীরজাফর আজ বাতিল নবাব। মহারাজ সত্য ধর্ম ন্যায়ের বাঁধনে বাঁধা পড়েছেন; একঠাঁই দুর্বল তিনি। কিন্তু কর্তব্য, ধর্ম—ও-সব দুর্বলতা রেজা খাঁর কুষ্ঠিতেই নেই। নিজামতে ইংরেজ কোম্পানির কুঠিতে তার প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছে। পিক্র সাহেব প্রিয় বন্ধু। মণিবেগমের মহলে প্রায়ই বোখারার কার্পেট চমনের রকমারি মেওয়া খোবানি মনাক্কার ডালি আসছে। মণিবেগম স্বাদ পাচ্ছে প্রতিপত্তির।

ইয়ার জঙ্গ সেদিন বেগমের কাছে এসেছে কয়েকটা কাজের পরামর্শ নিতে। মেদিনীপুরের ফৌজদার মাণিক সিংকে বরখাস্ত করে কোন খাঁ সাহেবকে পাঠাতে হবে। কাফের মাণিক সিংকে সাজা দেওয়া দরকার।

সিতাব রায় এসেছে পূর্ণিয়া থেকে। সে সেখানকার রাজস্ব সংগ্রাহক।

নিজামতে খাজনা জমা দিয়ে, নজরানা দিতে এসেছে বেগমের দরবারে। হীরা জহরতের নজরানা। সিতাব রায় চলে যেতেই এগিয়ে আসে ইয়ার জঙ্গ। যৌবনপুষ্ট চেহারা—মণির চোখে আভা।

ইয়ার জঙ্গ বলে ওঠে—আপনার গলায় মুক্তামালার সঙ্গে মানাবে ভাল বেগমসাহেবা।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন। চাতালে কয়েকটা লক্কা শিরাজী হোমা পায়রা খুঁটে বেড়াচ্ছে। ইয়ার জঙ্গ এগিয়ে গিয়ে বেগমসাহেবার গলাতে ওটা পরিয়ে দেয়, দেহে সংক্রমিত হয় ওর বলিষ্ঠ হাতের উষ্ণ কামনামদির স্পর্শ! কেমন যেন আনমনা হয়ে ওঠে বেগম। হঠাৎ মনে পড়ে যায় বীণকারের সেই রুবাই। মতি বেচনেওয়ালার নসিবই জোর, হাজারো মাশুক যা পায় না, সে অনায়াসেই সেই ছোঁয়া পেতে পারে। একটু যেন সম্বিৎ ফিরে আসে বেগমের।

—ইয়ার জঙ্গ!

শিউরে ওঠে ইয়ার জঙ্গ, বেসরমী জোয়ান। ধীরে ধীরে বের হয়ে গেল সে।

বড় বেশি এগিয়ে গিয়েছিল সে, বেগমের ওই কঠিন কণ্ঠস্বরকে ভয় করে বেশ ইয়ার জঙ্গ। মামুলী তওফাওয়ালী সে আর নয় এটা যেন ভুলে গিয়েছিল ইয়ার জঙ্গ।

বেগম সাহেবা মনের অতলে খুশি না হয়ে পারে না। পরওয়ানা উড়ছে, ব্যাকুল ডানা ঝাপটে উড়ছে হাজারো পতঙ্গ তার রূপের আগুনে পুড়ে ছাই হবার আশায়। নবাবী তার ভোল বদলে দিয়েছে। এর নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে বেগম। কিন্তু মীরজাফরের বিবাহিত স্ত্রী সে নয়, মুতাক্ষরীন আইন তার সন্তানকে বলবে জারজ সন্তান, মসনদে তাদের দাবী আইনত থাকতে পারে না। উপায়! চোখের সামনে ভেসে ওঠে হেস্টিংসের মুখখানা, সেই কামনা বিহ্বল চাহনি! মতিঝিলের ধারে অতর্কিত সন্ধ্যার সেই নিবিড় স্পর্শটুকু।···বেগমকে কোন আইনই বাধা দিতে পারবে না এটা জানে সে।

দরকার পড়লে তার জন্য আইন নতুন করে তৈরি হবে। তার ছেলে নজমউদ্দৌলার মসনদ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

স্তিমিত হয়ে আসছে প্রদীপের শিখা; নবাব মীরজাফরের দিন শেষ হয়ে আসছে। বুব্বু বেগমকে আইনের চোখে স্ত্রীর সম্মান দিয়ে যাবে সে। একমাত্র সে-ই এই দুরারোগ্য কুৎসিত রোগের সময়েও শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে

অক্লান্ত সেবা করছে অন্তর দিয়ে। মীরজাফরের ঔরসে বুব্বুর সন্তান মুবারকই মসনদের দাবীদার।

মণিবেগমের খাস বাঁদী কুলসম কথাটা জানালো। মণি জলযোগ সেরে একটু বেরুবার ব্যবস্থা ক'রছে, সংবাদটা শুনেই চমকে ওঠে। বুব্বু শেষ সময়ে তার সন্তান মুবারকউদ্দৌলার জন্য মসনদ কায়েম করতে চায়।

হাতে কয়েকটা লাল টকটকে আঙ্গুর, চাপে ফেটে রস চুঁইয়ে পড়ছে, তাজা লাল খুনের মত নেশাধরানো রং। হঠাৎ নিজের হাতের দিকে চেয়েই শিউরে ওঠে। যেন রক্তে মাখানো হাত।

কি ভাবতে গিয়ে থামল। মোগলাই পরোটা শোনহালুয়া রইল পড়ে। সরপোশ ঢাকা রূপোর গেলাসের সরবৎ না ছুঁয়েই চিন্তিত মনে উঠে পড়ল বেগম।

—মনিবান।

—চুপ কর! ওকে থামিয়ে দিয়ে কি যেন ভাবছে মণিবেগম। একবার কাশিমবাজার কুঠিতে এখুনি যেতে হবে। মীরজাফর আর নন্দকুমারই তাকে এই চক্রান্তে ফেলেছে। ওর হাতে মসনদের কর্তৃত্ব যাতে না যায় তার জন্যই সে বুব্বুর সন্তানকে আইনত গদিতে বসাতে চায়। এর জন্য বেগম সমস্ত বুদ্ধি শক্তি অর্থ নিয়োগ করবে। হীরাঝিল লুঠ করা সম্পত্তি সবই তার হাতে, মীরজাফর তার কোন চিহ্নই দেখতে পাবে না।

ঝড়ে মেতে উঠেছে সারা আকাশ বাতাস। হু হু মেতে ওঠা ঝড়; চোখ-রাঙ্গানো বিদ্যুতের ঝলকে বজ্রকণ্ঠে আকাশে কারা দল বেঁধে হেঁকে চলেছে এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত সাবধানী হুঙ্কারে। প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াল একটি নারী, গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা কাল-সাপের মত অতল অন্ধকারে চলেছে সে, অন্তরে তার মৃত্যুনীল তীব্র বিষ। দেহে ওর সর্বনাশা যৌবনমাদকতা—দুচোখে যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত ক্রুর কুটিল দৃষ্টি।

স্তব্ধ প্রাসাদের একটি কক্ষে জীবনের শেষ প্রদীপ শিখা যেন এই ঝড়ো হাওয়ায় কেঁপে ওঠে। হাঁপাচ্ছে নবাব। দীর্ঘদেহ বাজপড়া তালগাছের মত ঝলসে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সব শ্যামলিমা মুছে গেছে। কালো মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসছে। আকাশে বাতাসে তারই পদধ্বনি। আর্ত অস্ফুট চিৎকারে ঘর কেঁপে ওঠে, আসছে! ওই আসছে সিরাজের বীভৎস দেহ। চোখ দুটো আজকে স্থির হয়ে আসে।

পলাশির যুদ্ধে আমি বেইমানি করিনি জনাব। ওরা আমাকে বাধ্য করেছিল!…

আর্ত জড়িত চিৎকারে ভরে ওঠে ঝড়ো বাতাস। অন্ধকার আকাশ ফুঁড়ে বিদ্যুতের শিখা নেচে উঠছে, আর্তনাদ করছে নবাব—জল!

বুব্বু এগিয়ে যায়, শিউরে ওঠে নবাব। বাধা দেয় প্রাণপণে,

—না—না। বিষ, বিষ দেবে তোমরা। আওরৎ শয়তানের জাত, সাপের জাত। তফাৎ যাও।

নন্দকুমার ওর কণ্ঠে ঢেলে দেন কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত। পুষ্পগন্ধি সুবাসিত পানীয়। শান্ত হয় ওর বেদনাক্লিষ্ট দেহ।

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে মহারাজের দিকে। কি যেন বলবার চেষ্টা করে, কথাও বের হয় না। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে। বিস্ফারিত চাহনিতে চেয়ে থাকে মহারাজের দিকে, কি যেন কাতর আকুতি মাখানো সেই নীরব দৃষ্টি। শিশু মুবারক দাঁড়িয়ে আছে পাশেই, ওর হাতখানা মহারাজের হাতে তুলে দেয়। চমকে ওঠেন মহারাজ, জীবনের শেষ অনুরোধ; নিজামতের ছায়া মাড়াতেও ইচ্ছা ছিল না তাঁর। কিন্তু এ যেন বিধির নির্দিষ্ট পন্থা। এ পথ ইচ্ছে করলেও ছেড়ে যেতে পারবেন না তিনি।

দরদর করে নির্বাক চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, অসহায় মুমূর্ষু নবাবকে কথা দেন তিনি,

—নিশ্চিন্ত হন নবাবসাহেব। ধর্মের নামে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি মুবারককে সাহায্য করতে কোন দিনই দ্বিধা করব না।

চোখ বুজে আসছে মীরজাফরের, মুখে জ্বালা যন্ত্রণার ছাপ মুছে গেছে। শান্তির সন্ধান পেয়েছে সে। সারা জীবনে সে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে আজ মৃত্যুতে শান্তি খুঁজে পেয়েছে। পরম শান্তি।

কোথায় বাজ পড়ল, ঝলসে ওঠে রাতের অতল অন্ধকার।

নারায়ণ! নারায়ণ! মহারাজ মাথা নীচু করলেন। জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এসেছে।

ইতিহাসের একটি অধ্যায় শেষ হল। নন্দকুমার তার নীরব দর্শক। ইংরেজের লেখা ইতিহাসে মীরজাফর পরিচিত হবে বিশ্বাসঘাতক নরাধম হিসাবেই। ভুল সে করেছিল কিন্তু সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল পূর্ণমাত্রায়। ঈশ্বর তার বিচার করেছেন, শাস্তিও দিয়েছেন। চরম শাস্তি।

কিন্তু যারা মীরজাফরকে পঙ্গু করে তুলেছে, বিশ্বাসঘাতক করে তুলেছে, ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে বীরত্বের স্তুতিময় ভাষায় আজও তাদের নাম ছড়ানো রয়েছে ; মানুষের বিচার তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। তাদের দোষ, নীচতা সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব।

নীচে নেমে গেলেন মহারাজ। রাত্রি শেষ হতে চলেছে। আগামী সকাল কি যেন নতুন সংঘাতময় রূপে দেখা দেবে তা ভাবতেই পারেন না তিনি।

কালের প্রহরীর মত জেগে আছে মেতে-ওঠা প্রকৃতির মাঝে একটি চিরজাগ্রত করুণ সুরসত্তা। শাহী দরবারে শেষ রাত্রির সকরুণ নিবেদনে ফুটে উঠতো তার আকুতি ; মাণ্ডুর ধ্বংসাবশেষ প্রাসাদে আজও গভীর রাত্রে বাজবাহাদুর রূপমতীর মহলে ওঠে এমনি কানাড়ার করুণ সঞ্চারীর মূর্ছনা। অন্তরের প্রণতি ঝরে পড়ে মহাদেবতার উদ্দেশে। ঝড়ের গর্জনে তারই অনুরণন।

কালামসজিদের অন্ধকার দখলমের এক কোণে বসে আছে বীণকার। পদ্মবনে ঝড় উঠছে সোঁ সোঁ গর্জনে। মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে গাছের ডাল। অতল অন্ধকারে নিজামতের জৌলুসের পিছনে সে শুনছে হেস্টিংসের অভিসার যাত্রার অশ্ব খুরধ্বনি ; মণিবেগমকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল গাড়ি রাতের অন্ধকারে, মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারীর ফরমান বের করতে হবে।

ঝড়ো বাতাসে কেঁদে ফেরে সিরাজ, মীরণ, মীরকাশিম—হতভাগ্য মীরজাফরের আত্মা মুর্শিদাবাদের আকাশকোলে।

সব কান্না, সব আশা-নিরাশা একাকার হয়ে বীণকারের দরবারী কানাড়ার রাগে মিশে গেছে। মিশে রয়েছে ওর করুণ সুরে সুরে যুগযুগান্তরের ব্যর্থতা আকুতির কান্না। অতীত থেকে বর্তমান পার হয়ে ভবিষ্যতের অজানায় চলেছে সুরের ধারাবতরণ, অন্ধকার উৎসমূল থেকে আলোর দিকে বয়ে চলেছে, রূপ বদল হয়েছে মাত্র ; সেদিন সুরের নিবেদন ছিল দরবারে, আজ বীণকার সুর সাধছে প্রকৃতির উদার মুক্ততায়।

ইতিহাসের পাতাবদলে ওরা নীরব সাক্ষী। ওদের সুরে অব্যক্ত আশা-নিরাশার পুঞ্জীভূত হাহাকার। মীরজাফরের আত্মা শান্তিলাভ করুক।

কালামসজিদের ইমান দোয়া পড়ছে।

সীতানাথ পণ্ডিত মুর্শিদাবাদের বাইরে ডিহিপাড়ায় চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে সেইখানেই অধ্যাপনা করে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ; বেশি বয়সে একটি কুলীন কন্যাকে বিবাহ করে আনে ব্রাহ্মণের কুলরক্ষা করতে।

মায়ার রূপ যেন ফেটে পড়ছে। ছেলে-পুলে হয় নি, বাঁধন অটুট আছে। চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের নিয়ে সে ছেলের অভাব ভুলেছে। বাড়ির পাশে একটু জায়গা সবুজ হয়ে উঠেছে শাক কুমড়োলতা চালকুমড়া ঝিঙে গাছে। তার থেকেই উৎপন্ন তরিতরকারি, কলাগাছের থোড় মোচা আছে, বনে আমড়া চালতা গাছের অভাব নেই। তাই দিয়েই মায়া কোনরকমে চালিয়ে দেয়।

সীতানাথ পণ্ডিতকে চেনেন মহারাজ নন্দকুমার। তাঁরই অনুরোধে মুর্শিদাবাদের এলাকার বাইরে এসে বসবাস করছে সে, মহারাজ তার টোলের জন্য কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করেছেন। নিজেদের দুজনের তাতে বেশই চলে যেত; কিন্তু পণ্ডিত তাতে রাজি নয়; আরও কয়েকটি গরীব ছাত্রের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করতে সামান্য ওই কটি টাকা কর্পূরের মত উবে যায়।

তবু এ নিয়ে কোনদিনই কোন অনুযোগ করেনি মায়া।

বাবার ঘরে অপরিসীম দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে এখানে একটু নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সন্ধান পেয়েছে। এই তার মহাভাগ্য।

বেশ লাগে এই নিশ্চিন্ত জীবন। কোন চাওয়া-পাওয়ার বিক্ষোভ নেই; প্রকৃতির বুক ছড়ানো আকাশজোড়া প্রশান্তির একাংশ যেন ওদের গোবর নিকোনো তকতকে উঠোনে মাধবীলতার আবেষ্টনীঘেরা কুঁড়েঘরের বুকেও এসে পৌঁচেছে।

সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনিতে সুরময় হয়ে ওঠে ছায়া অন্ধকার ঢাকা কুটীর প্রাঙ্গণ। প্রদীপের আলোয় সীতানাথ পণ্ডিত মায়াকে রামায়ণ শোনাচ্ছে; প্রকম্প আলোর আভা পড়েছে মায়ার সুগৌর মুখে, ডাগর চোখ দুটোতে কি স্বপ্নময় দৃষ্টি! সুরেলা কণ্ঠে সীতানাথ বাল্মীকি রামায়ণ পড়ে চলেছে,

নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা না চক্রো বিদ্যতে রথঃ।
না পতিঃ সুখ মেধত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥

মিতং দদাতি হি পিতা মিতঃ ভ্রাতা মিতং সুতঃ॥

অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ॥

যেমন তন্ত্রীহীন বীণায় সুর বাজে না, অচল হয় চক্রহীন রথ, তেমনি স্বামী-হীনা নারী শতপুত্রের জননী হলেও কখনও প্রকৃত সুখী হয় না। পিতা যা দান করেন তা অত্যন্ত সীমিত, ভাই বা পুত্র যা দান করে তা পরিমিত, কিন্তু স্বামীর দান অপরিমিত—সেই স্বামীকে কে না পূজা করে?

অতীতের একটি মধুর ছবি মায়ার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। পঞ্চবটী বনের ঘন সবুজ সীমায় একটি পর্ণকুটীর।

—স মামনাদায় বনং ত্বং প্রস্থাতুমর্হসি।

তপো বা যদি বরেণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্ত্বয়া সহ॥

রামচন্দ্রের প্রতি সীতার কাতর অনুনয় শুনতে পায় মায়া, তুমি আমাকে সঙ্গে না নিয়ে যেতে পারবে না। তপস্যায় যাও অরণ্যেই যাও, তোমার সঙ্গে আমার তাই হবে স্বর্গ।

রাত্রি ঘনতর হয়ে আসে, জোনাকিজ্বলা অন্ধকার ঝিঁঝিঁর একটানা ডাকে বিরহ বিধুর হয়ে ওঠে। রামায়ণ বন্ধ করে উঠল পণ্ডিত, মায়া গলবস্ত্র হয়ে স্বামীকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় নেয়।

নিজেকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিয়েছে মায়া, অন্য কোন জগতের চেতনা তার নেই।

হঠাৎ সেদিন সব সুর যেন ছিঁড়ে গেল। পঞ্চবটী বনে এসে উদয় হয়েছে কোন রাবণ। চোখে-মুখে তার নিষ্ঠুর পাশবিকতার চিহ্ন।

প্রথম দিনই মায়া ওদের দেখে শিউরে ওঠে, রেজা খাঁয়ের হুকুমে এসেছে ইয়ার জঙ্গ তদন্ত করতে। সীতানাথ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে মাসিক পঞ্চদশ তঙ্কা খয়রাতি করা হয় তারই সম্বন্ধে একটা তদন্ত প্রয়োজন।

—আসুন, আসুন।

সীতানাথ একটু অপ্রতিভ হয়ে ওঠে, একে রাজপুরুষ, তায় বিধর্মী। ওপাশের দাওয়ায় একটা তালপাতার চাটাই পেতে দিল। ইয়ার জঙ্গের চোখ ঘুরছে ভাঁটার মত পনপন করে।

ওদিকে তুলসী তলায় গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করছে মায়া, গঙ্গা থেকে সদ্যস্নান

সেরে ফিরে আসছে। ভিজে কাপড় বসে গেছে সুগৌর দেহের ভাঁজে ভাঁজে। একরাশ এলোচুল পিঠ ছেয়ে পড়েছে, চোখ যেন ঝলসে ওঠে।

চকবাজারে বিবিমহলে বহু রূপ দেখেছে ইয়ার জঙ্গ। কিন্তু তারা যেন কাগজের ফুল, বাহার চিকন চাকনই সার, তাদের তুলনায় মায়া যেন গাছের সদ্য ফোটা তাজা ফুল, যেমন বর্ণ তেমনি ঢলঢলে রং আর বাহারও তেমনি।

ইয়ার জঙ্গ দাড়ি চুমরোতে থাকে। ভদন্ত করা চুলোয় গেছে।

সীতানাথ বলে চলেছে—পাঁচজন ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করে মহানুভব নবাব বাহাদুরের দয়ায়।

লিখতে গেলেই বিপদ। আলেফ্ বে তে ধাতস্থ হয় নি তার। তাই ইয়ার জঙ্গ চোখের দৃষ্টি না সরিয়ে অন্য মনে বলে ওঠে—ঠিক আছে।

ছাত্রদের ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করার সুর, বনের ছায়ার আড়ালে বসে থাকা পাখির কাকলি মুছে যায় তার সামনে থেকে। জেগে রয়েছে মাত্র সেই ভিজে কাপড়-পরা মূর্তি, সুঠাম সুন্দর দুটো হাত একত্রিত ভঙ্গীতে তুলসী গাছে জল দিচ্ছে।

ছায়াঘন পথটা দিয়ে ইয়ার জঙ্গ দুজন সঙ্গীকে নিয়ে ফিরে আসছে। শুকনো পাতায় পাতায় বাতাসের শিহরণ। সহচর রসিকতা করে,

—ক্যা জনাব বিলকুল ঘায়েল হো গিয়া ?

—খামোস !

ইয়ার জঙ্গ তখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি সেই দৃশ্য। কাফেরের এমনি একটা তাজা বসরাই গোলাব পাবার অধিকার থাকতে পারে না।

জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে ঢুকেই বহুদিনের বহু স্মৃতি মনে ভিড় করে আসে মহারাজের। সিরাজের শেষ জীবনের চিন্তাব্যাকুল দিনগুলো, মীরজাফরের উৎকণ্ঠিত জীবন, মীরকাশিমও এই প্রাসাদের মাঝে শান্তি পায় নি। যে কেউ এখানে এসেছে বাংলার মসনদের স্বপ্ন দেখে সেই-ই দুঃসহ মর্মযন্ত্রণায় ছটফট করেছে বাণবিদ্ধ প্রাণীর মত। কেউ নিষ্কৃতি পায় নি, অভিশপ্ত এই জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ। অভিশপ্ত এর বাসিন্দারা। মীরজাফরের মহলের সামনে দাঁড়ালেন, শূন্য মর্মর প্রাসাদ, মীরজাফরের আত্মা আজ যেন হাহাকার করে ফেরে। মাথা নীচু করে এগিয়ে চললেন মহারাজ।

শ্বেত পাথরের সিঁড়ির নীচেই রয়েছে সিরাজের বড় তৈলচিত্র, কোন ইংরেজ চিত্রকর এঁকেছিল। আজও যেন জীবন্ত হয়ে রয়েছে সে, উজ্জ্বল দুই চোখের দৃষ্টি দিয়ে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের জীবনযাত্রার রহস্যময় দিনগুলোর জবানবন্দী নিচ্ছে সাগ্রহে।

উপরে উঠতেই কানে আসে গানের সুর। হালকা ঠুমরীর চাল। নাচের আসরে কিংবা ভোজের আসরে এর চলং। অসময়ে বেগমমহলে এসব শুনে একটু আশ্চর্য হন তিনি।

বড় হলঘরটাকে সাজান হয়েছে। দরজায় ঝুলছে নতুন পর্দা, বারান্দায় বসানো রয়েছে কতকগুলো পাম মল্লিকা পাতাবাহার গাছ। নীচের প্রশস্ত আঙুরলতা-ঢাকা অঙ্গন থেকে উঠে আসছে জলকণাসিক্ত সুগন্ধি বাতাস।

হলের মুখেই খোজা প্রহরী মহারাজকে দেখে সেলাম করে। বহুদিনের সুপরিচিত তিনি। নবাবের কাছে কতখানি সম্মান পেতেন তাও জানে সে। তাঁর পথরোধ করবার ক্ষমতা তার নেই, তবুও কেমন যেন ইতস্তত করে। আগেকার মত বিনা বাধায় এগিয়ে যান তিনি।

মহারাজ হলে পা দিয়েই অবাক হয়ে যান।

বিরাট আয়োজন, পূর্ণিয়ার রাজস্ব সংগ্রাহক সিতাব রায় বসেছে খাবার দস্তরখানে বেগমের ডানপাশেই। ওদিকে বসেছে ধূর্ত দেবী সিং, দিনাজপুর রঙ্গপুর পরগনার কর্মচারী; এদিকে বসেছে রেজা খাঁ, ইয়ার জঙ্গও আছে। বাঁদীর দল ফরাসী শ্যাম্পেন পরিবেশন করছে। বেগমসাহেবা মধ্যমণি হয়ে বসেছে।

কানে আসে রেজা খাঁর কথাগুলো।

—আমি আপনাদের উপর বিশ্বাস করেই কোম্পানিকে জানিয়েছি। গঙ্গাগোবিন্দ সিংও আমাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সিতাব রায় বলে ওঠে—বেগমসাহেবা আমাদের যে নির্দেশ দেবেন তাই মানব।

হাসছে মণিবেগম। বাংলার দিক্‌পাল কর্মচারীরা আজ তাকে সেলাম জানাতে এসেছে। মুক্তার মত দাঁতগুলো ঝিকমিক করছে হাসির আভায়, রেজা খাঁকে আমি বিশ্বাস করি রায় রায়ান।

দেবী সিংহও সায় দেয়—আপনিই আসুন নিজামতের প্রধান হয়ে।

ওরা চক্রান্ত করেছে। রাজস্ব সংগ্রাহকদের কর্তৃত্বের পদে রেজা খাঁকে ওরা স্বীকৃতি দিয়েছে। হীন ষড়যন্ত্র চলেছে আজ এই বেগমমহালে।

হঠাৎ মণিবেগম মহারাজকে দেখে বিস্মিত এবং বিরক্তই হয়। এই সময় এই জায়গায় আসাটা যেন ঠিক পছন্দ করে না সে।

দেবী সিং আর সিতাব রায় শুকনো কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়—আসুন আসুন।

না জেনেই মহারাজও এমনি পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছেন, হঠাৎ ফেরাটাও অশোভন ঠেকে।

পিক্রসাহেব এবং রেজা খাঁ যেন দেখতেই পায় নি তাঁকে এই রকম ভাব নিয়ে থাকে। চোখ বুজে পিক্রসাহেব পাইপ টেনে চলেছে। ইয়ার জঙ্গ এগিয়ে গেল তার দিকে, পা দুটো ঈষৎ টলছে, দু চোখে গোলাবী নেশার আমেজ। বোতল থেকে এক গেলাস পানীয় ঢেলে এগিয়ে যায় মহারাজের দিকে,

—বসবেন না? একটু ড্রিঙ্ক? মুর্শিদাবাদের আমপাকা ভাপ্‌সা গরমে দিল কলিজে হিম হয়ে যাবে, সাহেবের মাল একেবারে আস্‌লি চিজ।

—ইয়ার জঙ্গ! গর্জন করে ওঠেন ব্রাহ্মণ। চমকে ওঠে সকলেই। মণিবেগম কিছু কিছু পরিচয় ইতিপূর্বে পেয়েছে নন্দকুমারের। ওকে সমীহ করে চলে। ওঁর ধমকে দু পা পিছিয়ে এল ইয়ার জঙ্গ।

একটা থমথমে স্তব্ধতা নেমে আসে। ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন মহারাজ, প্রশস্ত বুকে যজ্ঞোপবীত, সাদা রেশমের উত্তরীয় গা থেকে খসে পড়েছে। সকলেই অজানা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

একটি মুহূর্ত। চোখের সামনে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ যেন কাঁপছে।

নীরবে বের হয়ে এলেন মহারাজ। চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায় অপমানে।

—মহারাজ!

পিছনে যেন আর্তনাদ করে ওঠে মণিবেগম। আসর স্তব্ধ হয়ে গেছে, মুছে গেছে সেই হাসি উচ্ছল ভাব। রেজা খাঁ মনে মনে শিউরে ওঠে। ইয়ার জঙ্গকে ধমকে ওঠে—বেকুফ কাঁহাকা!

ইয়ার জঙ্গও ব্যাপারটা এতটা গড়াবে ঠিক বুঝতে পারে নি। বিড় বিড়

করতে থাকে—একদম বেরসিক চাচা, এমন বিদেশী শ্যাম্পেনের বেইজ্জত করে নইলে ?

বর্ধমানের মহারাণী, নাটোরের রাণীভবানী, দিনাজপুরের রাজা—আরও অনেক হিন্দু জমিদার চিন্তায় পড়েছেন। রেজা খাঁ আর মহারাজ নন্দকুমার আজ প্রতিদ্বন্দ্বী। নাজিমীর যোগ্য লোক মহারাজই। জমিদারের দুঃখ বিপদ বোঝেন, বাকি কর কিস্তীবন্দী করে জমিদার এবং প্রজাকে বাঁচান। মহারাজ ধর্মভীরু লোক। দান ধ্যানও করেন প্রচুর।

পল্লী অঞ্চলের রাখাল বাগালও তাঁর নাম জানে তাঁর বাড়িতে ও অঞ্চলের হাজারো লোক পাতা পেড়েছে, প্রার্থীকে কোন দিনই তিনি বিমুখ করেন নি। সাধ্যমত সাহায্য করেছেন নিজেকে বিব্রত, বিপন্ন করেও। জনসাধারণের কাছে তিনি পূজ্য—বরেণ্য। পল্লীকবি তাঁকে নিয়ে গান বাঁধে। তাঁর বাড়িতে ব্রাহ্মণ-ভোজন দরিদ্রনারায়ণ-ভোজন এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। ভদ্রপুর, চলতি ডাকে ভাদুরে গ্রামে যেন মেলা বসে যায়। বন্দুকধারী সেপাই সেই লক্ষ নিমন্ত্রিতের ভিড় সামলাতে পারে না। তাই বাঁধনধারয়া গান বেঁধেছে,

ভাদুরের নন্দকুমার
লক্ষ বামুন করলে সুমার।
কেউ খেলে মাছের মুড়ো,
কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো।

জনপ্রিয় নেতা নন্দকুমার।

ক্ষুব্ধ অপমানিত ব্রাহ্মণ চলেছেন।

দ্বিপ্রহর হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদ চকের দুপাশের দোকান পসার জেঁকে উঠেছে। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে হাটুরের দল বেসাতি সেরে ফিরছে দেহাতের দিকে। বিমলী বাঁদী নিজেই ছোট দোকানটা চালাচ্ছে। বাগানের কাজ কাম দেখাশোনা করে, দোকানেও বসে। তার আমের নামও দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। বড় সাবধানী বাঁদী। পাছে তার আমের আঁঠি থেকে নকল গাছও কেউ তৈরি করে তাই প্রতিটি জাতের আম সে সরু ধারালো স্ুঁচ দিয়ে

বোঁটার ভিতর অবধি আঁঠিকে ফুঁড়ে দাগী করে দেয়। আম ঠিকই থাকবে, তবে আঁঠিটা কোন কাজে লাগবে না।

কেউ আপত্তি করলে বলে ওঠে—দিল চায় নাও, নয়তো অন্য কোথাও দেখ।

বেশই জানে, এ জাতের আম সারা মুর্শিদাবাদে আর কারও নেই। খদ্দেরকে আসতেই হবে ফিরে। বিমলী বাঁদী মহারাজকে দেখে উঠে এল।

—সেলাম মহারাজ!

পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিলেন মহারাজ, হঠাৎ বাজারের মধ্যে ওর ডাকে দাঁড়ালেন, ওর কাছে কি এক লজ্জায় যেন পড়ে আছেন তিনি। নিতাব শেখের আততায়ীর বিচার করতে তিনি পারেন নি। শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, সেই দুর্দান্ত ইয়ার জঙ্গ আজ তাঁকেও প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করতে সাহস করে! নীরবে সহ্য করে এসেছেন তিনি সেই অপমান।

ওর ডাকে মুখ তুলে চাইলেন।

—কি মা?

তাজা কয়েকটা আম ওঁর চাকরের হাতে তুলে দেয়—প্রথম গাছ থেকে নামালাম, মানী লোককে দেওয়ার রেওয়াজ; নবাব তো নেই।

—চকে আর লোক খুঁজে পেলে না?

মাথা নামাল বাঁদী, বলে ওঠে—না।

হাত পেতে ওর এই সম্মান নিলেন মহারাজ। জেব্বার পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে দেন, বাঁদী মাথা নীচু করে সেলাম জানায়।

বাড়িতে অপেক্ষা করছেন নাটোরের দেওয়ান বাহাদুর, বর্ধমানের মহারাণীর নায়েব, দিনাজপুর থেকে এসেছেন মত্তমশায়, আরও কয়েকজন ভূস্বামী, ফতে-সিংহ পরগনার সদর দেওয়ান পায়চারি করছেন। সকলেই যেন চিন্তিত। মহারাজ কি সংবাদ নিয়ে আসেন তারই জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছেন তাঁরা।

ঘর্মাক্ত কলেবরে এসে পৌঁছলেন মহারাজ। আসল কোন কথাই মণি-বেগমের সঙ্গে আলাপ হয় নি, করার কোন সুযোগও হয় নি এবং বেশ বুঝেছেন আলাপ করাও নিষ্প্রয়োজন। শুধু মুর্শিদাবাদ কেন, কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠিয়ালরাও মণিবেগম, রেজা খাঁয়ের আশরফি গিলে বসে আছে।

তারা মহারাজকে আবেদন জানায়,

—এখানে না হয় আমরাও প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি, আপনি নিজে কলকাতা-

তেই যান। ক্লাইভ এসেছেন। তিনি হয়তো এর একটা নিরপেক্ষ বিচার করবেন। আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। একটা বিহিত এর করুন মহারাজ।

ভাবছেন মহারাজ, হয়তো এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ খোলা নেই। ক্লাইভ তাঁকে চেনেন, জানেন তাঁর কর্মদক্ষতা। ক্লাইভ এখনও মণিবেগমের হাতের মুঠোয় আসেন নি ; তাঁর কাছেই বিচার চাইবেন তিনি। কিন্তু যদি নিরাশ হন!

অপমানিত হতে আর ইচ্ছে নেই। ইংরেজ পূর্ণবিক্রমে রাজত্ব করুক। তিনিও ফিরে যাবেন তাঁর শান্তিময় পল্লী ভদ্রপুরে। কি যেন ভাবছেন তিনি!

- মহারাজ! ওরা আশাভরে চেয়ে রয়েছে ব্যাকুল ভাবে।

—একটা দিন ভেবে দেখি দেওয়ান বাহাদুর। আগামীকাল আমার মতামত জানাব।

মহারাজ একটু ভাবতে চান। সমস্ত চিন্তা শক্তি যেন জট পাকিয়ে আসছে।

ব্যাকুল কণ্ঠে দিনাজপুরের দত্তমশায় অনুরোধ করেন—আমাদের অকূলে ভাসাবেন না মহারাজ।

ম্লানভাবে হাসেন নন্দকুমার—সবই নারায়ণের হাত।

মাথার উপর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তির উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম জানান তিনি।

নিঝুম দুপুরে হাজার দরওয়াজার বুরুজ থেকে সময় সংকেত ধ্বনি শোনা যায়। রাজধানী দুপুরের রোদে ঝিমিয়ে পড়েছে স্তব্ধ হয়ে, চিন্তায় ডুবে গেছেন নন্দকুমার। সমস্ত দুর্বলতা ছাপিয়ে মনে একটি অনির্বাণ শিখা তবু জ্বলছে ; ওদের হীন ব্যবহারের জবাব দিতে হবে। রেজা খাঁ, মণিবেগমের ব্যবহারের উত্তর দেওয়া হয় নি।

সীতানাথ পণ্ডিত শিউরে ওঠে, রাতের অন্ধকারে চিৎকারটা শোনা যাচ্ছে। আর্তনাদে মুখর হয়ে উঠেছে তমসাচ্ছন্ন বন ; কারা জোর করে ধরে নিয়ে চলেছে মায়াকে। ওর ছোট্ট কুঁড়েটা আগুনের আভায় ভরে উঠেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন।

সীতানাথ যেন স্বপ্ন দেখছে। ওইখানেই দাওয়ায় বসে গত সন্ধ্যায় সে মায়াকে শোনাচ্ছিল রামায়ণের খানিকটা অংশ।

তাং লতামিব বেষ্টন্তী মালিঙ্গন্তী মহাদ্রুমান।

মুঞ্চ মুঞ্চেতি বহুশঃ প্রাপ তাং রাক্ষসাধিপঃ॥

সীতাহরণের একটি নিষ্ঠুর চিত্র এঁকেছেন মহাকবি বাল্মীকি, বিহ্বলার মত সীতা একতরু হতে আর এক মহাতরুকে আলিঙ্গন করে সেই বৃক্ষদেরই বলতে লাগলো, আমাকে দুষ্ট রাবণের হাত থেকে মোচন কর। রক্ষা কর। সেই অবস্থাতেই রাক্ষস আবার তার হাত ধরে নিয়ে চলেছে।

সেই রামায়ণের দুষ্ট চরিত্রগুলো যেন আবার পুরাকাহিনীর পাতা থেকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কে জানে স্বপ্ন দেখছে কি না পণ্ডিত।

—মায়া! মায়া! ওকে জোর করে তুলে নিয়ে চলে গেল। কানে আসে মায়ার আর্তনাদ! ওকে কারা টেনে নিয়ে চলেছে।

ঠিক বুঝতে পারে না, দাউ দাউ করে ঘরটা জ্বলছে। ছিটেবেড়ার ঘর, চালে লতাগুলো কুঁকড়ে শুকিয়ে ফলসমেত পুড়ছে—পুড়ে ছাই হয়ে গেল উঠোনের তুলসী গাছটা। দাঁড়িয়ে দেখছে সীতানাথ—হু হু আগুন সব গ্রাস করে নিল তার।

প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে ফিরে আসছেন মহারাজ বাড়ির দিকে। মুর্শিদাবাদের পুব আকাশে প্রথম আলোর চরণধ্বনি জেগে উঠেছে রক্তলাল আভায়, গাছের মাথা নদীর বুক রাঙ্গিয়ে দিয়ে। পথচারীরা বড় একটা কেউ নেই, শেঠেদের বাড়ির দুচারজন পুরুষ চলেছে গঙ্গাস্নানে, হাজার-দুয়ারীর কার্নিশে হাজারো টিয়াপাখির ঘুম ভেঙ্গেছে—তাদের কাকলিতে আকাশ মুখর।

—রাম রাম মহারাজ!

—রাম রাম।···স্তোত্র পাঠ করে চলেছেন মহারাজ। বিজাতীয় শাসন-কর্তাদের রাজত্বে এই বিজাতীয় পরিবেশে ভারতের সনাতন সংস্কৃতির মহামন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন ব্রাহ্মণ,

সমানি ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।

সমানমস্তু বো মনো যথাবঃ সুসহাসতি॥

বাড়ির সামনের রকে কাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যান মহারাজ। সীতানাথ পণ্ডিত বিস্ফারিত শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, মাথায়, গায়ে,

কাপড়-চাদরে ছাই আঙ্গরার কালো দাগ, মুখে লেগেছে কালো চিহ্ন. চুলগুলো উস্কোখুস্কো ; কে জানে কোন অঘটন ঘটে গেছে। তবে কি স্ত্রীকেই দাহ করে আসছে !

ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন মহারাজ,

—পণ্ডিত, শ্মশান থেকে ফিরছো না কি ? কি সংবাদ ?

কথার জবাব দিল না পণ্ডিত। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে, কথার জবাব দেবার সাহস শক্তি দুটোর কোনটাই তার নেই। কাঁপছে থরথর করে।

হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে পণ্ডিত—আমার স্ত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল ওই দস্যুর দল। আমার ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল মহারাজ ! হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

মহারাজ চমকে ওঠেন। একটি মুহূর্ত। নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলেন তিনি,

—স্থির হও পণ্ডিত। এত উতলা হয়ো না।

পণ্ডিতের চোখের উপর ভেসে ওঠে রাতের দৃশ্যটা। আলো হয়ে উঠেছে রাতের অন্ধকার বীভৎস ভাবে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তার পুঁথি, সম্মান, দাম্পত্য জীবনের শান্তি ; মায়া কোথায় হারিয়ে গেছে অতল অন্ধকারে। নিগৃহীতা হয়ে আজও কোথাও হয়তো টিকে আছে। আঙ্গরার গনগনে আভা ক্রমশ নিভে আসে। ভস্মস্তূপের পাশে চিতা পাহারা দেওয়া শ্মশান প্রহরীর মত বসেছিল সীতানাথ।

ভোর হবার আগেই বের হয়ে পড়েছে পথে। ডিহিপাড়ায় আর এ কলঙ্কিত মুখ কাউকে সে দেখাবে না। নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করবার অধিকার যার নেই, এ কালামুখ তার কাউকে না দেখানই ভালো।

স্তব্ধ হয়ে কাহিনীটা শোনেন মহারাজ !

এ সেই হেস্টিংসের ঘরে নোংরা ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এর কোন বিচারই হবে না ? চিরকাল কাঁদবে ওই গোকুল বেনে রামসোনার তাদের বোনের শোকে, বিমলী বাঁদী কাঁদবে তার প্রিয়তম নিতাবের জন্য, সীতানাথ হাহাকার করে ঘুরে বেড়াবে নিস্ফল আক্রোশে হৃতা মায়ার সন্ধানে। কাদম্বিনীরা নিজের সম্মান সতীত্ব বাঁচাবার জন্য গলায় দড়ি দিয়ে হেস্টিংসের হাত থেকে নিস্তার পাবার পথ খুঁজবে। মায়া সয়ে যাবে নিদারুণ অপমান !

এর কোন দিনই বিচার হবে না—ঈশ্বর! ক্রমশ এমনিই বেড়ে চলবে ওই পশুদের অত্যাচার?

—কি করবে স্থির করেছো পণ্ডিত?

একটু চিন্তা করে জবাব দেয় সীতানাথ—সংসার ধর্ম পুড়ে ছাই হয়ে গেল মহারাজ! এর পর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব যদি শান্তি পাই। এ পাপ পুরীতে আর থাকব না।

সীতানাথ বের হয়ে গেছে। একাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন মহারাজ, সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মাথায় উঠেছে।

—মহারাজ।

নাটোরের দেওয়ানজী, বর্ধমানের নায়েব, আরও কারা সব এসেছেন। কিন্তু ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে যান সকলেই। মহারাজ দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই বিষ্ণু-মূর্তির সামনে। সারা শরীর মুখ উত্তেজনায় রাঙ্গা টকটকে হয়ে উঠেছে। নিবিড় ধ্যানমগ্ন ব্রাহ্মণের সারা শরীরে ফুটে উঠেছে দিব্যজ্যোতি।

ওঁদের পায়ের শব্দে যেন চমক ভাঙলো মহারাজের। ধীরে ধীরে ওঁদের দিকে ফিরে চাইলেন। স্থির কণ্ঠে বলে ওঠেন তিনি,

—আপনাদের কথাই ঠিক নায়েব মশায়। প্রতিবাদ করতেই হবে ওদের অন্যায়ের, তার জন্য যা করা দরকার আমি করব। অত্যাচারী ইংরেজ, উচ্ছৃঙ্খল মুসলমান শাসক জানুক, সুবে বাংলায় একজন অন্তত জীবন পণ করেও ওদের প্রতিটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করে গেছে। ইতিহাস আগামী-দিনের মানুষকে সেই সংবাদ পৌঁছে দেবে।

—মহারাজ! আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন দেওয়ানজী।

নিবাত নিষ্কম্প শিখার মত প্রকম্প কণ্ঠে যেন শপথ গ্রহণ করছেন তিনি,

—আমি কলকাতা যাবো, ক্লাইভের সঙ্গেই দেখা করে আমার দাবী পেশ করবার মনস্থ করেছি।

—কাপড়-চোপড় বদলান আপনি। শীতের দিন স্নান সেরে ভিজে কাপড়েই রয়েছেন।

এতক্ষণে খেয়াল হয় মহারাজের। গঙ্গাজল সিক্ত বস্ত্রেই তিনি শপথ নিয়েছেন, জীবন পণ করেও ওদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যাবেন।

কি এক অশুভ শপথ গ্রহণ করে ফেলেছেন তিনি। অজানা ভয়ে শিউরে ওঠে অন্তর। কি যেন পরম নির্ভর খোঁজেন ওই বরাভয়দাতা বিষ্ণুমূর্তির দিকে,

—বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

নিস্পৃহ নিরাসক্তভাবে তোমারই কাজ করবার দুর্জয় সামর্থ্য দিয়ে তুমি আমাকে পথ দেখাও, শান্তির সন্ধান দাও ঈশ্বর !

কোন এক নিয়তি তাঁর ভাগ্যকে পরিচালিত করে নিয়ে চলেছে ভবিতব্যের দিকে ; তিনি এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, অদৃশ্য কোন মহাশক্তির হাতের ক্ষুদ্র ক্রীড়নক। নিজের কোন স্বাধীন সত্তাই নেই। নইলে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে, তারই ঘাতপ্রতিঘাতে তিনি ভেসে চলেছেন সামনের দিকে—অজানা বন্ধুর পথে।

তাই হয়ত আবার বজরা ভাসল কলকাতার উদ্দেশে।

বীণকার ওয়াজিদ আলী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে দিওয়ানা দরবেশের দল। যখন তখন তাদের ধরে আনছে ইয়ার জঙ্গের সেপাই, রাজ্যে ডাকাতি, রাহাজানির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। পথে-ঘাটে নদীতে কোথাও নিরাপদে যাতায়াত করবার উপায় নেই। মাটি ফুঁড়ে শয়তানের দল চড়াও হয় তাদের উপর, টাকা-কড়ি ধনদৌলত যা পায় লুটে নিয়ে নির্দয়ভাবে পথচারীকে হত্যা করে তদন্তের শেষ সূত্রটুকুও মুছে দিয়ে যায়। নদীপথে নৌকা লুঠ করে কেটে ফেলে তাদের, নদীর জল রাঙ্গা হয়ে যায়, স্রোতের টানে আবার মুছে যায় সব। নৌকার তলা ফাঁসিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে কচি বৌ মেয়ে পেলে লুঠের মাল হিসেবে নিয়ে যায় তারা।

গৃহস্থ আতঙ্কে রাতের ঘুম ছেড়েছে।

সদর-উল-হক অস্থির হয়ে উঠেছে। অরাজক রাজত্ব। সৈন্যাধ্যক্ষ ইয়ার জঙ্গকে নির্দেশ দেয়—যেখান থেকে পার ধরে আনো আসামী।

আসামী কারা তা ইয়ার জঙ্গের চেয়ে আর কেউ ভাল করে জানে না। অনেক লুঠের নায়ক সে নিজেই। দোস্তী ইয়ারবর্গেরও বেশ মৌকা মিলে গেছে। ধনদৌলত ত আসছেই, তাছাড়া ইয়ার জঙ্গ নিজেই খুলেছে নতুন বিবি মহল সেই কুড়িয়ে আনা বিবিদের নিয়ে। সেখানে হররা চলেছে দিনরাত, ওদের গুমরে ওঠা কান্নার সুর এরা মদ্যপকণ্ঠের জড়িত চিৎকার আর ঘুঙুরের শব্দে ডুবিয়ে দিতে চায়।

ইয়ার জঙ্গ আসামীর খোঁজ করে দিওয়ানা দরবেশ দলের মধ্যে। কালা-মসজিদের চত্বর থেকে একদল দরবেশকে দড়ি দিয়ে বেঁধে এনে হাজির করে কোতোয়ালিতে, আলখাল্লা ফেটে যায় শঙ্করমাছের চাবুকের ঘায়ে, পিঠে সাট সাট দাগ পড়ে। ওদের আর্তনাদে ভরে ওঠে কোতোয়ালি।

ওদিকে সংবাদ আসে ঔরঙ্গাবাদে আবার নৌকা লুঠ হয়েছে, কোন হিন্দু মহাজনের রেশমের চালান আসছিল, বিলকুল সাফ্ হয়ে গেছে।

দরবেশের উপর জুলুমের মাত্রা বাড়ল মাত্র।

ইয়ার জঙ্গ বলে—ঠিক ওই দলেরই কাজ। ওদের ধরে আনার খবর পেয়েই আবার অত্যাচার শুরু করেছে অন্য জায়গায়।

জল বিছুটি লাগানো শুরু হল তাদের।

আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে দরবেশরা। কালামসজিদ চকের অন্যান্য ঠাঁই কাঠরার মসজিদ থেকে দলে দলে দরবেশদিকে ধরে এনেছে নবাবী ফৌজ। যে দু'চারজন ফাঁকায় ছিল কোনরকমে রেয়াৎ পেয়েছে তারাই। আতঙ্কিত হয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পথ খুঁজছে কোন মালগুজারী নৌকায় বা অন্য কোন পথে পালাতে পারে কিনা তারই সন্ধানে।

শহরের লোকরা মজা দেখছে। কেউ কেউ মন্তব্য করে,

—ঠিকই করছে ইয়ার জঙ্গ। বড় বেড়ে উঠেছে দিয়ানার দল।

অন্য দল যারা প্রতিবাদ করছে তারা সংখ্যা লঘু, প্রকাশ্যে কিছু বলে ইয়ার জঙ্গের মত দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী তারা হয়নি।

বীণকার বেগমকে কয়েক বৎসরই দেখে নি। মতিঝিলের ধারে হেষ্টিংসের সঙ্গে দেখেছিল সেই রাত্রে; সেদিন ওর দুচোখে ক্ষমতা পাবার যে লালসা দেখেছিল আজ তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটছে। মণিবেগম এমনি কোন পথেই হাঁটবে জানত সে, এই অত্যাচারের পথই তার মত নারীর পক্ষে স্বাভাবিক।

মণিবেগম আজ বদলে গেছে। আঙ্গুরীবাগের সামনে বসে রয়েছে, দুপাশে দুজন বাঁদী বাতাস করছে। একজন ভিনিসের কাটগ্লাসের তৈরি ফিকে নীল পানপাত্রে বিদেশী শরাবের সঙ্গে গোলাবজল মিশিয়ে এনেছে।

ইয়ার জঙ্গ অলস মধ্যাহ্নে আসে নির্জন অবকাশ মুহূর্তে বেগমকে একটু একলা পেতে। হিমরুর কল্কাদার বুটিতোলা পাঞ্জাবি, কাঁধের কাছে বিলেতী লেসের কাজ করা; পায়জামার ছাঁট আলিগড় থেকে আনা দর্জির এলেমৌ চিহ্ন বয়ে বেড়ায়; বাবরি চুলে বিলেতী খোসবু তেলের গন্ধ, গাজীপুর

আতরের তীব্র সুবাস তার আর ভাল লাগে না, তার তুলনায় পিক্রসাহেবের চোরা চালানের বিদেশী খোসবু দিল তর্ করে দেয়।

দখলমে কয়েকটা কেয়া ফুল ঝোলান, বর্ষার মেঘ-কালো আকাশ থেকে মাঝে মাঝে ধারা নামছে ঘন সবুজ আঙ্গুর লতার বুকে। ডিভানের উপর আড় হয়ে চেয়ে আছে বেগম। ওপাশে বসে ইয়ার জঙ্গ খুব হাত পা নেড়ে চলেছে।

মণিবেগম ওকে কেন জানে না পেয়ার করে। ওর স্বভাবের মধ্যে কোথায় একটা ক্রূর হিংস্রতা আছে, কঠিন নিষ্ঠুর ওর অন্তর। মণিবেগমের বিকৃত মনে কোথায় তাই বোধ হয় একটা অদৃশ্য যোগাযোগ গড়ে উঠেছে ওই ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে।

ঝিম ঝিম বাদল ধারা নামছে, উদাস দৃষ্টিতে বেগমসাহেবা চেয়ে আছে বাইরের দিকে—গঙ্গার কালো জল গেরুয়া রাঙ্গা হয়ে উঠেছে, দুকূল ছাপিয়ে বয়ে চলেছে।

— বেগমসাহেবা!

চমকে ওঠে মণি! এ যেন মনে মনে চায় সে। ওকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। একটা হাত তুলে নিয়েছে ইয়ার জঙ্গ। কামনামদির দৃষ্টিতে ওর দুচোখের দিকে চেয়ে রয়েছে। কঠিন কঠোর মানুষটা; ওর নিষ্ঠুর পাশবিকতা-ভরা অন্তরটাকে হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে পরখ করে দেখতে চায় মণি। ওই দুর্দান্ত পশুকেও হারমানানোর নেশায় পেয়ে বসেছে তাকে।

হাবশী খোজা এগিয়ে আসতেই হাত ছাড়িয়ে নিল বেগম। খবর দেয়,

—হেষ্টিংস সাহেব এসেছেন।

সসম্মানে তাকে নিয়ে এসেছে বাঁদী। স্তম্ভিত হয়ে যায় ইয়ার জঙ্গ। এ নারী যেন অন্য কোন নারী। এক মুহূর্ত আগে স্বপ্ন দেখছিল যে নারী সে যেন নয়।

হেষ্টিংস এগিয়ে এসে বেগমের হাতখানা তুলে নিয়ে ঠোঁটে স্পর্শ করে; বেগম তওকাওয়ালীর অভ্যস্ত সাবলীল ভঙ্গিতে ডান হাত দিয়ে বসবার অনুরোধ জানিয়ে ফরমাইস করে, বেগম হুকুম দেয়,

—ইয়ার জঙ্গ, সাহেবের সরবতের বন্দোবস্ত কর। জলদি।

কখন যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে তা ইয়ার জঙ্গ নিজেই টের পায় নি। বেগমের রুক্ষ কঠিন হুকুমদারী কণ্ঠস্বর শুনে মনের কোণে বিদ্রোহ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। রুদ্ধ মুখ আগ্নেয়গিরির মত ফুঁসছে সে নীরবে। সাহেবের সামনে

বেগম হুসয়া কোন আওয়তে পরিণত হয়। একবার চোখোচোখি হয়ে যায় ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে বেগমের—তখনও দাঁড়িয়ে আছে সে; বেগম তাকে সরবতের বন্দোবস্ত করার অছিলায় সরাতে চায় আর কি! ওর রুক্ষ কঠিন চোখের সতেজ দীপ্তি দেখে একটু ঘাবড়ে গেছে ইয়ার জঙ্গ। ধীরে ধীরে বের হয়ে গেল চত্বর থেকে ওর হুকুম তামিল করতে।

হাসছে মণিবেগম! লাস্যময়ী সেই নারী।

—বলুন সাহেব!

হেষ্টিংস মহারাজের কলকাতা যাত্রার সংবাদ পেয়েই ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। রেজা খাঁ সকালেই কাশিমবাজার কুঠিতে গিয়ে হেষ্টিংসের নিজস্ব তহবিলে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে এসেছে নায়েবসুবার পদের জন্য। টাকার অঙ্কটা বেমালুম চেপে গিয়েই বলে ওঠে সাহেব.

—কালই কলকাতা যাচ্ছি। লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে জরুরি পরামর্শ আছে। চোখের তারা দুটো কোণের দিকে সরে এসেছে, ভুরু কাঁপছে। যেন ধনুকে কে তীর জুড়েছে। হেষ্টিংস এ চাহনির অর্থ বোঝে।

হাসির নেশা লাগিয়ে প্রশ্ন করে বেগম—কত আমদানি হল? মেজাজ শরীফ আজ?

কথার জবাব দিল না সাহেব, এ সব ক্ষেত্রে লেনদেনের ব্যাপার থাকে তা জানে সবাই। সুতরাং লজ্জার কি আছে বরং ভাগ্যের কথা।

—তোমার একটা ছবি নিয়ে যেতে পারলে কাজ হত।

মণিবেগম ওর দিকে চেয়ে আছে। কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার সুর,

—ছবি ত নেই।

—একজন বিদেশী আর্টিস্টকে আনবো?

চলে যাচ্ছে সাহেব। এই না দেখা দিনগুলো তার কাছে যেন বোঝার মত মনে হয়। পার হতেই চায় না। জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে তার প্রত্যাহের জীবনযাত্রায়। বিদেশ—তবু এখানের মৃত্তিকাতেও তার জন্য একটু শান্তি নীড় আছে। একজনও তাকে অন্তর দিয়ে কামনা করে। শত কাজের ফাঁকে হেষ্টিংস যেন নিজেকে নতুন করে ফিরে পায়।

একটি মুহূর্ত। নিস্তব্ধ আঙ্গুরীবাগের ঘন সবুজ পত্রাবরণের অন্তরালে উষ্ণ হয়ে ওঠে ওর নিশ্বাস। বেগম সরে দাঁড়াল, সাহেব বের হয়ে গেল নীরবে।

—ইয়ার জঙ্গ !

ইয়ার জঙ্গ এসে দাঁড়াল। মনে মনে তখনও অভিমানের রেশ। বেগমের ইচ্ছাকৃত অবহেলার কথা সে ভুলতে পারে না।

—ইয়ার জঙ্গ !

চমকে ওঠে ইয়ার জঙ্গ। দুর্দান্ত হিংস্র পশু যেন কোন যাদুকরের চোখের তির্যক দৃষ্টির সামনে পড়ে তার শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে।

—রাগ করেছ ? বেগমের গোস্তাকী মাপ্ কর।

ইয়ার জঙ্গ অবাক হয়ে যায়, সারা শরীর তার কাঁপছে। একটি মুহূর্ত! যার জন্য এতকাল উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিল সে, নীরবে প্রস্তুতি করে চলেছিল, হঠাৎ সেই সব পাওয়ার চরম মুহূর্ত এল অযাচিত ভাবে, অকস্মাৎ।

বেগমের উষ্ণ নরম স্পর্শ তার শিরা-উপশিরায় মাতন তুলেছে ঝড়ের ; কিন্তু কে যেন দুর্মদ কোন সম্মোহনী শক্তি দিয়ে তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

চোখের তারা দু'টো কাঁপছে বেগমের ; ওর হাত থেকে নিজের হাতখানা নামিয়ে নিয়ে বলে ওঠে,

—যাও, কাজ-কাম নেই নিজামতে? বেগমসাহেবার পাশে ঘুরঘুর করলে চলবে ?

মাথা নীচু করে বের হয়ে গেল ইয়ার জঙ্গ। রক্তলোভী হিংস্র ডালকুত্তা যেন পোষ মেনেছে ; মাথা নীচু করেছে আকামা গোখরো সাপ—নাগিনী-কন্যার চোখের সামনে। ধুলোপড়া দিয়েছে তার উদ্যত ফণায় ছিটিয়ে।

হাসিতে ফেটে পড়ে বেগম। একাই হাসছে—হা হা শব্দে।

হেস্টিংস থেকে শুরু করে ইয়ার জঙ্গ অবধি সবই এক ছাঁচের মানুষ। কিছুটা ইতর বিশেষ মাত্র। ওদের চরম দুর্বল ঠাঁইটুকু চিনে ফেলেছে বেগম।

একজন অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ থেকে। জাফরীর বাইরে টিপিটিপি বৃষ্টিতে বসে আছে সে। দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ঢেকে গেছে মুখ চোখ, স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। হেস্টিংস আর ইয়ার জঙ্গ বের হয়ে গেল, জাফরীর ফাঁক দিয়ে কিছুটা দৃশ্য তার চোখে পড়েছে। নিরাসক্ত নিস্পৃহের মত দেখেছে সে।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, নিমগাছের ডালে বসে ভিজছে একটা কাক ; তখনও বাঁদী খবর নিয়ে ফেরেনি। এত্তেলা পাঠিয়ে বসে আছে, কে জানে ফকিরের সঙ্গে দেখা করবার সময় বেগমসাহেবার হবে কি না? হয়ত

ভুলেই গেছে বাঁদী, কোন বান্দার সঙ্গে হাসি-মশকরায় মজে গেছে। মজাদার হারেমের কানুন কিতাই আলাদা।

আপন মনে সুর তুলতে থাকে বীণায়। হাতের স্পর্শে তুঁত কাঠের সাজ সজীব হয়ে উঠেছে। মুলতানের সুরে উদাস হয়ে ওঠে বৃষ্টি ধোয়া অপরাহ্ন বেলা।

কাঁপছে সুরটা। খাদ থেকে ধীরে ধীরে উঠছে চড়ার দিকে। উদারা মুদারা ছাড়িয়ে তারার দিকে চলেছে খরোজের আলাপ; উঠে বসল বেগম। যেন স্বপ্ন দেখছে সে। জীবনের হারানো কত হাসি দুঃখের স্বপ্নভরা দিন। একটি নীরব নীলুফরের মত সুগন্ধি ছড়ানো অন্তর। সুরের সাত রং সকাল সন্ধ্যা রঞ্জিত করে তুলতো, চাঁদনী রাতে ঝরে পড়তো তারার বুক থেকে বেদনার ঝরনা ধারা।

চেনা সুরে চেনা গানটা কে বাজাচ্ছে, ঝরোখার ধারে এসে দাঁড়াল; ঠিক নীচে বসে লোকটা বাজাচ্ছে, দেওয়ালের আড়ালে থেকে তাকে দেখা যায় না। গুমরে ওঠে সুরটা!

প্রায়ই শুনেছে বীণকারকে বাজাতে ওই সুর। আঁধেরা ঘর, প্রিয় বিরহে সব আশার আলো নেভা জমাট অন্ধকার, মন কাঁদা রাত্রি শেষ। জাগর রাত্রির মিলনের সাক্ষী ছিল ওই প্রদীপ, সেও নিভে গেল। নিবিড়তর হয়ে ঘিরে আসে অন্ধকার তমসা, কূল তল নেই দুঃখের।

—জুলমৎ কদমে মেরে সবি আগম কা যোশ হ্যায়।
এক সমা হ্যায় দালিলে—এ সোহর সো খামোশ হ্যায়॥

—সেলাম বেগমসাহেবা!

বেগম ওর দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে ওঠে। ছেঁড়া ময়লা একটা আংরাখা, একপাশ একটু বেশি মাত্রায় ছিঁড়ে ধুলোতে লুটোচ্ছে। বোতামের বাঁধন নেই, ফাঁক দিয়ে বুকের কিছু অংশ বের হয়ে আছে; জুতোর বালাই নেই পায়ে। পথ চলার চিহ্ন জেঁকে বসেছে রুক্ষ কর্কশ কাঠিন্য নিয়ে। দাড়ি গোঁফে মুখের শীর্ণতা চাপা পড়েনি; জলজ্বলে অস্বাভাবিক দীপ্তিতে দুটো চোখমুখে ওর সহজ সুন্দর হাসি। দেহজোড়া দৈন্যের মাঝে মুখের হাসিটুকু শান্ত মাধুর্যের সম্পদে ভরে উঠেছে। কোন অনুযোগ কোথাও নেই। ও যেন অগ্নিশিখা, দুঃখের ঝড়ো হাওয়ায় ওর ময়লা ছাই উড়ে গিয়ে আগুনের আভা আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

দেখছে বেগমকে ; দামী পোশাকের প্রান্ত লুটোচ্ছে মর্মর মেজেতে ; সারা ঘরে ফুলের সুবাস, একটা মল্লিকার সপুষ্প লতা দখলম থেকে এসে ঘরের ভিতর উঁকি মারছে। আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে বেগম। তওফাওয়ালীর হালকা শরীরে মেদ জমেছে। চোখের চাহনিতে কেমন বিভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা।

—কেমন আছো বীণকার ? ভুলেই গেছো একেবারে

হাসছে বীণকার—ভালোই ; তোমাকে ভুলবো কেন বেগম, তোমার পরশ যে সর্বাঙ্গে পরম আদরে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

কি ভেবে ছেঁড়া আংরাখাটা খুলে পিছনে ফিরে দাঁড়াল বীণকার, পরিহাস তরল কণ্ঠে বলে ওঠে– দেখেছো বেগমসাহেবা !

– এ কি ! চমকে উঠেছে বেগম। পিঠে হাতে চাবুকের গভীর ক্ষত ; বিষিয়ে উঠেছে দগদগে ঘা হয়ে।

—একা আমার নয় বেগমসাহেবা, চকের তামাম দিয়ানা দরবেশ আজ তোমার প্যায়রা ইয়ার জঙ্গের হাতে বেগমশাহী শাসনের এমনি চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে।

থমকে দাঁড়ালো বেগমসাহেবা। কি যেন ভাবছে। ইয়ার জঙ্গ যে এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে তা কল্পনাই করেনি। মনে হয় এ আঘাত ইয়ার জঙ্গ ওই দরবেশকে করেনি, ওই চাবুকের ঘা পড়েছে তারই পিঠে নির্মম ভাবে।

--পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে বীণকার ?

—আর যে যাবার কোন জায়গা নেই বেগম। ঘর যার নেই, পথই তার সম্বল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বেগম। আলখাল্লাটা তুলে আলতো ভাবে গায়ে চাপিয়ে উঠে পড়ে বীণকার।

---সেলাম বেগমসাহেবা। যাবার উদ্যোগ করছে বীণকার।

—কোথায় যাবে ?

—পথেই।

ওকে বাধা দেবার কোন অধিকারই নেই বেগমের। শূন্য হাতে সারা পৃথিবীকে যেন জড়িয়ে ধরতে পেরেছে ও ; বাংলার মসনদ তার তুলনায় তুচ্ছ, নগণ্য।

বের হয়ে গেল ওয়াজিদ। আজ বেগম যেন অজানতেই কি এক চরম দুর্বলতার সন্ধান পেয়েছে নিজের অন্তরের। কোথায় দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে

আছে তার মন—নিজের অজানতেই। চোখের উপর ভেসে ওঠে দগদগে চাবুকের দাগ—নিষ্ঠুর! ইতর ইয়ার জঙ্গ।

—বাঁদী! রেজা খাঁকে তলব করে পাঠা, এখুনিই।

চকিতের জন্যও অনুভব করে মণিবেগম ভিন্ন এক সত্তার অস্তিত্ব। কোনটা আসল আর কোনটা নকল জানে না, সব যেন ঘুলিয়ে ফেলেছে সে। মনের মাঝে জাগে একটা শূন্যতার হাহাকার; বার বার কানে আসে সুরটা।

—এক্ সমা হ্যায় দালিলে এ সোহ্‌র সো খামোশ হ্যায়।

মিলন মধুর রাত্রির প্রিয় স্মৃতিসঙ্গী ছিল একটি প্রদীপ—তাও নিভে আসছে অতল অন্ধকারে। সেই রোশনীর হারানো শিখার শোকে হাহাকার করে সারা অন্তর! কি যেন অমূল্য সম্পদ হেলায় হারাতে বসেছে।

চোখের সামনে মিলিয়ে গেল বীণকারের শীর্ণ দেহ। পথের মানুষ আবার পথেই মিশে গেল।

নন্দকুমার আশা নিয়েই কলকাতাতে এসেছেন। আগামী জীবনের অঙ্কুর এখানের মাটিতে জন্ম নিয়েছে। নতুন শহর গড়ে উঠছে, দেশবিদেশ থেকে আসছে ব্যাপারী, তারা বসবাস গড়ে তুলেছে সুতোনটী, গোবিন্দপুরের মাঝে। ওপারে শিবপুর হাওড়া বেতর উত্তরপাড়াকে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে এই সেদিনের চার্নকের স্বপ্ন-দেখা কলকাতা। চিৎপুর থেকে কালীঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে বন জঙ্গল সাফ হয়ে গেছে। বাবা চৌরঙ্গীনাথের আশ্রমের ধারে এখন সেই আদিম বনানীর ছায়া জেগে আছে মাত্র। মাঝে মাঝে বাংলো গড়ে উঠছে বনভূমির বুকে।

নবকেষ্ট, গঙ্গাগোবিন্দ, কান্ত মুদী—এরাই এখন কালা আদমীর মধ্যে ইংরেজের বেশি পেয়ারের। পাতু কাহার এখন বাবরি চুল রেখে শিষ দিয়ে গামছা ঘুরিয়ে নদীরঘাটে মাল খালাসীর তদারক করে। কি করে সে ভাগ্যের অচল চাকাটাকে সচল করে তুলেছে। সারি সারি জাহাজ নোঙর করেছে গঙ্গার বুকে, কেল্লার নীচে প্রশস্ত চত্বরে রাশি রাশি লোহাকাঠ, শাল-সেগুন কাঠ জমা করা রয়েছে। সারা দিনরাত শতশত করাতী তক্তা বের করছে, ওপাশে ঠক্ ঠকা ঠক্ শব্দে কানপাতা দায়, কয়েকশো হাতুড়ি চলেছে একসঙ্গে। বড় বড় জাহাজ তৈরি হচ্ছে। রকমারি মাল উঠছে বড় বড় সমুদ্রপাড়ি দেবার

জাহাজে। ওদিকে বড় বড় কড়াইএ পিচ গলছে, এলাহি কাণ্ড। কোম্পানির জাহাজীব্যবসাও পুরোদমে চলেছে। দেশবিদেশ পাড়ি দেবার মত মস্ত মস্ত জাহাজও তৈরি করছে ওরা এদেশী মিস্ত্রিদের দিয়ে।

জীবনের গতিবেগ এখানে বেড়েছে অনেক। মুর্শিদাবাদের তুলনায় সেই গতিবেগ অনেকগুণ বেশি। এখানে অঢেল সম্পদ কুড়িয়ে কুড়িয়ে সঞ্চয়ের পাহাড় বানানোর আয়োজন চলেছে। কান্ত মুদী, নবকেষ্ট, গঙ্গাগোবিন্দ সেই মধুর সংবাদ পেয়ে ভ্রমরের মত এসে জুটেছে। আর মুর্শিদাবাদ সঞ্চয়টুকু ছড়িয়ে ছড়িয়ে অপব্যয়ের খাতে বয়ে চলেছে। দেউলিয়া মুর্শিদাবাদ। আর কয়েক বৎসর মাত্র ওর জীবন, তারপরই অতীতের ইতিহাসে পাতার আড়ালে মুখ ঢেকে বসে থাকবে, নতুন মানুষ জীবন গড়বে এই কলকাতাকে নিয়ে। এই সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে মহারাজের মনে।

কোম্পানিবাগানের পাশে একটা ছোট্ট বাড়ির ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল, সেইখানেই উঠলেন। ভদ্রপুর থেকে পরিবারবর্গও এসেছে। গুরুদাস কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিতে চলেছে, তাকে নতুন সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। কোন কায কারবার করা দরকার, তারও ভবিষ্যৎ আছে।

ক্লাইভকে তিনি ভালভাবেই চেনেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ক্লাইভ যুদ্ধ করার সময় অনেক বাঙালীই তাঁকে সাহায্য করেছিল, মহারাজ তখন হুগলীর ফৌজদার। এ ভুল তিনিও করেছিলেন। তাই মনের কোণে কোথায় আশা আছে ক্লাইভ অতীতের কথা ভেবে তাঁর কর্মদক্ষতার দাম নিশ্চয়ই দেবেন। নন্দকুমার শেষ চেষ্টা করবেন ক্লাইভের দরবারে!

ক্লাইভ বিশেষ জরুরি কাজে ভারতে এসেছেন। শাসন ব্যবস্থার মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে, সেগুলো মেরামত করে ইংরেজের সাম্রাজ্যতরণী স্থায়ীভাবে ভাসানোর আশায়। নবাব ভারতের বাদশাহের কাছ থেকে নেওয়া সনন্দের বলেই সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যা শাসন করছে, রাজস্ব আদায় করছে। নবাবীই এখন তাঁদের হাতের মুঠোয়; সুতরাং সুবে বাংলাও তাঁদের কব্জায়, তবুও আইনের ফাঁক বাঁচাবার জন্যই বাদশাহী সনন্দের দরকার। আজ ভারতে ইংরেজের বাণিজ্যাধিকারই নয়, কায়েমী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক করে যাবার জন্যই এসেছেন ক্লাইভ। সমুদ্রপারে বিশাল বিস্তীর্ণ সম্পদশালী দেশ,

ধনধান্যে পূর্ণ এর অন্তর। সেই দেশ ক্লাইভ তাঁর মাতৃভূমির জন্য দখল করতে এসেছেন।

এ ব্যাপারে হেষ্টিংসের সঙ্গে পরামর্শ করতে চান তিনি। কাশিমবাজার থেকে হেষ্টিংসও এসে হাজির হয়েছে। তার উদ্দেশ্য রেজা খাঁকে নায়েবসুবা পদে বহাল করা। দেশের সামাজিক অবস্থা রাজনীতি মাফিক্ শাসন পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। রেজা খাঁ এ সব বিষয়ে পারদর্শী। নানা কারণেই হেষ্টিংস রেজা খাঁকে এই পদে বসাতে চায়; মণিবেগমও অনুরোধ করেছে।

হেষ্টিংস বলে চলেছে—দেশের মুসলমান জনসংখ্যাও কম নয়, মুর্শিদাবাদ নিজামতে তাদেরই প্রাধান্য। তাই আমার মতে নায়েবসুবার পদ রেজা খাঁকে দেওয়াই সঙ্গত। হাজার হোক শাসকের জাত তারাই।

ক্লাইভ এই সাম্প্রদায়িকতার যুক্তি ঠিক মানতে পারেন না, জবাব দেন—কিন্তু মহারাজ নন্দকুমার কাজের লোক। এর আগে দেড়লক্ষ টাকার জমাবন্দী কাজ তিনি করেছেন। মেদিনীপুর, হিজলী, বর্ধমানের তহশীলদার ছিলেন। হুগলীতে থাকার সময়ে আমি নিজে দেখেছি তাঁকে। যোগ্য লোক।

হেষ্টিংস একটু চুপ করে যায়। হাজার হোক পদমর্যাদায় ক্লাইভ তার উপরে। বাংলায় প্রথম ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন তিনিই। তাঁর তুলনায় হেষ্টিংসের কোন অবদানই নেই। একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে,

—অবশ্য আপনি যা ভাল বোঝেন তাই হবে।

রেজা খাঁয়ের জন্য নগ্নভাবে ওকালতি আর করা যায় না। ধূর্ত ব্রাহ্মণ ওই নন্দকুমার ঠিক সময় বুঝেই কলকাতায় চলে এসেছে দরবার করতে। ক্লাইভ বলেন—বড় বড় জমিদার, রাজারা সবই হিন্দু। তাঁরাও চান, নন্দকুমারই নায়েবসুবা থাকুন। তাঁদের চটিয়ে কায নিরাপদে চালানো যাবে না।

হেষ্টিংস ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। জল গড়িয়েছে অনেক দূর অবধি। তার হাতের নাগালের বাইরে যেন ভেসে চলেছে নায়েবসুবার পদ। চাকা কোন দিকে ঘোরে কে জানে?

হঠাৎ মনে পড়ে যায় ব্যাপারটা। শেষ চেষ্টা করতেও হেষ্টিংস ছাড়বে না। রেজা খাঁ না হলে তার মস্ত অসুবিধা, অসুবিধা হবে আরও অনেকের। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কালো ব্যাকুল চাহনি ভরা একজোড়া চোখ, নিটোল সুগৌর দেহের ভাঁজে ভাঁজে অফুরান যৌবনের প্রাচুর্য, নিবিড় স্বপ্নমদির স্পর্শ। মণিবেগম! পাগলা ঘোড়ায় রাশ পড়েছে; গতিবেগ স্তব্ধ হয়ে গেছে, উদ্দাম

চাঞ্চল্যে পা ঠুকছে পাথরে ঠক্ ঠক্। আগুনের ফিন্‌কি ছুটছে চারিদিকে, প্রদীপ্ত কামনার বহ্নিজ্বালা।

মণিবেগমকে কথা দিয়ে এসেছে সাহেব।

ক্লাইভ নিজেই তদন্ত করছেন। মহারাজ নন্দকুমার তাঁর কাছে এসে নিরাশ হননি। আগেকার দিনের কথাবার্তার পর ক্লাইভ এসে পড়েন আজকের দিনে। মীরজাফরের জন্য ক্লাইভের মনে একটু দুর্বলতা ছিল। শত বিপদের মাঝে ওই একটি লোকই ছিল ইংরেজের অকৃত্রিম বন্ধু। তার শেষ জীবনের করুণ কাহিনী শুনে বেদনা বোধ করেন ক্লাইভ।

—May his soul rest in peace.

নন্দকুমার শেষ সময়েও প্রভুকে পরিত্যাগ করেননি। কর্তব্যে অবিচালত ছিলেন। ক্লাইভ নন্দকুমারের কথাতেই টের পান কোম্পানির লোক আজ বে-আইনী ব্যবসা চালাচ্ছে। বহু রেভিনিউ লোকসান হচ্ছে কোম্পানির। চিন্তিত হয়ে উঠেছেন তিনি।

—প্রমাণ আছে তোমার এ অভিযোগের? ক্লাইভ প্রশ্ন করেন।

—প্রমাণ না থাকলে এ অভিযোগ করবার সাহস আমার হতো না। দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেন নন্দকুমার।

দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে হেস্টিংস। কানে আসে নন্দকুমারের কথাগুলো। গরম সীসের মত কানে বিঁধছে। ধূর্ত ব্রাহ্মণ নিজামতের অনেক গোপন সংবাদই জানে। পিক্র, ইয়ার জঙ্গ, মেজর স্কট, মিডলটন, হেস্টিংসের অনেক গোপনতম সংবাদই সে সরবরাহ করতে পারবে। রাগে কাঁপছে সাহেব।

নীরবে পায়চারি করছেন লর্ড ক্লাইভ। মনে মনে কি ভাবছেন। সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন আজ সত্য হতে চলেছে। কিন্তু জনমতকে যদি ক্ষেপিয়ে তোলে ওরা, বিদেশে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে সাম্রাজ্যস্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে। সমস্ত লোভী বিশ্বাসঘাতককে তিনি সরিয়ে দেবার জন্যই কোম্পানির ডিরেক্টারদিকে অনুরোধ করবেন। দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠেন ক্লাইভ,

—নায়েবসুবার পদ পেলে আপনি এসব বন্ধ করতে পারবেন?

ক্লাইভের কথাগুলো শুনে চমকে ওঠে হেস্টিংস।

মহারাজ জবাব দেন দৃঢ়স্বরে—ঈশ্বরের নামে শপথ করে এইটুকু প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, জ্ঞানত কোন দিন পাপ অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই নি, ভবিষ্যতেও দোব না। এ আমার ধর্ম, ব্রাহ্মণ কখনও ধর্মভ্রষ্ট হয় না সাহেব।

ওঁর আন্তরিকতায় বিশ্বাস করেন ক্লাইভ। দৃঢ়তেজা সত্যবাদী। কথার মর্যাদা রেখে এসেছেন এতদিন, আজও অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখেন না।

হঠাৎ এমন সময় হেস্টিংসকে ঢুকতে দেখে ফিরে চাইলেন ক্লাইভ, মহারাজও। হেস্টিংসের হাতে একটা চামড়া বাঁধানো ফাইল। এগিয়ে এসে মহারাজের সামনে সেটা খুলে কয়েকখানা চিঠি, কাগজপত্র দেখিয়ে কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে সাহেব—এগুলো আপনার লেখা? এ সইও আপনার? জবাব দিন।

চমকে ওঠেন মহারাজ। সারা মুখ বিবর্ণ রক্তশূন্য হয়ে ওঠে। অতীতের বন্ধন মুক্তির সামান্য প্রচেষ্টার ক্ষীণতর সাবুদগুলো কি করে ইংরেজের হাতে এসে পৌঁছল তা ভাবতেই পারেন না। হেস্টিংস যে বহুদিন আগে হতেই তাঁকে নজরে রেখেছিল তা আজ পরিষ্কার হয়ে ওঠে মহারাজের কাছে। অবাক হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে এ পরিষ্কার চক্রান্ত, সেইদিনের বিদ্রোহের ক্ষীণতম গোপন ষড়যন্ত্র আজ প্রকাশ করে জয়লাভ করতে চায় হেস্টিংস। শেষ অস্ত্র হেনেছে শয়তান ওই ইংরেজ।

—জবাব দিন মহারাজ!

হেস্টিংসের তীক্ষ্ণ নীলাভ শয়তানীর আভামাখানো দুটো চোখের তীব্র দৃষ্টি তাঁর মুখে নিবদ্ধ। একটি মুহূর্ত; চোখের ওপর ভেসে ওঠে সেই বরাভয়মাখা শঙ্খচক্রধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। পরম নির্ভয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে, নিষ্কম্প কণ্ঠে জবাব দেন মহারাজ—হ্যাঁ, আমার সই ওগুলো।

—এগুলো মহারাজের লেখা চিঠি, তাকে নায়েবসুবার পদ দেবার আগে এগুলো একটু দেখা দরকার ইয়োর এক্সেলেন্সি।

ফাইলটা ক্লাইভের দিকে এগিয়ে দেয় হেস্টিংস।

একবার চোখ বুলিয়েই অবাক হয়ে যান ক্লাইভ, এ যেন বিশ্বাসই করতে পারেন না তিনি। সামনে দাঁড়িয়ে সেই মহাশত্রু। ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রধান ষড়যন্ত্রকারী অক্ষতশরীরে দাঁড়িয়ে, শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, তাকে উলটে সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নায়েবসুবার পদ দিতে যাচ্ছিলেন। কল্পনা করতেই শিউরে ওঠেন লর্ড ক্লাইভ।

কয়েক বৎসর আগেই নন্দকুমার ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে নামবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কাশীর হিন্দুরাজ বলবন্ত সিংএর সঙ্গে সলাপরামর্শ পত্রালাপও চলেছে এই প্রসঙ্গে। শুধু কি তাই, ইংরেজকে বাংলার মাটি থেকে

শিকড় সমেত উপড়ে দূর করে ফেলে দেবার জন্য ওলন্দাজ বণিকদের সাহায্যও চেয়েছেন এবং তাই নিয়ে আলাপ-আলোচনাও চালিয়েছেন।

ও যেন একটা অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে মাটি কাঁপিয়ে তুলবে প্রচণ্ড গর্জনে, রুদ্ধমুখ খুলে দিয়ে গলিত লাভাস্রোত নেমে আসবে, প্রবল প্লাবনে ভাসিয়ে দেবে ইংরেজের সব আশা কামনা। দেশের হিন্দুরাজা জমিদাররা সবাই তার হাতের মুঠোর মধ্যে। ওকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

—এসব সত্য নন্দকুমার ?

ক্লাইভ উঠে এগিয়ে এসেছেন তাঁর সামনে।

—হ্যাঁ, সব সত্য। স্থির কণ্ঠে জবাব দেন তিনি।

ওঁর দৃঢ়তায় বিস্মিত হন ক্লাইভ—এর কি শাস্তি তা বোধ হয় আপনার জানা আছে ?

—হ্যাঁ।

—রাজদ্রোহিতার শাস্তি ডেথ্। মৃত্যু।

মহারাজের মুখে প্রশান্ত হাসির আভা, স্থির কণ্ঠে জবাব দেন তিনি,

—ইংরেজ এখনও রাজত্ব পায়নি সাহেব, আইনত নবাবই রাজা। রাজদ্রোহিতার অপরাধে যদি কেউ অপরাধী সাব্যস্ত হয়, সে হবে ইংরাজই, আমি নই। সুতরাং রাজদ্রোহিতার প্রশ্ন এখানে না তোলাই সঙ্গত।

হেস্টিংস উত্তেজিত হয়ে ওঠে; অক্সফোর্ডশায়ারের সাহেব মুচির তৈরি জুতোর ডাক থেমে গেছে। গর্জন করে ওঠে—Stop I say.

ক্লাইভ প্রশ্ন করেন—কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তা সরাসরি ডিরেক্টারবোর্ডকে জানান নি কেন ?

নন্দকুমার কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠেন—এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমি জানতে চাই সাহেব তোমাদের দুজনের মধ্যে কর্তা কে ? প্রভু ভৃত্যের সম্পর্কটা আগে ঠিক হোক, সেই প্রভুকেই আমি জবাব দোব ; অন্য কাউকে নয়। প্রভুর সামনে ভৃত্যের এই অশোভন ঔদ্ধত্য সুসভ্য ইংরেজের আইনে আছে কিনা জানি না, আমাদের সভ্যতায় তা অমার্জনীয় অপরাধ।

হেস্টিংসের মুখ টকটকে রাঙ্গা হয়ে ওঠে। ক্লাইভ একবার তার দিকে চেয়ে জবাব দেন—আমাকেই বলতে পারেন।

নন্দকুমার দৃঢ়তেজদৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন,

—আপনার দেশে যদি কেউ জোর করে অধিকার শোষণ কায়েম করতে যায়, আপনি তাকে কি চোখে দেখবেন ? আপনি কি কোনদিন ক্ষমা করবেন তাকে ? ইংরাজ আমার মাতৃভূমিতে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই পা দিয়েছে। কোম্পানির ব্যবসার আড়ালে তার সেই মুখোশ আমার চোখে ধরা পড়েছিল, আমি তারই প্রতিবাদ করেছি মাত্র। প্রতিবাদ করেছি ইংরেজের নানান অমানুষিক অত্যাচারের।

স্থির কণ্ঠে ক্লাইভ বলেন—এর ফল কি তা জানেন ?

—জানি। নায়েবসুবা আমার হাতে পারতপক্ষে আপনারা তুলে দেবেন না। কোন স্বীকৃতিই দিতে চাইবেন না আপনারা, কিন্তু আপনি বীর, নিজের দেশকে ভালবাসেন, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না নিশ্চয়। আমি আইনের চোখে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

কথার জবাব দিলেন না সাহেব। হয়তো কথাটা মনে গভীরভাবে বেজেছে। হেস্টিংস আর কথা কয়নি। মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাজ হাসিল হয়েছে। কিন্তু এই অপমান ভুলতে পারেনি সে।

ক্লাইভ ধূর্ত—কূটকৌশলী। বাঙালীর দৃঢ়তাকে তিনি কিছুটা চেনেন। মোহনলালকে দেখেছিলেন পলাশীর প্রান্তরে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে বাংলার মাটিকে রঞ্জিত করে গেছে। এও যেন সেই মোহনলালের জাত, তবে পথ ওদের ভিন্ন। ওরা ধরে অস্ত্র; এরা বুদ্ধি আর কূটনৈতিক চালে যুদ্ধ চালায়। ওকে এখানে রাখা নিরাপদ নয়। বাংলার অন্যপ্রান্তে সরিয়ে দেবেন তাকে কোন কাজের অছিলায়, যাতে কলকাতা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের শান্তি অটুট থাকে।

—চট্টগ্রাম সদ্য কোম্পানির হাতে আসছে ! সেইখানেই কাজ-কর্ম দেখা-শোনার জন্য আপনার মত বিচক্ষণ লোককে পাঠাতে চাই।

তির্যক দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন মহারাজ। ওঁর সতেজ দৃষ্টির সামনে ক্লাইভের মনের সমস্ত পাপ যেন প্রকাশিত হয়ে পড়ে। জবাব দেন মহারাজ—নির্বাসন দিতে চান আমাকে চট্টগ্রামে ?

—আপনি যে ভাবে কথাটা নেন। ক্লাইভ বলে ওঠেন।

—যদি না যেতে চাই, প্রতিবাদ করি ?

অক্সফোর্ডশায়ারের মুচির তৈরি জুতোর শব্দ বেড়ে ওঠে, হেস্টিংস কি যেন বলতে গিয়ে ক্লাইভের দিকে চেয়েই থেমে গেল। বন্দী সিংহের মত পায়চারি করছে নিষ্ফল আক্রোশে ঘরময়।

—আপনার কথাটা বললাম।

পরিহাস তরল কণ্ঠে জবাব দেন মহারাজ—ইংরাজ যে আমার এতবড় হিতৈষী বন্ধু তা আগে জানলে কাজ হতো।

— নন্দকুমার!

বের হয়ে আসছিলেন মহারাজ, ক্লাইভের গর্জনে থামলেন, হেস্টিংসও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে করবার মত একটা কাজ পেয়ে যাবে, মনে হয় ওই উত্তরীয়ধারী অর্ধনগ্ন ব্রাহ্মণকে ধরে ওর সুগৌর পিঠে চাবুক বসাতে পারলে গায়ের জ্বালা মেটে ; উদ্ধত ব্রাহ্মণ! মহারাজও স্তব্ধ তেজদৃপ্ত চাহনিতে চেয়ে রয়েছেন ক্লাইভের দিকে। অন্তরের সমস্ত শুচিশুভ্র সাত্ত্বিকতা পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে ঝরে পড়ছে তাঁর দৃষ্টিতে, সত্যনিষ্ঠার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল সেই চাহনি। ক্লাইভ মাথা নামালেন। স্তব্ধতা নেমে আসে হলঘরে. টানা পাখাটা কাঁপছে মাত্র। মাথা উঁচু করে বের হয়ে এলেন মহারাজ। ওরা তাঁকে রুখতে পারেনি।

—হেস্টিংস! ক্লাইভ অপমানিত বোধ করে গর্জে ওঠেন।

ক্লাইভের ডাকে এগিয়ে এসে দাঁড়াল সে—ইয়োর এক্সেলেন্সি!

চোখে চোখে কি যেন ইশারা খেলে যায়।

কাছারিখানা. খাজাঞ্চিঘর, এদিকে ওদিকে সংবাদটা রটে গেছে। মহারাজকে বোধ হয় গারদ করবেন লর্ড সাহেব। রেজা খাঁও এসেছে, খাজাঞ্চিখানায় বসে আলবোলায় টানছে সুগন্ধি অম্বুরী তামাক। নায়েবসুবার খবর বের হয়েছে, আজ সারারাত ধরে বাগানে স্ফূর্তি চলবে। ইতিমধ্যে উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়েছে। কোন বাইজীর নাচের মুজরোয় পাঁড় মাতালও চাঙ্গা হয়ে ওঠে, কে কয় বোতল শেষ করবে তার ফিরস্তী হয়ে গেছে। বাংলার সব এস্টেটের নায়েব, দেওয়ানরাও অনেকে এসেছেন। তাঁরাও নিমন্ত্রিত হবেন।

হঠাৎ দেখা যায় নন্দকুমার যাচ্ছেন পথ দিয়ে। একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়। ওঁর সঙ্গে যারা বজরায় এসেছিল সেই দেওয়ান নায়েবের দল যেন উসখুস করে ওঠে। সাহেবদের সঙ্গে ওঁর তুমুল ঝগড়ার খবর শতগুণ হয়ে পৌঁচেছে কাছারিতে। ওকে নমস্কার করলেই ইংরেজের বিষনজরে পড়তে হবে। রেজা খাঁও এখানে উপস্থিত আছেন, জমিদারি রাখা দায় হবে।

নন্দকুমারও বিস্মিত হন। নাটোরের দেওয়ান, দিনাজপুরের নায়েব, আরও কয়েকজন হঠাৎ তাঁকে দেখে কাছারির ভিতর দিকে চলে গেল। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল তাঁকে আজ।

মনে মনে হাসি আসে এ দুঃখেও। বিচিত্র জীবন! আলোছায়ার রংএ ভরা এর পথ। সকালের আলোয় যেদিকে থাকে ছায়া, সন্ধ্যার পড়ন্ত বেলায় সেই ছায়াও দিক বদলায়, প্রতিদিন। এর ব্যতিক্রম জীবনের ক্ষেত্রেও নেই।

একাই চলেছেন মহারাজ। জনহীন পথ ধরে। দুদিকে মিশকালো দেওদার, বননিম গাছে ঢাকা আবছা অন্ধকার। দূরে গঙ্গার বুকে নৌকা দেখা যায় দু'একটা। কুলি-মাল্লাদের কোলাহল থেমে এসেছে। শ্মশানকালী মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। নিমগাছে ঘেরা ঠাঁইটা, গঙ্গার জলো হাওয়ার স্বর বাজছে চামর দোলানো পাতায়, দূরে একটা চিতার আগুন নিভে গেছে। অন্তহীন স্তব্ধতার মাঝে বসে আছেন তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে। জীবনের একটা নতুন পথ যেন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সামনে। ক্লাইভ হেস্টিংসের দলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ পরখ করেছেন, কত ভীরু তারা। নিজেদের পাপ আর দোষের বোঝায় নুইয়ে পড়েছে ওরা, পরের দোষ সন্ধান করবার মত নৈতিক বল-সাহস তাদের নেই। শুধু হুমকি দিয়েই কায চালাচ্ছে ওরা।

আজ থেকে অন্য কোন এক মানুষ জন্ম নিচ্ছে তাঁর মনে, শ্মশানের চিতা-ভস্ম ঠেলে উঠছে রুদ্র ভৈরবের মূর্তি; বাম মুখে অমঙ্গলকে সংহার করবার শক্তি, দক্ষিণ মুখে তার সৃষ্টির পুণ্যজ্যোতিমাখা প্রশান্তি।

সারাদেহে যেন শিহরণ অনুভব করেন মহারাজ। পাপহারিণী গঙ্গার জলে স্নান সেরে উঠেছেন তিনি। দেহ মন শুচিতায় পূর্ণ হয়ে গেছে। করজোড়ে নমস্কার করেন কুলদেবতা বিষ্ণুকে, নমস্কার জানান শ্মশানেশ্বর মহাভৈরবকে,

—রুদ্র যৎ তে দক্ষিণ মুখং তেন মাম্ পাহি নিত্যং

সেই দক্ষিণ মুখের প্রশান্তি পেতে হলে অমঙ্গলকে দলিত মথিত করে যেতে হবে। নিজের মধ্যে অতীত চির জাগ্রত আত্মার সন্ধান সহজে মেলে না। ইংরেজের শত সহস্রগুণ শক্তির সামনে নিজেকে আজ তুচ্ছ মনে করেন না তিনি।

বৈকালের গিনিগলা রোদ সবুজ পাতায় হলদে আভা এনেছে। পত্রাবরণ থেকে গান গাইছে পাখি। এই তার আকাশ, এই তার জগৎ, অখণ্ড শান্তি প্রশান্তিতে পূর্ণ। কোন ঝড়ই স্থায়ী দাগ ফেলতে পারে নি। কোনও কালো

মেঘই চিরদিনের জন্য আলো ঢেকে দিতে পারে নি। নিরাশ হন না তিনি।

এগিয়ে চলেন বাড়ির দিকে। কাছাকাছি এসে একটু বিস্মিত হন। তাঁর বাড়ির চারিপাশে সশস্ত্র প্রহরী। পাড়ায় একটা চাপা উত্তেজনা। মহারাজকে নাকি বন্দী করেছে ইংরেজ। একটু হাসেন তিনি। ভীরু ইংরেজ আজ শিউরে উঠেছে, ওর নগ্ন কদর্যতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এত ঠুনকো ওদের বীরত্ব যে একজনমাত্র মানুষের আঘাতে ভব্যতার মুখোশ খুলে দাঁড়িয়েছে আকাশজোড়া শোষণকারী শয়তানের প্রকৃত মূর্তি।

দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। সিপাইরাও তাকে বাধা দিল না। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল তারা।

স্ত্রীর কান্নার শব্দও শুনে অবাক হয়ে যান তিনি, গুরুদাসও ভয় পেয়ে গেছে। চট্টগ্রামে নির্বাসন দেবার সংবাদও পৌঁছে গেছে। স্ত্রীকে অভয় দেন,

—এতে বিচলিত হয়ো না, সবই সহজভাবে নিতে হবে বড়বৌ। যে ভগবান আঘাত দেন, তিনিই আবার কল্যাণের দানে সব কালো আলো করেছেন, তাঁর উপর ভরসা হারিয়ো না।

কয়েকমাস কেটে বৎসর ঘুরে এল এমনি করে। একঘেয়ে জীবন। মাঝে মাঝে গঙ্গায় স্নান করতে যায় মায়া। ঘাটের ধারে একটা বটগাছের ছায়া নদীর জলে পড়েছে, পুরানো ঝুরিনামা বটগাছ; ওপারে বিস্তৃত ছায়াঘন আমবাগান. সবুজ পাটক্ষেতের সীমানা। নির্জন ঘাটের ধারে বসে চোখ ফেটে হু হু জল আসে মায়ার। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছোট্ট একটু কুঁড়ে ঘর, উঠোনের তুলসীমঞ্চে গলবস্ত্রে প্রণতি জানিয়ে সন্ধ্যাদীপ জ্বালনো একটি মেয়ে, পাখিডাকা, সন্ধ্যা সকালের শান্ত জীবনযাত্রা আজ তার কাছে স্বপ্ন। সুদূর অতীত আর বর্তমানের মাঝে দুস্তর নদীর ব্যবধান।

ইয়ার জঙ্গের মহলের এককোণে অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে মায়া জীবনের সব শ্রী সম্পদ হারিয়ে। সীতানাথ পণ্ডিতের কোন খবরই সে পায় নি। লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, কিন্তু বাধা দিয়েছিল সেই নিভৃত শান্ত জীবনের মধুর স্মৃতি; সীতানাথের দেখা একদিন হয়তো পাবেই, নিরপরাধ অসহায় মায়াকে সে ক্ষমাও করবে।

তেমনি শুভলগ্নের পথ চেয়ে আজ দিন গোনে সে, গোনে জাগর রাত্রির বেদনাভরা প্রহর।

—বাড়ি ফিরবেন না ? ঝিয়ের ডাকে ফিরে চাইল।

—বাড়ি!

মনের সেই ছবিটা মুছে যায় চোখের জলে।

বটতলায় মাঝে মাঝে ফকির-সন্ন্যাসীর আমদানি হয়; শহরের ঘাটে দু'চারজন এসে জমে, তারাই সাধুমহারাজের ধোঁয়ার খরচ জোগায়, দরকার পড়লে এখান ওখান থেকে দু'একটা কাঠের কুঁদো এনে ধুনির আগুনে চাপিয়ে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে—ব্যোম কালী।

কিন্তু এ যেন অন্য এক কিসিমের সাধু। নেশা ভাং করে না, ধুনিও জাগায় নি। বিভূতি মেখে কলকেয় টান দিয়ে কলকে তাতানো যার মুরোদে কুলোয় না সে আবার কোন ছাতার সাধু! ভক্তরা হতাশ হয়। ক্রমশ ভক্তের ভিড়ও কমে আসে। একদিকে গাছের নীচে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ওপারের ছায়াঘন বনের দিকে চেয়ে, মাঝে মাঝে তার বুক চিরে ওঠে দীর্ঘশ্বাস। কি যেন ফেলে এসেছে ওপারে, যেখানে যাবার আর কোনও অধিকার তার নেই। রাত্রি নেমে আসে, তারার বুকজ্বলা গনগনে রাত্রি, মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে ঘুমভাঙ্গা পাখি দু'একটা, আবার নেমে আসে অন্তহীন স্তব্ধতা। জেগে আছে সন্ন্যাসী, জাগর রাত্রির প্রহর গুণেই কাটে তার বিনিদ্র রাত্রি; বাতাস ভরে উঠেছে কুলু কুলু শব্দে, গঙ্গার জল তীরে আঘাত করে ফিরে যাচ্ছে ব্যর্থ হয়ে, কৃপণ মাটির স্পর্শ পাবার সাধনা তার নেই।

হঠাৎ কিসের শব্দে মুখ তুলে চাইল সন্ন্যাসী। ধুনির আবছা আলোয় আগন্তুককে দেখে শিউরে ওঠে, লাল আঙ্গরা ধিকি ধিকি জ্বলছে, ওর দুচোখে তেমনি জ্বালা।

—তুমি! দুজনেই চিনতে পেরেছে দুজনকে।

এগিয়ে আসে মায়া, কাঁপছে তার বুক, জড়িয়ে আসে দুঃসহ লজ্জায় তার দু পা, চলবার সাধ্য নেই। এসে লুটিয়ে পড়ে সন্ন্যাসীর পায়ের উপর। এতদিন এতকাল সে এইটুকুর জন্যই পথ চেয়ে বসে ছিল, জাগর দিন আর বিনিদ্র রজনীর প্রতিটি পল স্বপ্নাতুর করে তুলে। অঝোরে ঝরে পড়ে চোখের জল। বুকের পাথর ভার কমে আসছে, হালকা বোধ করছে মায়া।

—আবার ফিরে চলো আমাদের ঘরে। অশ্রুভেজা কণ্ঠে মায়া আবেদন

জানায়। দুচোখে তার অতীতের সেই স্বপ্নময় দৃষ্টি। সবুজে ঘেরা ছোট্ট শান্তিনীড়।

পথে পথে ঘুরে মরেছে সীতানাথ। অন্তহীন এ ঘোরা, কোন শান্তি পায় নি। বার বার মন চেয়েছে মায়াকেই ফিরে পেতে, আবার ফিরে যেতে সেই ফেলে আশা সবুজের প্লাবনে। কিন্তু এ কোন মায়া! যাকে সে আনমনে বার বার ডেকে ফিরেছে এ যেন সে নয়। এ বিধর্মীর আশ্রিতা, রক্ষিতা।

শিউরে ওঠে সীতানাথ, সংস্কার-জীর্ণ মন মুহূর্তের মধ্যে বজ্র কঠিন হয়ে ওঠে।

—তা আর হয় না মায়া, সম্ভব নয়।

আর্তনাদ করে ওঠে নারী—সম্ভব নয়! কেন?

—তুমি ধর্মভ্রষ্ট।

সামনে যেন বজ্রাঘাত হয়েছে মায়ার, অন্ধকারে রূপোলী জলধারা বুকে নিয়ে গঙ্গাও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। হাহাকার উঠছে বটগাছের পল্লব মর্মরে; আঁধারের মাঝে চোখ মেলে চেয়ে থাকে, নিথর তারাকাঁপা গঙ্গার জলে অল্প অল্প বাষ্পের আবেশে দৃষ্টি থেমে যায়। বুকে ভরসা এনেই জবাব দেয় মায়া, কান্নাভেজা তার কণ্ঠস্বর কাঁপছে ব্যাকুলতায়।

—তুমি বিশ্বাস করো?

—থাক, ও কথা। তুমি জাতিচ্যুত, শাস্ত্রমতে তোমাকে গ্রহণ করবার বিধান নেই।

সীতানাথ নিরাসক্তের মত থামিয়ে দেয় ওকে। ওর এই মায়াকে আজ কোন প্রয়োজন নেই, কোন আকর্ষণ নেই, স্বপ্নস্বর্গ আর সে রচনা করে না সেই ডিহিপাড়ার সবুজের মাঝে।

—কিন্তু তার জন্য আমি মোটেই দায়ী নই। তুমিও কি পেরেছিলে তোমার স্ত্রীকে রক্ষা করতে সেই রাত্রে? অথচ শাস্ত্রমতে আমার রক্ষার ভার নিয়েছিলে তুমিই। শাস্ত্রের বিধান সে রাত্রে পালন করতে যদি না পেরেছো এখানেও সে বিধান ভাঙতে ক্ষতি কি?

মায়ার দুচোখে নীরব ব্যাকুলতা। মনে মনে কোথায় যেন নিস্ফল ব্যর্থতা হাহাকার করে উঠছে পুঞ্জীভূত হতাশায়। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সীতানাথ। মায়ার এ প্রশ্নের জবাব দেবার সামর্থ্য তার নেই। ভীরু কাপুরুষ সে। নিজের দুর্বলতা শাস্ত্রীয় বিধানের খোলসে ঢেকে আত্মরক্ষা করতে চায়।

—আমার কথার জবাব   না ?

ধুনির আগুন ছেড়ে হিমরাতে উঠে চলে যাচ্ছে সীতানাথ ; মায়ার কথায় ফিরে দাঁড়াল—এর জবাব আগেই দিয়েছি তোমায়। তুমি ধর্মভ্রষ্টা, বিধর্মীর রক্ষিতা। তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকাই ভালো।

গর্জে ওঠে মায়া—মিথ্যে কথা। ভীরু তুমি, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার সাহস নেই। কাপুরুষ !

ওর কঠিন কণ্ঠস্বরে যেন ভয় পেয়েছে সাধু। উঠে সরে গেল সে।

অন্ধকারে মিশিয়ে গেল মূর্তিটা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মায়া, গনগন করে তাপ উঠছে আঙ্গরার ; ওর বুকের ভিতরে চলেছে অমনি অসহ্য একটা জ্বালা। দুঃসহ অভিমান আজ প্রতিশোধের রঙে আরক্তিম হয়ে উঠেছে ! অপমান !

স্বামী আজ পাকাপাকি ভাবেই তাকে ত্যাগ করে গেল ; এতদিনের আশা কামনা স্বপ্নসাধ ব্যর্থ হয়ে গেছে। বাঁধের নীচে পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে ছুটে চলেছে কলুষহারিণী গঙ্গা, অতল কালো জলে ঘূর্ণি উঠছে, কাঁপছে তারার আলো।

ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সব পাপ ধুয়ে মুছে ফেলবে, কেউই টের পাবে না তার কথা, চোখের জলও ফেলবে না কেউ। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় মায়া।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ঝড়ো হাওয়ায় উড়ছে এলোমেলো চুল, উতলা আঁচল। মরবে ? আত্মহত্যা করবে কেন ? কি তার পাপ ? যে কাজের জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী সে নয় তার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত করে সেই পাপকে স্বীকার করে নেবার মত দুর্বলতা আজ মুছে ফেলতে চায় সে মন থেকে। সীতানাথের মুখখানা মনে পড়ে, ঘৃণায় ভরে ওঠে সারা মন। সে তার উপর অভিমান করে সর্বনাশ করবে নিজের ?

ফিরে দাঁড়াল মায়া। বাড়ির দিকে এগিয়ে আসে। যে মন নিয়ে আজ বের হয়েছিল পথে, ধুনির আগুনে সেই কামনা—দুর্বলতা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কঠোর জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াল অন্য কোন নারী।

ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে এসেছেন। মণিবেগম রেজা খাঁয়ের জয়জয়কার। অন্তরালের কর্মকর্তা হেস্টিংস নিরাসক্তের মত রয়েছে। যেন পুতুল নাচিয়ে

ওস্তাদ, পর্দার আড়ালে দড়ি টেনে নাচাচ্ছে। নাচছে রেজা খাঁ, তাল দিচ্ছে তওফাওয়ালী মণিবেগম আর তামাম নিজামতের আমলারা।

আলোয় আলো হয়ে উঠেছে চকবাজার, রোশনীবাগ, হাজার দুয়ারীর গোল দরবারঘর। নহবত বসেছে, আর সুরে সুরে আকাশ সুরময়। বাগিচার গুলাব কলি পর্যন্ত শিউরে উঠে চোখ খুলেছে। মণিবেগমের জারজ সন্তান নজমদ্দৌলার পুণ্যাহ। সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার চোপদার জমিদার রাজারা সকলেই এসেছে। ইচ্ছাগঞ্জের মহলগুলো জেঁকে উঠেছে। পথে-ঘাটে চোগা চাপকান আসাসোঁটাধারী বরকন্দাজদের আনাগোনা। ক্লাইভ বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে সনন্দ নিয়ে আজ প্রথম নবাব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে এসেছেন নজমদ্দৌলাকে।

বুব্বু বেগম জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের এক কোণের মহলে দাঁড়িয়ে উন্মত্ত নগরীর আলোকশোভা আতসবাজির রোশনাই দেখছে। অন্ধকার আকাশের তারাকে ওরাও হার মানিয়েছে। আশমানে ফাটছে হাউই, ফুলকিগুলো ঝুরঝুর করে তীব্র চোখ ঝলসানো আলোয় আকাশ রাঙ্গিয়ে তুলে ঝরে পড়ে গঙ্গার জলে। শিশু মবারক আঙ্গুল বাড়িয়ে তাই দেখাচ্ছে।

পাশে মীরজাফরের ভাই জিয়াদ্দৌলা দাঁড়িয়ে আছে : হাসিতে ফেটে পড়ে মবারক।

—কি চমৎকার চাচাজ ! কিসের এত রেশনাই ?

জিয়াদ্দৌলা চুপ করে কি ভাবছে! অসহায় সে। চোখের উপর দেখলো মণিবেগম সব হাত করে কেমন কাজ গুছিয়ে নিল। আজ তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারও নেই। একজন পারত—কোম্পানি তাকে কলকাতাতেই রেখে দিয়েছে। মহারাজ নন্দকুমারের কথা মনে পড়ে বার বার।

—চাচাজী ! মবারক প্রশ্নটা ভোলেনি।

জবাব দেয় চাচা—পুণ্যাহের রোশনী হচ্ছে। মবারকের ন্যায্য দাবী থেকে তাকে বঞ্চিত করে জারজ সন্তানের অভিষেকের পুণ্যাহ।

দলে দলে লোক আজ রাজকোষ থেকে বিদায় দান নিয়ে চলেছে। সওগাদের প্রাচুর্যে তাদের দিল খুস হয়েছে। বিশাল চত্বরে হাজারো মুসাফির দরবেশকে কদিন থেকেই জাকাত্ দেওয়া হচ্ছে ভাবী নবাবের কল্যাণ কামনায়। বিরিয়ানী, ঘি ভাত, সুরুয়া, মিঠাই আর আমের ছড়াছড়ি চলেছে।

ইয়ার জঙ্গ ছুটোছুটি করছে, মণিবেগমের ব্যক্তিগত অতিথিদের অভ্যর্থনার আয়োজন করার ভার পড়েছে তার উপর।

পিক্ক সাহেবের গুদাম থেকে রাশি রাশি বোতল এসেছে, বিবিমহলের দরজা জানালায় নতুন রং চেপেছে; পূর্ণিয়া দিনাজপুর থেকে সিতাব রায়, দেবী সিং ভেট পাঠিয়েছে কয়েকটি খানদানী ঘরের রূপসী মেয়ে. বাঁদীমহলের নতুন বাসিন্দাদের জন্য আলাদা মহলও ঠিক করেছে ইয়ার জঙ্গ। ফুল ফুটেছে, গোলাপ ফুল। মহলের আঙ্গিনায়, মহলের কামরায় কামরায় জীবন্ত গোলাবের শোভা, রং বাহারের মেলা বসিয়েছে ইয়ার জঙ্গ সাহেব মাননীয় অতিথিদের জন্য। অভ্যর্থনা আমোদ বিলাসের কোন ত্রুটি হবে না।

নাটোরের দেওয়ানও এসেছেন। নন্দকুমারের শূন্য মহলে তাঁদের থাকবার ঠাঁই নির্দিষ্ট হয়েছে। চমকে ওঠেন নায়েব। এই ঘরে বসেই তাঁরা যে বেগমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। সেখানে আজ নন্দকুমার নেই, ইংরেজের হাতে নির্বাসিত, নিগৃহীত।

চাকরি করতে হয়, নইলে বৃদ্ধ দেওয়ানজী ইস্তাফা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। মণিবেগমকে তবুও খোসামোদ করতে হবে, নয়তো জমিদারী ধরে টান পড়তে পারে।

পুণ্যাহ উপলক্ষে তিনি নাটোর থেকে খেলাত এনেছেন বেগমের জন্য একটি দামী পালকি; হাতীর দাঁতের কাজ করা তার ঝরোকা; বাদলার গোটা বাঁধানো ঝালর; আশমানী রংএর মধুরপঙ্খী ধাঁচের পালকি, বিশ কাহারের কাঁধে চলবে তুলকি চালে. পাশে তাল দেবে দশ কাহার। বাছাই করা চাপকান পরা কাহার, ইয়া গালপাট্টা, তেমনি বাবরি, মাথায় লাল ফেট্টি জড়ানো। ওপারে বড়নগরের দেবোত্তর এস্টেটের লাগোয়া নিষ্কর চাকরান জমি দিয়ে ওদের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করেছেন রাণী ভবানী নিজেই।

ঢাকাই কারিগরের গড়া পাকা সেগুন কাঠের তৈরি পালকির সাজ, তেমনি দামী কাজকরা তার চারিপাশ। হুম হুম শব্দে বেহারা ছুটছে, পাশে কদম পায়ে চলেছে দশ বেহারা; আগে সোয়ার হয়ে চলেছে মণিবেগম আর নবাব নজমদ্দৌলার দেহরক্ষী বাহিনী খাপখোলা তলোয়ার হাতে, তার আগে রয়েছে ইয়ার জঙ্গ, রোদের আলোয় ঝক্‌মক করছে তলোয়ার।

মতিঝিলে পুণ্যাহের দরবার বসেছে। ক্লাইভও উপস্থিত হয়েছেন প্রথম নবাবকে স্বীকৃতি দিতে, মণিবেগম আজ নজর খিলাতের ব্যবস্থা করেছে,

কোম্পানির কর্তা থেকে শুরু করে সামান্য চোপদার মনসবদারও বাদ যাবে না।

মতিঝিলের প্রাসাদ আজ স্বপ্নপুরীর প্রাসাদের মত সেজে উঠেছে। দেশ-বিদেশের মূল্যবান স্থাপত্য চিত্রকলার সম্পদ এতে হাজির করেছে, আকাশ বাতাস ধূপধুনো আতর গোলাপজলের সৌরভে মদির; সিংহাসনে বসে রয়েছে শিশু নবাব নজমদ্দৌলা, মণিবেগমের স্বপ্ন সফল হয়েছে। বাঁদীর হাতে আজ এসেছে সুবে বাংলার মসনদ। রেজা খাঁ আজ সর্বময় কর্তা। বাঁদীর অনুচর।

জৌনপুরের সানাইওয়ালা সুরে সুরে ভরিয়ে তুলেছে মতিঝিলের আকাশ বাতাস। কামনার মাতাল সুরায় মদির আমস্বর সেই সুর কেঁপে কেঁপে দূর বনসীমায় উধাও হয়ে যায়। মতিঝিলের পদ্মবনে ভ্রমরগুঞ্জন থেমে গেছে।

ক্ষান্ত উৎসব শেষে সন্ধ্যার আঁধার নামে। অতিথি অভ্যাগতরা ফিরে গেছে যে যার আস্তানায়, শহরের দিকে। চারদিকে একটা বিশৃঙ্খলা, ম্রিয়মাণ ভাব। উৎসব শেষে ফেলে দেওয়া পানপাত্রের মতই ওই সাজ আড়ম্বর মনে হয় অর্থহীন। মণিবেগম বের হয়ে আসছে। মনে আজ তৃপ্তির আমেজ। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। নন্দকুমার বুব্বু বেগম কেউ বাধা দিতে পারেনি, বাঁদীর জারজ সন্তানই আজ মসনদে বসেছে। খুশিতে উপছে উঠছে সারা মন, দুহাতে বিলিয়েছে খিলাত, ফকির গরীবকে দিয়েছে ধন দৌলত। তারা সমস্বরে চিৎকার করে—আল্লা মেহেরবান।

ওরা দোয়া করুক। হঠাৎ আবছা অন্ধকারে কাকে সামনে এগিয়ে আসতে দেখে প্রহরীরা বাধা দেয়—আর মোলাকাৎ হবে না। ভাগো।

উৎসব শেষে আবার ফকির আসছে দান নিতে, তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে তারা। বেগম আরবী ঘোড়ার জুড়িতে উঠতে যাবে হঠাৎ চমকে উঠলো পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে।

—সেলাম বেগমসাহেবা।

—তুমি! মণিবেগমের সামনে এগিয়ে আসে দরবেশ। ছিন্ন মলিন বসন, আলখাল্লায় এদিক ওদিকে নানা রংএর টুকরো কাপড়ের তালি লাগানো, কাঁধে চিরসঙ্গী সেই বীণ। মণিবেগমের অতীতের সঙ্গী, এরা ছিল তার অতীতের পরিচয়; আজ বর্তমানের সঙ্গে কোথাও এর মিল নেই। কি ভেবে গলা থেকে দামী মুক্তোর মালাটাই খুলে ওর দিকে এগিয়ে দেয়,

—আজ এই তোমার ইনাম!

—ইয়া আল্লা! চমকে উঠে পিছনে সরে গেল দরবেশ। মণিবেগম আজ তাকে সামান্য রাহী ফকিরের পর্যায়েই দেখে। এই তার সত্য পরিচয়।

—ও নিয়ে ফকির কি করবে বেগমসাহেবা? কশুর মাপ করুন।

—তবে, কি চাও বীণকার?

মণি ওর কথায় একটু বিস্মিত হয়। মূল্যবান সম্পদ দিতে গিয়ে সে ভুলই করেছিল। ভুল বুঝেছিল মণিবেগম ওই উদাসীন ফকিরকে।

মতিঝিলের নির্জনতা আজ নবাবী জৌলুসে ছারখার হয়ে গেছে। শান্ত পূতপবিত্র রূপকে বিকৃত করে তুলেছে বিলাসের সম্ভার। গমগম করছে শূন্য প্রান্তর-উদ্যান ফৌজী ছাউনির ভিড়ে। অন্ধকারে ভেসে আসে ঘোড়ার চিৎকার, তার সঙ্গে কোন শরাবী ফৌজের মাতাল হাসির হররা। ফকির দরবেশরা কোথায় উধাও হয়ে গেছে, বিতাড়িত হয়েছে তারা নবাবী ফৌজ-দারদের তাড়া খেয়ে।

বীণকার বলে ওঠে—একটু শান্তিময় আশ্রয় করে দেন বেগমসাহেবা দরবেশ দিয়ানাদের জন্যে। তামাম মুর্শিদাবাদে আজ তাদের ঠাঁই নেই। পথে পথেই ঘুরছে তারা। একটু আশ্রয় তাদের দেন। বহুৎ মেহেরবাণী আপনার।

কথাটা শুনে মণিবেগম একটু যেন লজ্জিত হয়। ওর কথার মধ্যে একটু অভিযোগের সুরও ফুটে ওঠে এবং সম্পূর্ণ সত্য সেই অভিযোগ।

—তোমার কথা মনে থাকবে বীণকার।

—বহুত মেহেরবানী।

আবছা অন্ধকারেই আবার মিশিয়ে গেল ওয়াজিদ। একাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বেগম, ও যেন তার অতীত সত্তা। বিস্মৃতির অন্ধকার ভেদ করে বর্তমানের বুকে ক্ষণিকের জন্য সত্য নির্দেশ করে আবার অন্ধকারেই হারিয়ে যায়; ধরা তাকে যায় না।

সন্ধ্যার আকাশ ইমনের সুরে ভরে উঠেছে, বেগমসাহেবা গাড়িতে গিয়ে উঠল চিন্তিত মনে।

অতল অন্ধকারের বুকে জেগে উঠেছে অসংখ্য প্রেতাত্মা বাংলার শ্মশান-ভূমিতে; যে ঠাঁইগুলো এখনও শ্মশানে পরিণত হয়নি সেগুলোকেও নিঃশেষ

করে তাদের চারণভূমি করবার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। সিতাব রায়, দেবী সিংহ, রেজা খাঁ, ইয়ার জঙ্গ, ইতাবৎ খাঁ আজ বাংলার সেই সর্বনাশের দূত হয়ে উঠেছে। হেস্টিংসও বাধা দেয় নি, মণিবেগম জেনে-শুনেও চুপ করে আছে; তারও সুবিধা হয়েছে।

পূর্ণিয়া শ্মশান হতে চলেছে দেবী সিংহের দৌলতে। কলকাতায় কোম্পানির সদর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং একটু চমকে ওঠে, পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায় হতো ১৬০,০০০৲ টাকা। ক্রমশ দেবী সিংহের অত্যাচারে প্রজারা পালাতে শুরু করল; খাজনা আদায়ের অঙ্ক নামলো ৯০,০০০৲ টাকায়। চাষ আবাদ নেই। করবার মত লোকও থাকছে না অত্যাচারের ভয়ে। দেবী সিংহ যেটুকু পেয়েছে শোষণ করে নিঃশেষ করছে ক্ষুদে জমিদার পত্তনিদারদিকে।

রেজা খাঁয়ের জন্য কিছু নজরানা পাঠিয়েই তার রাজত্ব কায়েম রেখেছে। রাজস্ব আদায় নামল ৬০,০০০৲ টাকায়। মৃত্তিকাও শিউরে উঠেছে ওদের অত্যাচারে।

দেবী সিংহের নজর পড়লো উর্বরা রঙ্গপুর, দিনাজপুর পরগনায়। মূর্তিমান ধ্বংসদূত এই নিষ্ঠুর দেবী সিংহ। ওর নিঃশ্বাসে বিষ আছে, দুচোখে ওর ধ্বংস আর অত্যাচারের আগুন। সোনার বাংলা পুড়ে ছাই হতে শুরু হয়েছে ওর নিশ্বাসে। মুর্শিদাবাদ কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ঠিক রেখেছে সে। গোপন পথে টাকা ঠিক যোগান চলেছে রেজা খাঁ এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংএর কাছে। সেই সুযোগে দেবী সিংহের শাসন চলেছে দুর্বার গতিতে।

সারা গ্রামের লোক প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বনের মধ্যে; রাতের অন্ধকারে তারা বের হয় খাবারের সন্ধানে, কিন্তু কোথায় বা খাবার আর পানীয়। দেবী সিংহ আর মেজর গুডল্যাণ্ডের সৈন্যরা তাদের ধরবার জন্য বন ঘেরাও করেছে। দিনাজপুর আর রংপুর পরগনায় চলেছে পশুর রাজত্ব।

কাছারি বাড়িতে লোক ধরে না। জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার প্রজাদিকে ধরে এনে কাঁটা সমেত বেলের ডাল দিয়ে পিটোন হচ্ছে। বাবা মায়ের সামনে তার মেয়েকে বিবস্ত্র করে উৎপীড়ন করতেও তারা বাদ দেয় নি। হাহাকার কান্না-আর্তনাদের শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত। ধনী জমিদার ভূস্বামীরাও এই অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। দেবী সিংহের চাই টাকা, রেজা খাঁ ওদিকে ওত পেতে বসে আছে। দেশের সমস্ত ধান চাল খাদ্যশস্য

কোম্পানির গোলায় তোলবার নাম করে নিজেই মোটা মুনাফা করছে, পথে পথে ক্ষুধার্তের হাহাকার; সারা বাংলার ইতিহাসে সেই তিনজন তখন স্মরণীয় ব্যক্তি।

মণিবেগম মাঝে মাঝে দেখে চকের রাজপথে শীর্ণ কঙ্কালের শোভাযাত্রা; চমকে ওঠে! নিজের অতীতের দিনগুলো মনে পড়ে; একখানা তন্দুরের রুটির অভাবও যে কত বেদনাদায়ক তা সে মর্মে মর্মে জানে। আকাশ বাতাসে ওদের আর্তনাদ; সানাইএর সুর ছাপিয়ে কানে আসে তারই রেশ, সব বিলাস ব্যসনের চাকচিক্য আজ ম্লান হয়ে গেছে।

মণিবেগমের জীবনে অনেকখানি পরিবর্তন এসেছে; পুণ্যাহের একবছর পরেই প্রথম সন্তান নজমদ্দৌলা মারা গেছে; কিন্তু সিংহাসনের দাবী সে ছাড়ে নি; তার দ্বিতীয় নাবালক সন্তান সইফুদ্দৌলাকেই মসনদে বসিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় জোর করে নিয়তির বিরুদ্ধে সে চলবার স্বীকৃতি নিয়েছে, ফলে পদে পদে এই বিপদ ঘনিয়ে আসছে। এতবড় মন্বন্তর দুর্দিন জীবনে দেখেনি সে। বালকুণ্ডার অনাহারের জ্বালা বোধহয় ভুলে গেছে মণিবেগম।

প্রেতাত্মার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে বুভুক্ষু জনতা, পিছনে পিছনে শয়তানের দূতগুলো। গ্রামের পর গ্রামের শূন্য বাস্তু বাড়িগুলো তারা খুঁড়ে চলেছে। সোনা ধন দৌলতের আশায় পাগল হয়ে উঠেছে তারা।

বাংলার এই হাহাকার সমুদ্রপারেও গিয়ে পৌঁছল; ইংরাজজাতির ইতিহাসে এতবড় কলঙ্ক কোনদিনই মুছে যাবে না। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ। হেষ্টিংসের প্রয়োজন তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। এই বিপদের মাঝে কোম্পানির সুনাম স্বার্থ বজায় রাখতে পারে একমাত্র তাঁরই মত যোগ্য লোক।

ইংলণ্ডে ফিরে গেছে হেষ্টিংস তার কিছু আগে; আবার তাকেই ভারতে আসবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। হেষ্টিংসও মনে মনে খুশিই হয়; কোম্পানি তার যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে, নইলে আবার তাকেই পাঠানো হবে কেন? বিজয়ীর মত ফিরে এল হেষ্টিংস ভারতবর্ষকে শোষণ করতে।

বলদর্পী অহঙ্কারী হেষ্টিংসের চরিত্রে এই স্বীকৃতি আজ কাঠিন্য এবং পৌরুষই এনে দিয়েছে। কোম্পানির দুর্বলতার কথা টের পেয়ে গেছে সে; মাথা উঁচু করে আবার ভারতবর্ষে ফিরে এল ভাগ্যের ইতিহাসে নতুন করে আঁচড় কাটতে।

জাহাজে আসবার সময়ই এক জার্মান দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হয়। মিঃ ইম্‌হফ, একজন চিত্রশিল্পী; দেশে তার অন্নসংস্থান হয়নি, শুনেছে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজারা বিদেশী শিল্পীর সম্মান দেন, সেই আশাতেই সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে আসছে। জাহাজে পরিচয় হয় হেষ্টিংসের সঙ্গে।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে হেষ্টিংস মিসেস্ ইম্‌হফের দিকে, রূপ যৌবন যেন উপছে পড়ছে ওর। ওর নীল চোখের অতলে হারিয়ে ফেলে নিজেকে। মিঃ ইম্‌হফের সঙ্গে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে বন্ধুত্ব।

কথা দেয়—মাদ্রাজ থেকে আমার সঙ্গে কলকাতায় চল, আশা করি তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে।

ক্লাইভের একটা কথা মনে পড়ে হেষ্টিংসের। হেষ্টিংসের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বলতেন,

– He never heard of Hastinge having any qualities ezcept for seducing his friends' wives.

মিসেস ইম্‌হফ অবাক হয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে; স্বামীকে সাহায্য করতে পারে ও!

ওর সঙ্গে কলকাতায় নেমে অবাক হয়ে যায় ইম্‌হফ, হেষ্টিংসের ধন সম্পদ, তার প্রতিপত্তি এখানে আকাশস্পর্শী। তার অভ্যর্থনার জন্য ঘাটের দুধারে সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। কেল্লার উপর থেকে গর্জন করে ওঠে তোপগুলো, জাহাজঘাটায় লাল গালচে পাতা হয়েছে। তীরে দাঁড়িয়ে আছে পদস্থ কর্মচারীর দল।

—ডারলিং। মিসেস ইম্‌হফ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে হেষ্টিংসের দিকে। কয়েকমাসের পরিচয় আজ পরিণামে পরিণত হতে চলেছে। পাশে অনাদৃতের মত দাঁড়িয়ে আছে মিঃ ইম্‌হফ। আজ হেষ্টিংস তাকে সর্বহারা করতে বসেছে।

ব্যাণ্ডে বাজছে রুল ব্রিটানিয়া। হেষ্টিংস সদলবলে তীরে এসে পৌছল। মিসেস ইম্‌হফ অবাক হয়ে গেছে। গর্বভরে চেয়ে রয়েছে হেষ্টিংস তার দিকে।

অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়—মাই ফ্রেণ্ডস; মিঃ এণ্ড মিসেস ইম্‌হফ।

কালা কর্মচারীরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বিদেশিনীর দিকে। মিঃ ইম্‌হফ বাংলার সবুজ দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে। সকালের গিনিগলা রোদ

অপূর্ব শ্রী এনেছে, চিত্রকরের মুগ্ধদৃষ্টিতে বাংলার দিকে চেয়ে আছে বিদেশী ; কোথায় পাখি ডাকছে বনের আড়ালে।

বীর দর্পে বাংলার মাটিতে পা দিল হেষ্টিংস। যাত্রা তার শুভ হয়েছে, মিসেস ইমহফের হাতখানা তার হাতে।

তারই সাজান সংসার, কলকাতার কুঠিতে সেই কর্মচারীরাই রয়েছে ; সেই গঙ্গাগোবিন্দ সিং, নবকেষ্ট, কান্তবাবু ; ওদিকে রেজা খাঁ, সিতাব রায় সকলেই রয়েছে। এদের পরিচয় বিলক্ষণ জানে হেষ্টিংস। এদের উপর শাসন করবার মত বিশেষ কেউ না থাকার জন্য এক যোগে এরা শোষণ চালিয়েছে, বাংলার সব রস ওরা চুষে খেয়ে ফেলেছে, যেন একপাল নেকড়ের সামনে একটা হরিণের দেহাবশেষ পড়ে আছে।

হেষ্টিংস কলকাতায় ফিরেই ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। প্রথমেই বন্দী করে আনা হোল দেবী সিংকে ; দিনাজপুর-রংপুরে চাষীদের উপর অত্যাচারের তদন্তের জন্য ফলাও করে কমিশন বসান হল, কমিশনার পিটারসন হলেন সেই কমিশনের চেয়ারম্যান।

হেষ্টিংস হুকুম দিয়েছে—সমস্ত অত্যাচারের নিরপেক্ষ তদন্ত হোক ; প্রথম আবির্ভাবেই লণ্ডনের কর্মকর্তাদের কাছে খবরগুলো যাচ্ছে—দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, অত্যাচার সব থেমে গেছে ; অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থাও হবে।

মৃত বাংলার বুকে তখনও জ্বলছে বিপ্লব বিদ্রোহের বহ্নিকণা। উত্তর-বঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আগুন দেখা দিয়েছে ; প্রপীড়িত বাংলার অন্তরে উঠেছে প্রতিবাদের উষ্ণতা।

হেষ্টিংস এই সুপ্ত আগ্নেয়গিরির অন্তরে অগ্নিসঞ্চারের সন্ধান পেয়েই আপাতত চাপা দেবার চেষ্টা করছে। যে কয়েকজনের উপর জনসাধারণ আস্থা হারিয়েছে তাদের মধ্যে দেবী সিংকেও বন্দী করে কলকাতায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করেছে হেষ্টিংস।

বৈকালের পড়ন্ত রোদ গঙ্গার জলে রক্ত রং-এর প্লাবন এনেছে। দিন শেষের সুর পৌছেছে পাখির কানে, পরিক্রমা সেরে ঘরে ফিরেছে সে। বাগানে বসে কি ভাবছে রেজা খাঁ। চারিদিকের ঝড় থেমে আসছে। জেগে উঠেছে অসীম শূন্যতা।

হাজার, লক্ষ, কোটি টাকার অঙ্ক মনে মনে হিসাব করে চলেছে সে ; পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, বাহিরবন্দ, রংপুর পরগনার কাহিনী, দেবী সিং বোধ হয় কোটি কোটি টাকা লুকিয়েছে, আর তার ভাগে পড়েছে তারই সামান্য কিছু অংশ মাত্র। যে অন্যায়গুলো সে করেচে তার যোগ্য মূল্য সে পায়নি। সামান্য কিছুর বদলে দেবী সিংকে সমর্থন করেছে সে নীরবে। কিন্তু সব কিছুরই শেষ আছে। দেবী সিংএর প্রভাব নিঃশেষ হয়েছে। সে এখন বন্দী ; যে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে ছিল সারা বাংলায় তারই সুতো ধরে টান পড়েছে।

হঠাৎ বাগানের মধ্যে কয়েকজন গোরা সৈন্যকে ঢুকতে দেখে একটু বিস্মিত হয়। অসময়ে তাকে এভাবে বিরক্ত করবার কোন যুক্তি খুঁজে পায় না। মিডলটন এগিয়ে এসে কাগজখানা হাতে তুলে দেয়। চমকে ওঠে খাঁ সাহেব ; সারা শরীরের রক্তপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে আসে ; বিশ্বাসই করতে পারে না সংবাদটা। সর্বশক্তিমান রেজা খাঁকে সামান্য কয়েদীর মত বন্দী করে কলকাতায় নিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মিডলটনের মুখের দিকে চাইল খাঁ সাহেব। মিডলটন বলে ওঠে,

—আপনাকে যেতে হবে এখুনিই, এইভাবেই।

রেজা খাঁ তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। নেওয়াজের সময় হয়ে গেছে। শেষ ওয়াক্তের নেওয়াজ ; কিন্তু ওরা তা হতে দিল না ; সেই অবস্থাতেই বাগান থেকে টেনে বের করে নিয়ে চলে সাধারণ কয়েদীর মত।

চক মুর্শিদাবাদে বিদ্যুৎগতিতে সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ে, কেউ খুশিতে উপচে পড়ে, ইতাবর খাঁ, ইয়ার জং, বেগম শিউরে ওঠে ; কে জানে এর পর কি নির্দেশ আসবে। হেস্টিংসের শয়তানীকে মনে মনে ভয় করে ওদের সবাই। ফিরে এসেই হেস্টিংস এই গণ্ডগোল বাধিয়েছে।

সন্ধ্যার আঁধারেই রেজা খাঁকে বজরায় তুলে সৈন্যদল এগিয়ে চলল কলকাতার দিকে। রাতারাতি শাসন ব্যবস্থায় একটা আমূল পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়।

একটি লোক নীরবে বাংলার বুকে এই নিষ্ঠুর পাশব অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছেন ; অসহ্য বেদনায় মুচড়ে উঠেছে তাঁর অন্তর ; কিন্তু তিনি একা ; তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ওদের সম্মিলিত দানবশক্তির কাছে তুচ্ছ। মহারাজ নন্দকুমার

নীরবে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। সমবেদনা, সহানুভূতির চোখে দেখেছেন সারা বাংলার পথে পথে বুভুক্ষুর মিছিল। একপাল শকুন নেমেছে, বাংলার দেহাবশেষ ওরা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। এমন সময় কোম্পানির শাসন ব্যবস্থার এই পরিবর্তন দেখে আশার সঞ্চার হয় তাঁর মনে। হয়তো এর প্রতিকার হবে। দেবী সিং বন্দী হয়েছে, রেজা খাঁকেও হেস্টিংস নিষ্কৃতি দেয় নি; পিটারসন কমিশনের তদন্ত হচ্ছে; এর বিচার হোক। অপরাধীরা সাজা পাক, বাংলায় আবার শান্তি ফিরে আসুক। হেস্টিংস তাঁকে আবেদন জানিয়েছেন—এই তদন্তে তিনি সাহায্য করুন। বাংলার বিখ্যাত লোকদের মধ্যে তিনিও একজন, তদন্তের কাজে তাঁর সাহায্য চায় কোম্পানি। দেশবাসীর তরফ থেকে অনেক অভিযোগই তাঁর কাছে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। মায়া, সীতানাথ পণ্ডিতের কথা ভোলেননি তিনি। আজও চোখের সামনে ফুটে ওঠে কাদম্বিনীর সেই মৃতদেহ, তার বিচার আজও বাকি আছে; আরও কত অবিচার অত্যাচারের কাহিনী মনে পড়ে। তিনি ভাবছেন, আবার ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা! আবার সেই রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়তে মন চায় না। কিন্তু নীরবে এই অত্যাচার, দেশব্যাপী নিষ্ঠুর পৈশাচিকতার প্রতিবাদ না করেও থাকতে মন চায় না। ভাবছেন মহারাজ।

নবকেষ্টর মাতৃশ্রাদ্ধ। পঞ্চগ্রাম, থানা, মণ্ডল—তার চেয়ে বড় সীমানা জুড়ে পরগনা; সারা পরগনায় নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে ব্রাহ্মণ ভোজনের। ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ, বারাণসী থেকে আসছেন পণ্ডিতদের দল, শাস্ত্রবিচারের জন্য সভার আয়োজন করা হয়েছে। হাটখোলার বিশাল মাঠে সারি সারি তাঁবু উঠেছে। শত শত অতিথি অভ্যাগতের ভিড়ে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সারা গোবিন্দপুর, সুতানটী, কলকাতার সবাই নিমন্ত্রিত। গাড়ি গাড়ি তরকারি, আনাজপত্র আসছে, শ' কয়েক গোয়ালা বাঁকবন্দী ক্ষীর দই চালান আনছে, জনাই থেকে আসছে মনোহরা, ছানার সন্দেশ। সারি সারি অগ্নিকুণ্ডে ভিয়েন বসেছে। হোমের অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে চারজন হোতা বিরাট তামার কুঁড়িতে করে ঘি ঢালছে, দাউ দাউ করে জলছে আগুন, ওঙ্কারের শব্দে আকাশ বাতাস মুখর। সদরে ঘন ঘন গাড়ি আসছে। মান্য গণ্য অতিথি সজ্জন গালচেপাতা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিং নিজে তদারক করছে তাঁদের;

তকমা উর্দি পরে দ্বারোয়ান দাঁড়িয়ে, হুঁকাবরদার আলবোলার নল নিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। হেস্টিংস নিজেও এসেছে আমন্ত্রিত হয়ে।

রাস্তা মাঠ কলরব কোলাহলে ভরে উঠেছে। মারামারি হট্টগোল লেগেছে কাঙ্গালী বিদায়ের বেলায়। রাজ্যিশুদ্ধ যেন কাঙ্গালী হয়ে উঠেছে। মহারাজ নন্দকুমার আসছেন নিমন্ত্রণ রাখতে; দূর থেকেই এলাহি কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যান; লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে চলেছে নবকেষ্ট অকাতরে। মাসিক ষাট তঙ্কার কর্মচারী, কোথা থেকে এমনি রাজার সম্পদ পেল তা কল্পনাই করতে পারেন না। এই অর্থ এল কোথা থেকে—তার জবাব যেন খানিকটা অনুমান করতে পারেন, মুর্শিদাবাদের হীরাঝিল প্রাসাদ থেকে সিরাজের ব্যক্তিগত অর্থসম্পদ—দিনাজপুর, রংপুর, পূর্ণিয়ার অর্থও এর মধ্যে আছে। দরিদ্রের রক্তমাখা তিল তিল সোনা, টাকা জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে চারিধারে। সেই পাহাড়ের উপর বসে কে যেন ওদের ব্যঙ্গ করছে।

গাড়ি আটকে গেছে ওদের ভিড়ে, আড়াই সের চাল আর এক আনা পয়সার জন্য হাজার হাজার কাঙ্গালী মারামারি শুরু করেছে; নেমে আসছেন হেঁটে তিনি, হঠাৎ সামনেই কাকে দেখে চমকে ওঠেন; চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের দিনগুলো; নবকেষ্ট একে নিয়েই জুড়ি গাড়ি হাঁকাত। সে দিনের সেই সুন্দরী মেয়েটি আজ শীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে উঠেছে। পরনে তার তেলচিটে একখানা শাড়ি, গায়ে রাংরত্তি বলতে নেই। চেনা যায় না।

বলে ওঠে সে—আমি নিভাননী বাবাঠাকুর।

সব হারিয়ে আজ সে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েছে। হাতে ওর কাঙ্গালী বিদায়ের এক সরা চাল মাত্র।

চুপ করে চেয়ে থাকেন নন্দকুমার ওর দিকে। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিভা এই জীবনেই করে যাচ্ছে।

—যাবেন না নিমন্ত্রণে?

নন্দকুমারকে ফিরতে দেখে একটু অবাক হয় মেয়েটি; নন্দকুমার বলে ওঠেন—না মা, শরীরটা বিশেষ ভালো বোধ হচ্ছে না, তাই ফিরে যাচ্ছি।

ওর কীর্তিগুলো চোখের সামনে একটার পর একটা প্রকট হয়ে ওঠে। নবকেষ্টর মায়ের স্বর্গগত আত্মা শান্তি লাভ করুক; আকাশ বাতাস হাজারো কণ্ঠের চিৎকারে মুখর হয়ে উঠেছে। ভিড় ঠেলে একাই নীরবে ফিরে

এলেন মহারাজ নন্দকুমার; ওর ত্রিসীমানায় পা দিতেও স্বীকৃতি পান না মন থেকে।

মিঃ ইম্‌হফ ইজেল নিয়ে বাগানে বসেছে ঝিলের ধারে; জলে সাঁতার দিচ্ছে কয়েকটা রাজহাঁস, গাছের ফাঁক দিয়ে তির্যক রেখায় এসে পড়েছে একফালি রোদ, ইজেলে তুলি বোলাবার চেষ্টা করেও পারে না।

হেস্টিংসকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল। সেই বন্ধুত্বের দীপ্তিমাখা উষ্ণতা আর তাতে নেই। বাংলায় এসে এতবড় সর্বনাশ তার হবে কল্পনাও করেনি। হেস্টিংস এগিয়ে এসে দাঁড়াল। বলে ওঠে ইমহফ্‌কে,

—কালই যাচ্ছ তুমি?

মিঃ ইম্‌হফ একটু বিস্মিত হয়। বাংলায় কাজের সুরাহা হবে এই আশা দিয়েই এনেছিল তাকে, হঠাৎ এমনি করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবেনি। জার্মানজাতি আত্মসম্মান বোধ হারায় নি। হাজার দারিদ্র্য আসুক, তারা ফিরে যাবে এখান থেকে। জবাব দেয় ইম্‌হফ,

—হ্যাঁ, মিসেসকে তৈরি হতে বলি।

ফিরে দাঁড়াল হেস্টিংস, কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে—মিসেস ইম্‌হফের ডাই-ভোর্সের পারমিশান এসে গেছে। নাউ সি উইল বি মাই ওয়াইফ, মিসেস হেস্টিংস। তুমি একাই যাবে কাল। আণ্ডারস্টাণ্ড?

সামনে বাজ পড়লেও এত আতঙ্কিত হত না ইম্‌হফ—মিঃ হেস্টিংস!

—শুধু হাতে যাবে না তুমি, কত টাকা চাও?

—আমার স্ত্রীকে ফিরে পেতে চাই মিঃ হেস্টিংস। নইলে দরকার হয় আদালতে যাবো। টাকা আমি চাই না।

নিষ্ফল আস্ফালনে হেসে ফেলে হেস্টিংস হা হা করে।

—তাতেও ফল হবে না; অবশ্য ইচ্ছে করলে আই ক্যান স্যুট ইউ হিয়ার জাস্ট নাও। ডু ইউ নো?

স্থির দৃষ্টিতে ইম্‌হফের ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে থাকে হেস্টিংস।

—গোলমাল করো না ইম্‌হফ, যত টাকা চাও—নাও; ফিরে যাও। এণ্ড আই শ্যাল সি টু ইট।

—তুমি না ইংরেজ! গর্জন করে ওঠে অসহায় শিল্পী।

—সে ইংল্যাণ্ডে। এখানে ও কথা তুলো না।

ওর দিকে ফিরে চাইল না হেস্টিংস। মাথা উঁচু করে বের হয়ে গেল ঝিলের ওপাশে কাছারি ঘরের দিকে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইম্‌হফ। এতবড় অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার সামর্থ্যও তার নেই।

এরই জন্য বোধ হয় ওই শয়তান তাদের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বাংলার মাটিতে এনেছিল।

—ব্রুট। আপন মনেই গর্জন করে অসহায় শিল্পী।

সকালের সোনা রোদ কালো হয়ে উঠেছে তার চোখে। কোথাও কোন শ্রী সৌন্দর্যের অবশেষ নেই।

বন্দী অবস্থায় রয়েছে দেবী সিং, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর-রংপুরের দুর্ভিক্ষের স্রষ্টা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রধান নায়ক। এ যেন নতুন বন্দী শিবির। ছোট মনোরম বাংলো। চারদিকে ফুলের গাছে আগামী বসন্তের সাড়া পড়েছে, ওপাশে আস্তাবলে সুন্দর একটা ব্রুহাম গাড়ি, দুটো সাদা আরবী ঘোড়া পা ঠুকছে দুর্বার তেজে; দেবী সিং রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করতে যায়; দিনাজপুর-রংপুরের পাপ ক্ষয় করে আসে। দরজায় সিপাহী পাহারা আছে, তবে বন্দীকে পাহারা দেবার জন্য নয়; যাতায়াতের পথে সম্মানিত অতিথি দেবী সিংকে সেলাম দেবার জন্য তার প্রাসাদের শোভা বাড়িয়েছে মাত্র। অবশ্য এই সম্মানের প্রভূত মূল্য দিতে হয়েছে হেস্টিংস এবং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংকে। কয়েক লক্ষ টাকা তার চলে গেছে তবু আজও জিইয়ে রেখেছে তাকে ধূর্ত হেস্টিংস, এখনও কিছু পাবার আশা রাখে মনে মনে। আপশোশ করে দেবী সিং, এত বুদ্ধি বিবেচনা থাকার ফলেই নবাব নিজামতের রেজা খাঁ, মণিবেগম, সিতাব রায়, এমন কি হেস্টিংসকে পর্যন্ত হাত করেছিল কিন্তু সব ডুবেছে একটু হিসাবের ভুলে। সাহেবরাই বলে—সেভ এণ্ড একসেপ্ট দেবী সিং, দেয়ার ইজ নো ম্যাচ ফর গঙ্গাগোবিন্দ সিং।

এ হেন দেবী সিং এত বড় ভুল করে বসবে কল্পনাই করে নি।

কমিশনার পিটারসন রংপুর দিনাজপুরের পথে প্রান্তরে, গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে ফিরে তদন্ত শেষ করে এসে রিপোর্ট দাখিল করেছেন হেস্টিংসের কাছে।

বড় টেবিলের উপর ভিনিসের তৈরি মুক্তোর মত কাঁচের পলতোলা আলো থেকে মৃদু আভায় হালকা আশমানী রংএর দেওয়ালগুলো স্বপ্নভরে দাঁড়িয়ে আছে ; রাতের বাতাস বন মর্মরে গুঞ্জরণ তোলে।

—It is absolutely necessary for the sake of Justice, humanity and the honour of Govt. that they should be exposed to be prevented in future.

দেবী সিংএর কাহিনী প্রকাশ পাচ্ছে, শত আর্তনাদে ব্যথাতুর সেই কাহিনী। বার্ক তার প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন কয়েক বৎসর পরেই।

—Virgins, who had never seen the sun, were dragged from the innermost sanc'uaries of their houses ; and in the open Court of Justice, in the very place where security was to be sought against wrong and all violence (but where no judge or lawful magistrate had long sat, but in their place the ruffians and hangman of Hastings occupied the bench.) These virgins vainly invoking heaven and earth, in the presence of their parents, and whilst their shrieks were mingled with the indignant cries and groans of all the people, publicky were violated by the lowest and wickedest of the human race. Wives were torn from the arms of their husbands and suffered the same flagitious wrongs, which were indeed hid in the bottoms of the dungeons in which their honour and liberty were buried together.

পিটারসনের চোখের সামনে ফুটে ওঠে সেই নিষ্ঠুর পাশবিকতার ছবি ; শিউরে ওঠে আকাশ বাতাস তাদের আর্তনাদে, হেষ্টিংস পায়চারি করছে চিন্তিত মনে। মার্বেল পাথরের মেজেতে উঠছে মৃদু শব্দ ; পাইপটা মাঝে মাঝে গনগনে হয়ে জলে ওঠে। দমকা বাতাসে কাঁপছে জানালার লেসের পর্দা। কি যেন চিন্তায় পড়ে গেছে সাহেব। নিষ্ঠুর সত্য কথা, এই সব অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ পেলে অনেক কিছুই গোলমাল বাধবে। হিকি সাহেব ওত পেতে আছে, তার ছোট সংবাদপত্রও এই নিয়ে মেতে উঠবে। নন্দকুমার এর বিস্তারিত সংবাদ পেলেও বিপদ হতে পারে। প্রজারাও ক্ষেপে উঠবে হয়তো।

পিটারসন বলে ওঠে—আই হ্যাভ ট্রায়েড মাই বেস্ট টু গেট দি ফ্যাকট্স ইয়োর এক্সেলেন্সি।

মাথা নাড়লো সাহেব—ওগুলো রেখে দাও, পরে দেখবো।

—ইয়েস স্যার!

বের হয়ে গেল পিটারসন, টেবিলের উপর চাপা দেওয়া রয়েছে কাগজ-গুলো, বাতাসে উড়ছে পতপত করে। কোম্পানির শাসনের নমুনা, তুরপনেয় কলঙ্কের কালো দাগ আঁকা রয়েছে ওই কটি পৃষ্ঠায়। কি ভেবে ওগুলো হাতে নিয়ে ছিঁড়তে গেল সাহেব। দূর হয়ে যাক এ জঞ্জাল, পরক্ষণেই থামল; নামিয়ে রেখে কি যেন ভাবছে মনে মনে।

রাতের অন্ধকারে রসার নির্জন মাঠ থেকে ভেসে আসছে ক্ষুধিত শিয়ালের ডাক, একসঙ্গে রাতের অন্ধকারে ডাকছে তারা।

—ডারলিং!

মিসেস ইম্‌হফের ডাকে ফিরে চাইল হেস্টিংস; আবছা আলোয় ওর দিকে চেয়ে থাকে। আজ যেন বার বার মণিবেগমকে মনে পড়ে হেস্টিংসের।

এতদিন কি এক নেশার ঘোরে ওই বিদেশিনীকে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলার মাটিতে ও বেমানান। রংটা বড় ফ্যাকাশে, ওদের যৌবন মরসুমী ফুল। মণিবেগম তার তুলনায় ঢের বেশি নেশা লাগানো সুন্দরী।

—রাত হয়েছে অনেক।

ইম্‌হফ আজ সাধারণের পর্বায়ে নেমে এসেছে। সেই আকর্ষণ আজ ম্লান। ক্লান্ত হয়ে উঠেছে হেস্টিংস মনে মনে। দুর্বার বেপরোয়া মন বাঁধন মানে না।

—একটু কাজ আছে, তুমি যাও।

আলতোভাবে ওর গালে একবার গাল ঠেকিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে বের হয়ে গেল ইম্‌হফ।

নেশা লাগানো মাদকতা সেই হিম স্পর্শে কোথাও নেই। রাতের অন্ধকারে আজ স্বপ্ন দেখে হেস্টিংস, মণিবেগমকে আজও ভোলেনি। ওদের ভোলা যায় না। মনে ঝড় ওঠে আজও সেই প্রদীপ্ত কামনার।

রাত ঘনিয়ে আসে। ঝড়ো বাতাসে কাগজগুলো উড়ছে এলোমেলো ভাবে।

দেবী সিং আগেই রিপোর্টের সব সংবাদ পেয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে

কাছারিতে। সারি সারি ঘর পার হয়ে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংএর খাস-কামরা। কাছারির কাজ দিনের আলোতেই চুকে যায়, তারপরও থাকে দেওয়ান, এবং রাতের অন্ধকারে বিশেষ হিসেব কিতাব দেখাশোনা করতে হয়। এ খাতাপত্র সব আলাদা, এতেই বেশি মনোযোগ এবং সতর্কতা দরকার।

—এর কি করতে পারি বলুন? ব্যাপার অনেক দূর এগিয়েছে।

দেওয়ান সোজা কথায় এড়িয়ে যেতে চায়, ধূর্ত দেবী সিংএর নজর এড়ায় না সেটা। তার অপরাধের নায্য বিচার হলে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। হাজারো হত্যার শাস্তি একটি প্রাণের বিনিময়েও হওয়া সম্ভব নয়। বাঁচতে চায় দেবী সিং।

—সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিতে পারি দেওয়ানজী।

—সাত লক্ষ! বিস্ময় চেপে দেওয়ান ওর দিকে চেয়ে থাকে। আরও কত লক্ষ ওর সঞ্চয় আছে কে জানে?

ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে দেবী সিং—এই আমার শেষ সম্বল। বাঁচান আমাকে!

—দেখি সাহেবকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে, ওতে কি রাজি হবে! আরও কিছু বাড়াও সিংজী। ব্যাপারটা ভারি গুরুতর জান তো?

দেওয়ানজী প্রশস্ত সিঁড়ি বয়ে দোতলায় উঠতে থাকে, হেস্টিংসকে চেনে সে, টাকার গন্ধ পেলে 'না'কে 'হাঁ' করতে তার বেশি সময় লাগে না। কাগজগুলোর গতি কি হবে তাও অনুমান করে সে।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংএর অনুরোধ হেস্টিংস অগ্রা করতে পারবে না, নানা দিক দিয়ে সাহেব জড়িয়ে আছে; তার সমস্ত সংবাদ গঙ্গাগোবিন্দের নখদর্পণে। তাছাড়া দেবী সিং তার জন্য দামও দিচ্ছে কয়েক লক্ষ টাকা।

হেস্টিংস ভোর বেলাতেই উঠে বাগানের ঝিলের ধারে পায়চারি করে নেয়; ভোরের বাতাসে কুয়াশার আবছা আবরণ তার দেশের কথাগুলো মনে আনে, গাছের মাথায় মাথায় আবছা অন্ধকার—পাখিগুলো ডাকছে; বড় মিষ্টি সে সুর। একটুক্ষণের জন্যও কোন সুদূরে উধাও হয় মন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মুর্শিদাবাদের দিনগুলো! ব্যাকুল হয়ে ওঠে সারা মন।

মনে পড়ে একজনের কথা! গাছের ফাঁক দিয়ে প্রথম সূর্যের রক্তলাল আলো ছিটকে পড়েছে, হেস্টিংস পায়চারি সেরে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসে।

আজ সেই দৈনন্দিন কাজের রীতি বদলে গেছে। ভোর থেকেই উঠে খাস কামরায় গিয়ে সেই রিপোর্টগুলো হাতে নিয়ে কি ভাবছে; এর একটা বিধিব্যবস্থা করা দরকার; রাতে ঘটনাগুলো অতর্কিতে ঘটে তার কর্মপন্থা বদলে দিয়েছে সম্পূর্ণ অন্যদিকে, কুল্যে সত্তর লক্ষ টাকা দিয়েছে দেবী সিং, হেস্টিংস তার জীবন পথ বদলাতে বাধ্য হয়েছে; টাকা সোনা হীরা জহরত নেশার মাতন এনেছে। আগেকার সেই দিনগুলো ফিরে আসছে। বাংলা, ভারতের আকাশ বাতাসে উড়ছে টাকা; যে পারে ধরে নিচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের নামপরিচয়হীন গরীব একটি চাষীর ছেলেও বাদ যাবে কেন? সিঁড়িতে জুতোর শব্দ উঠছে, মুহূর্ত মধ্যেই হেস্টিংসের মুখভাব বদলে যায়, চোখে-মুখে ফুটে ওঠে কাঠিন্য, সোজা হয়ে চেয়ারটায় বসল সাহেব—যেন নিবিষ্ট মনে কাজে ব্যস্ত রয়েছে রাত্রি থেকেই; কত বড় দায়িত্ব তার ঘাড়ে সেইটাই বোঝাতে চায়। পিটারসন ঘরে ঢুকে স্যালুট করছে।

—সিট ডাউন। সাহেব কাগজ থেকে মুখ না তুলেই হুকুম করে। কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য ডেকেছে তাকে।

কয়েকটি মুহূর্ত! নিস্তব্ধ শান্ত সকাল। পাখি ডাকা দিনের প্রারম্ভ, কুয়াশা ভেজা ঘাসের বুকে জলজ্বল করছে মুক্তোর আভা লাগান রাতের শিশির-কণা; সব সুন্দর যেন আজ বিকৃত হয়ে উঠেছে পিটারসনের সামনে। বিশ্বাসই করতে পারে না ওর কথাগুলো, শূন্য দৃষ্টিতে হেস্টিংসের দিকে চেয়ে রয়েছে। হেস্টিংস কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে,

—আপনার রিপোর্ট আইনত মিথ্যে বলে প্রমাণিত হবে।

—কেন? চমকে ওঠে মিঃ পিটারসন।

হেস্টিংস তার সামনে কাগজগুলো মেলে ধরে পেনসিল ঠুকতে থাকে।

—এতে কোন্ লোকের জবানবন্দী—তার শপথ, স্বাক্ষর, নাম ঠিকানা কিছুই নেই। অল বোগাস!

—গোপন তদন্তে এসবের কোন দরকার হয় না ইয়োর এক্সেলেন্সি। পিটারসনের কথায় চমকে ওঠে হেস্টিংস; আইন-জ্ঞান পিটারসনের তার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

পরমুহূর্তেই কঠিন হয়ে ওঠে হেস্টিংস—নেটিভের আইনে দরকার। নইলে কোম্পানির বিরুদ্ধে যাবে এই রিপোর্ট, এতে কোম্পানির সুনাম বিপন্ন হতে পারে।

পিটারসন জবাব দেয়,

—এক্সকিউস্ মি; সেটা হতে আর কিছু মাত্র বাকি আছে বলে আমার মনে হয় না।

চঞ্চল হয়ে ওঠে হেস্টিংস, তার অধস্তন কর্মচারীর মুখে এই জবাব শুনে। কোথায় যেন তার হীন মনোভাব প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। মুখোস খুলে যাচ্ছে হেস্টিংসের, অকারণেই অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে ওঠে সাহেব।

—ডু এজ আই অর্ডার। এই রিপোর্টে সাক্ষীর নাম, জবানবন্দী, ঠিকানা, দস্তখত চাই। প্রত্যেকটি সাক্ষীর।

পিটারসন বলে—তাদের প্রাণের ভয় আছে ইয়োর এক্সেলেন্সি; তারা তাতে রাজি হবে না। আপনি জোর করেও আদায় করতে পারেন না।

—দেন দে হ্যাভ গট নাথিং টু রিপোর্ট, তারা এটাকে সহজ ভাবেই স্বীকার করে নিয়েছে। কিংবা ইয়োর রিপোর্ট ইজ ম্যালিসাস্, হিংসাত্মক; কোম্পানির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং তোমাকে এ্যারেস্ট করা হবে এই মিথ্যা রিপোর্ট পেশ করার জন্য।

হেস্টিংস জোর গলায় বলে কথাগুলো।

পিটারসনের পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে; শীতের সকালে হাত পা ঘামতে থাকে। চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে আগামী ভবিষ্যতের ছবি। হেস্টিংসের দিকে চেয়ে থাকে সে, কোথায় রাতের অন্ধকারে গোপন কলকাঠি নড়ে উঠেছে; সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে।

—তোমাকে তিন মাসের সময় দেওয়া হ'ল; গো ব্যাক টু দিনাজপুর; টুমরো। ইউ ট্রাই টু রেকটিফাই, নইলে তোমাকে বন্দী করা হবে মিথ্যা রিপোর্ট পেশ করার জন্য।

তদন্তের ফলাফল কি হবে তা আর জানতে বাকি থাকে না। পিটারসন নীরবে বের হয়ে এলো বাংলো থেকে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের তদন্ত এবং অপরাধীদের বিচার প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে। সামান্য দু'একজন শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন ইংরেজ আর দু' একজন ভারতীয় এর প্রতিকার করতে পারে না, তাদের প্রতিপক্ষ সর্বশক্তিমান। কণ্ঠরোধ করে দেবার মত যথেষ্ট শক্তি তাদের আছে।

ওর পালকির সঙ্গে দুজন ঘোড়সওয়ার সৈন্য দেখে একটু বিস্মিত হয় মিঃ পিটারসন। কর্পোরাল মাথা নুইয়ে সংবাদটা দেয়।

--আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনাকে নিরাপদে বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য।

অর্থাৎ তার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে আজ থেকেই যাতে রিপোর্টের কোন অংশবিশেষ অন্য কোন লোকের কাছে না পৌঁছায়।

নির্জন ছায়াঢাকা পথ দিয়ে ফিরছে মিঃ পিটারসন। আদিম অরণ্যের ভাব এখনও এখান থেকে মুছে যায় নি। পথের দুধারে বিশাল বনস্পতির প্রায়ান্ধকার ছায়ায় দিনের আলোর প্রবেশ পথ এখানে রুদ্ধ। আকাশে আলোর প্লাবন ডেকেছে, মাটি তার উষ্ণ আলিঙ্গনের স্বাদ পায়নি। হঠাৎ রাস্তায় একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়; কয়েকজন দেশী সিপাই সালুর ফেট্টি জড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে দুলকি চালে চলেছে, পিছনে আসছে দেবী সিংএর ব্রুহাম! পথ কাঁপিয়ে দেবী সিং কালীঘাটে পূজো দিতে চলেছে; রাস্তার একপাশে পিটারসনের পালকি নিয়ে বেহারারা দাঁড়িয়েছে, ওদের সামনে দিয়ে উদ্ধত দৃপ্ত ভঙ্গীতে মুক্ত আসামী চলে গেল। বন্দী বিচারক একপাশে দাঁড়িয়ে সেই শোভাযাত্রা দেখলো মাত্র।

মুর্শিদাবাদ থেকে সংবাদ এসেছে মণিবেগমের দ্বিতীয় সন্তান নবাব সইফুদ্দৌলা মারা গেছে। হেস্টিংস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। তার একদিক-কার পথ পরিষ্কার হয়েছে। আভ্যন্তরীণ একটা গণ্ডগোলের সূত্রপাত না হলে লোকের সামনে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরই বড় হয়ে থাকবে, সকলে আন্দোলন করবে তার বিচারের জন্য। মহারাজ নন্দকুমারের মত লোককেও এই আন্দোলনে জড়িয়ে তুলে অন্যমনস্ক করে তুলতে পারলে হেস্টিংসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

হেস্টিংসের সেই সুযোগ মিলে গেছে আজ। নন্দকুমারকে আজ বিভ্রান্ত করতে হবে, অন্যদিকে মণিবেগম আজ ক্ষমতার আসন থেকে নির্বাসিত হতে চলেছে; হেস্টিংসের কাছে সেও আসবে। ইংল্যাণ্ড থেকে এসে অবধি এবার তার অদৃষ্ট যেন সুপ্রসন্ন বলেই বোধ হয়। বাংলার গোলমাল থামাতে পারলে দৃষ্টি দেবে সুদূর কাশীর বলবন্ত সিংহ আর অযোধ্যার দিকে। রোহিলাদিকে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন। অরক্ষিত অযোধ্যার বিপুল সম্পদ তার দৃষ্টি এড়ায় নি। এবার শূন্য হাতে ইংল্যাণ্ডে ফিরবে না হেস্টিংস, সেখানকার লর্ডদের চেয়েও ধনী হতে হবে তাকে।

নন্দকুমার সংবাদটা শুনে একটু আনন্দিতই হ'ন। মীরজাফরের শেষ জীবনের দিনগুলো চোখের উপর ভেসে ওঠে। অত্যন্ত বেদনা নিরাশা নিয়ে গেছেন তিনি ; মৃত্যুকালে নাবালক মবারকের সমস্ত ভার তুলে দিয়ে ছিলেন মহারাজের হাতে, কিন্তু কালের চক্রে সে দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি তিনি। মবারক মসনদ পায়নি, আজ সেইদিন এসেছে, তিনি কি সেই পরলোকগত আত্মার শেষ মিনতি পালন করবেন না! হেষ্টিংস আজ কথাটা প্রকাশ করে তাঁর সামনে।

—বাংলার মসনদে মবারককে বসাবার ব্যবস্থা করেছি মহারাজ, কিন্তু সে তো নাবালক ; আপনি এ বিষয়ে সাহায্য করুন। রেজা খাঁকেও বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন পদ দিতে রাজি নই নানা কারণে।

মহারাজ কি যেন ভাবছেন। হেষ্টিংস স্থির সন্ধানী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে তাঁর মুখের সামান্যতম পরিবর্তনটুকুও লক্ষ্য করে চলেছে। বলে ওঠে হেষ্টিংস,

—আপনার ছেলে গুরুদাসও যোগ্য হয়ে উঠেছে। তাকেও চিফ স্টুয়ার্ডের পদ দিন ; আপনার মত বিশ্বাসী লোক রাজকার্যে আসুন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যেন বাংলায় আর না আসে ; তার জন্যই আপনাকে অনুরোধ করছি মহারাজ।

কৌশলী ইংরেজের সত্যই আন্তরিকতা না ভান মাত্র, ঠিক বুঝতে পারেন না মহারাজ। তবে আগেকার সেই দেবী সিং, রেজা খাঁ প্রমুখ কর্মচারীদের দিয়ে আজ নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না কোম্পানি সেটুকু বুঝতেপেরেছেন তিনি। স্বার্থান্ধ ইংরেজ বাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে উন্মুখ। নইলে ওদের ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যাবে। রাজ্যপাটও গুটিয়ে আনবে।

মণিবেগমও আজ বিপদের সামনে সর্বশক্তি বুদ্ধি একত্রিত করে রুখে দাঁড়িয়েছে। বাঘিনী বিপদে পড়লে এমনি হিংসাবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়ায়। একে একে দুই সন্তানই মারা গেছে। আর কোন সন্তান নেই যাকে মসনদে বসিয়ে নিজেই পর্দানসীন বেগমের বৃত্তি এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারবে। এতদিনের সম্পদের সম্মানের নেশা তাকে মাতাল করে তুলেছে, সেখান থেকে নির্বাসিত হবার স্বপ্নও কল্পনা করতে পারে

না সে। বুব্বু বেগমের সন্তান মবারক আজ ভাবী নবাব। স্বভাবতই তার অভিভাবক হবে ওর মা এবং জিয়াৎরামউদ্দৌলা। আর মণিবেগম তাই দেখবে চুপ করে।

জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ থেকে সে চেয়ে রয়েছে গঙ্গার দিকে; ওপারে হীরাঝিলের প্রাসাদ নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। সিরাজের ইতিহাস আজ স্তব্ধ, মণিবেগমকে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ থেকে নির্বাসিত হতে হবে কয়েকদিন পরই। দেবী সিং, সিতাব রায়, রেজা খাঁ সকলেরই দিন ফুরিয়েছে। তারও পালা দেরী নেই। চিন্তিত হয়ে উঠেছে মণিবেগম।

গঙ্গার ঘাটে কয়েকটা বজরা থেকে মাল খালাস হচ্ছে; ওপারে সাজানো একটা মকরমুখীতে উড়ছে ইউনিয়ান জ্যাক। কোম্পানির সাহেবরা এসেছে নতুন নবাবকে অভিনন্দন জানাতে; মণিবেগমের সম্বলমাত্র টিকে থাকবে সামান্য কিছু করবার, তাও হয়তো নোতুন নবাবের দৌলতে চলে যাবে। ফিরে আবার সেই আগেকার অবস্থা! দিন গেছে, বয়সও ফুরিয়ে এসেছে; বীণকার ওয়াজিদ আজ দরবেশ; নাচের মুজরো বসাবে আর কাকে নিয়ে! জীবন যে এমনি করে তার সঙ্গে নিষ্ঠুর রসিকতা করবে কল্পনাই করে নি বেগম! এর চেয়ে বেগম না হলেই ছিল ভালো।

কিন্তু! থেমে গেল বেগম। সমস্ত চিন্তায় ছেদ পড়েছে। কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে দৃঢ় পদক্ষেপে। বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কাঁপছে সেজের দেওয়ালগিরি, বাতাসে বাগানের গোলাব গন্ধ ভরপুর হয়ে উঠেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় এক আকাশ তারার রোশনী। নিস্তব্ধ আঁধারে সানাইএর কেদারা সুর ভেসে আসে। একটি মুহূর্ত!

সামনে এগিয়ে আসছে ওয়ারেন হেষ্টিংস। বহু স্মৃতি কামনায় ঘেরা স্বপ্নময় একটি চেতনা। তাকে ঘিরে আজও মনে রং বাহার। কামনাতুর বিদেশী।

ইম্‌হফ তার মনে অতৃপ্ত কামনার জ্বালা ধরিয়েছে; আজ মণিবেগমকে তাই যেন নিবিড়তর করে ভালবাসতে চায় হেষ্টিংস। এই বুভুক্ষা আগে কোন দিনই জাগেনি তার মনে।

—ডারলিং!

চোখ তুলে চাইল বেগম; কাঁপছে সারা শরীর। হেষ্টিংসের চোখের গভীর অতলস্পর্শী চাহনি, ওর বলিষ্ঠ দেহের একটু স্পর্শে বেগমের সারা শরীর

যেন সেতারের মত ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। হারানো অতীতের সেই মদমত্ত স্বপ্নবিভোর দিনগুলোর স্বাদ পায় সে। আশাভরে চেয়ে থাকে হেস্টিংসের দিকে। আরও কামনাতুর হয়ে উঠেছে সে। ক্রমশ সহজ হয়ে আসে কয়েক বৎসরের অদেখার সঙ্কোচ। নিজেই মণিবেগম এগিয়ে দিল সাহেবকে আশমানী রং ভিনিসের কাট গ্লাসের তৈরি পানপাত্রে তাজা টলটলে পানীয়। একটু বিস্মিত হয় হেস্টিংস।

—এ কোথায় পেলে?

—আমার মেহমানের জন্য রাখা ছিল সাহেব।

পাশে বসে ওর একরাশ সোনালী চুলে বিলি কাটছে মণিবেগম, হাল্কা বিদ্যুৎমাখা স্পর্শ! হেস্টিংস যেন নীল আশমানে ভেসে চলেছে।

কাঁপছে অগ্নিশিখা, বাতাসে ডানা ঝাপটে ঘুরছে ওর চারপাশে পতঙ্গ কি এক মৃত্যুর দুর্বার নেশায়। হেস্টিংস চেয়ে দেখছে বেগমকে—না, এতটুকুও কোথাও বদলায় নি। বরং আরও সৌন্দর্য ঘিরে ধরেছে বেগমকে। দূর ভারতবর্ষের সংস্র রুক্ষতার মাঝে পরম আহ্বানভরা সবুজ একটু কামনা। মণির হাতখানা ওর হাতের মুঠোয়, রাতের বাতাস হু হু শব্দে মাতন এনেছে গাছ-গাছালির মাথায়, চঞ্চল বিব্রত হয়ে উঠেছে রাতজাগা ঘুমভাঙ্গা পাখির দল। কি এক পরম আশা ফিরে পেয়েছে মণিবেগম। হয়তো এই রকম বিপদ থেকে উদ্ধার সে পাবে। আজ হেস্টিংসকে বিশ্বাস করতে পারে সে।

জীবনের পঙ্কিল পথে তারা নেমেছে দুজনেই; উভয়েরই তাই উভয়কে প্রয়োজন। কোন গোপন আর কিছুই নেই।

রাত্রি শেষে হেস্টিংস ফিরে গেছে, শূন্য ঘরে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে মণি; এদিক ওদিকে ছড়ানো রয়েছে গেলাস বোতল কয়েকটা। কতকগুলো ফল গড়িয়ে পড়েছে বোখারার কার্পেটের উপর; বেগমের নাগরা জোড়াটা দুদিকে পড়ে রয়েছে, হঠাৎ ইতাবর খাঁকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে; গোপন ব্যবসার সঙ্গী ওই ইয়ার জঙ্গ, ইতাবর খাঁ।

—পিপেগুলো গুদোমে তুলেছি।

—আচ্ছা!

ইয়ার জঙ্গ বেগমের দিকে চেয়ে থাকে; ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া বিলাতী মদের একচেটিয়া কারবার গড়ে তুলেছে বেগম। ইতাবর তারই প্রধান কর্মচারী; মদের গন্ধে মাল চিনতে জানে। ঘরে ঢুকেই চারদিক চেয়ে এবং বেগমের মুখ

চোখের অবস্থা দেখেই অনুমান করেছে কোথায় যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। এমন দৃশ্য তার অদেখা নয়। দেবী সিং, সিতাব রায় আসতো ; আজ আবার নতুন কোন্ অতিথি এসেছিল অনুমান করতে পারে না ইতাবর খাঁ।

মণিবেগম জড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে—চলা যাও আভি কাফের।

ইতাবর ধর্মান্তরিত মুসলমান। এ যেন তার অপরাধ !

ইতাবর মাথা নীচু করে বের হয়ে আসে, মনে একটা প্রশ্ন তা' মোছে না। বেগম মহলের বিচিত্র জীবনযাত্রা সে দেখেছে। ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচিত হবার এ কোন্ পূর্বাভাষ !

গঙ্গার বুক দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, আকাশে আকাশে নিঃশেষ হয়েছে কত চৈত্রী ঝড়ের গর্জনধ্বনি। মায়া আজও পথ খুঁজে পায়নি। দেবী সিং তখন মুর্শিদাবাদে, নিষ্ঠুর অত্যাচারী দানব নৃশংসতায় ইয়ার জঙ্গকেও ছাড়িয়ে গেছে। বিবিমহলে উঠেছে নতুন প্রাসাদ, দেশদেশান্তর থেকে কত কুলবধূ, কত কুমারীকে তুলে এনেছে মহলে ইংরেজ, বিদেশী বণিকদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করতে। মেয়েদের নামও পালটে ফেলে বিবির মনের মত নাম রাখা হয়েছে। মণিবেগম আমদানি শুরু করেছে বিদেশী মদ ; দেবী সিং খুলেছে বিবিমহল। দিলখোস, প্যারাদিল, আঁখোকি তারা, নীলুফর—কত কি শেখর নামও বহাল হয়েছে ; ইয়ার জঙ্গও যাতায়াত শুরু করেছে সেখানে।

ওর অন্তরের চাপাপড়া দানব আবার জেগে উঠেছে। মদ খেয়ে নেশায় ওর বীভৎস মুখখানা আরও ভীষণ হয়ে ওঠে। শিউরে ওঠে মায়া ; সাপকে কখনও বিশ্বাস করেনি ; ইয়ার জঙ্গকে বিশ্বাস করতে পারে না সে। কোন দিনই ভুলতে পারে না তার শান্তিনীড় সে চুরমার করে তার জীবন বিষময় করে তুলেছে।

—মেরাজান ! মদের ঘোরে সেদিন মায়াকেই জড়িয়ে ধরতে যায়, কোন রকমে ওর হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই ক্ষেপে ওঠে শয়তান। আজ তার ভব্যতার মুখোস খসে পড়েছে। উন্মাদ হয়ে এগিয়ে আসছে, মায়ার সামনে আজ পৃথিবীর নগ্ন আদিম রূপ ধরা পড়ে যায়, কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঁপছে সে। পরমুহূর্তেই স্থির করে ফেলে তার কর্তব্য। হাতের কাছে একটা ফুলদানী পড়েছিল, সেইটা তুলে নিয়েই মত্তপ ইয়ার জঙ্গের কপালে

প্রচণ্ড আঘাত করতেই আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে সে, ফিন্‌কি দিয়ে বের হচ্ছে তাজা রক্ত। ইয়ার জঙ্গ উঠে দাঁড়াবার আগেই তীরবেগে নেমে গেল।

কোথায় যাবে জানে না, তবে ইয়ার জঙ্গের এখানে আর নয় তা জানে। আবছা অন্ধকারে চলেছে মায়া।

মবারকের আমল। জিয়াৎরামউদ্দৌলা বং বুব্বু বেগমের কথা ঠেলতে পারেননি মহারাজ, মৃত মীরজাফরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

হয়তো তার জন্যই মহারাজ নন্দকুমার মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছেন মবারকের পাশে! নিজামতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন; গুরুদাসও নবাব এস্টেটের পরিচালনার কাজ খুব মনোযোগ দিয়েই করছে।

একটা সংবাদ পেয়ে বিস্মিত হন মহারাজ; গোপনে নৌকাভর্তি বিদেশী মদ চালান হচ্ছে, রাতের অন্ধকারে গোপনে গুদামেও উঠছে, কিন্তু রাজস্ব বা ট্যাক্স বাবদ কোন জমাই নেই রাজকে যে। হাজার হাজার টাকা বরবাদ হচ্ছে।

একটু চেষ্টা করতেই মহারাজ অনেক তত্ত্ব বের করে ফেলেন, কিন্তু আসলটুকু ঠিক প্রকাশ পায় না। ইতাবর খাঁ সামান্য একজন গজিয়ে-ওঠা খাঁ সাহেব, সে এত টাকা, এত প্রতিপত্তি পেল কোত্থেকে? ব্যাপারটা আগা-গোড়াই রহস্য বলে মনে হয়। ধূর্ত লোকটি গোপনে জাল ফেলেছে, দূর পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত তার মাল চলাচল করে। সারা বাংলায় অন্তরে মদের নেশা ধরিয়েছে। যোগাযোগের ঘাঁটিও ঠিক আছে। এহেন লোকটিকে অনেক কষ্টে এনে হাজির করা হয়েছে মহারাজের খাস কামরায়।

দুপুরের রোদ গাছগাছালির বুকে আলোছায়ার ছোঁয়া এনেছে। হাজার দুয়ারীর কানিশে স্তব্ধ হয়ে গেছে কবুতরগুলো, ঝিমিয়ে পড়া শহর, দূরে গঙ্গার বুকে মালগুজারী নৌকা অলসগতিতে ভেসে চলেছে উজানের দিকে।

মহারাজ ওর দিকে চেয়েই চমকে ওঠেন। অতীতের আবছা অন্ধকার স্মৃতির ক্ষীণ আলোকশিখায় প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে সামনে দাড়ি পাগড়ি পায়জামা পরা ওই বিশ্রী মূর্তিটার পিছনের ইতিহাস।

—তুমি! সীতানাথ পণ্ডিত না?

—সীতানাথ মরে গেছে জনাব; আমি খোন্দকার ইতাবর খাঁ।

মহারাজের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে. একটি মানুষের মাঝে জীবনের ভালো আর মন্দের বিচিত্র প্রকাশ আজ তাঁর সামনে, সৃষ্টির জগৎজোড়া ছলনা-জালের রহস্য তাঁর কাছে ক্ষণিকের জন্য প্রতিভাত হয়।

—তুমি সন্ন্যাসী হয়েছিলে না?

—ও সব ফাঁকিবাজি জনাব। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতাও আমাকে শান্তির সন্ধান দিতে পারে নি। সব বিলকুল ঝুট!

—এখন তাহলে শান্তি পেয়েছো? এই জঘন্য ব্যবসায়ে নেমে?

ইতাবর দাড়ি চুমরিয়ে জবাব দেয়---তার জন্য কি আপনার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

—ঈশ্বরের কাছে তার জবাব দিও. আপাতত আমি ডেকেছি তোমার ব্যবসার খাতাপত্র নিজামতে পেশ করবার জন্য। সাত দিনের সময় দিলাম তোমায়। বুঝলে?

—জী হ্যাঁ! বের হয়ে গেল ইতাবর।

তাঁর সারা শরীর একটা ঘৃণায় রি রি করে ওঠে। ওই মানুষের প্রকৃত-স্বরূপ বোধ হয় পাশব প্রবৃত্তিই। সামাজিক ধর্মের বাঁধনে বদ্ধ থাকে শয়তান, আবার ছাড়া পেলেই সে আদিম বীভৎস হয়ে ওঠে। ইতাবর তারই জলন্ত দৃষ্টান্ত।

ভিতরে যাবার দরজার কাছেই মায়াকে আসতে দেখে একটু বিস্মিত হন মহারাজ। তাঁর স্ত্রীই ওকে এনেছিলেন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে। সঠিক পরিচয় তার জানেন না মহারাজ; সেও বিশেষ কিছুই বলেনি, শুধু জেনেছিলেন দস্যুর হাতে নিগৃহীত হয়ে আজ সমাজপরিত্যক্তা সে। কোথাও ঠাঁই নেই। মহারাজের বাড়িতেই আশ্রয় পেয়েছে সে। শান্তমধুর ব্যবহারে সকলেরই মন জয় করেছে মায়া।

—কি মা? মহারাজ স্নেহভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

—নিজামতে যাবার সময় হয়ে গেছে।

মহারাজ এতক্ষণ পণ্ডিতের এই অবিশ্বাস্য পরিণতির কথাই ভাবছিলেন। ওর ডাকে চমক ভাঙ্গে। উঠে পড়লেন সেরেস্তা থেকে।

—চলো যাচ্ছি! মহারাজ ভিতরের দিকে আসছেন, হঠাৎ ইতাবরকে ফিরে আসতে দেখে দাঁড়ালেন একটি মুহূর্ত! ইতাবরের মুখেচোখে একটা বিস্ময়! একদৃষ্টে মায়ার দিকে চেয়ে রয়েছে। মায়ার মুখ লাল হয়ে ওঠে, পা

ছুটো কে যেন আটকে দিয়েছে মাটিতে ; মুখ নীচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারে না, ঘৃণায় লজ্জায় কাঁপছে সে। ইতাবর তখনও যায়নি, বারান্দা থেকে কি বলবার জন্য ফিরে এসেছে।

মহারাজ ইতাবরকে বলে ওঠেন—নিজামতে দেখা করবেন খাঁ সাহেব। আপনি এখন আসুন।

বের হয়ে গেল ইতাবর মাথা নীচু করে।

মায়া তখনও সেই জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন মহারাজ—ওকে চেন তুমি ?

সমস্ত শরীরের রক্ত মায়ার মুখে এসে জমা হয়েছে। সব সত্য আজ কণ্ঠ রুদ্ধ করে তোলে তার, বহু কষ্টে জবাব দেয় মায়া,

—না।

মায়া ওকে আর চিনতে চায় না। ওই বিধর্মী পশুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক তার নেই। প্রাণপণে নিজেকে সামলে নেয় দৃঢ়তার কঠিন আবরণের অন্তরালে।

মহারাজ নীরবে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন ওর । মায়ার সমস্ত শরীর তখনও কাঁপছে।

বুব্বু বেগম আর জিয়াৎরামউদ্দৌলা আবেদন জানিয়েছে হেষ্টিংসের দরবারে। তারাই মবারকের আইনসম্মত অভিভাবক। এ অধিকার তাদের দেওয়া হোক।

তারই মঞ্জুর তদন্ত করতে চকের বাইরে ইমামবাড়ার প্রাসাদে এসে আতিথ্য গ্রহণ করেছে হেষ্টিংস এবং মিঃ মিডলটন। নিজামত থেকে সমস্ত খরচা যোগান হচ্ছে। চাকর নফর চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে। ভোরবেলাতেই দেহরক্ষীবাহিনীর কুচকাওয়াজ শুরু হয়—তাদের উদ্ধত বিউগলে বাজে 'রুল ব্রিটানিয়া' সুর, মুর্শিদাবাদের আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। তার নীচে নবাবের সানাইএর সুর চাপা পড়ে গেছে। সাদা ঘোড়ায় চেপে হেষ্টিংস আর মিডলটন বৈকালে বের হয় ভ্রমণে। চক মুর্শিদাবাদ-ইচ্ছাগঞ্জ-লালবাগের সমস্ত লোক রাস্তার দুধারে এসে জমায়েত হয়—রাজ-দর্শনের আশায়। অবাক হয়ে জনতা চেয়ে থাকে ওদের দিকে, মাথা নুইয়ে তসলিম জানায়।

এ ছাড়াও রাতের অন্ধকারে একাই বের হন হেস্টিংস—সে সংবাদ দু'চার জন মাত্র জানে।

অতিথি সংকারের আয়োজন করেছে মণিবেগম নিজে। হেস্টিংস এবং মিডলটনের জন্য দৈনিক দুশো টাকা হারে চারশো টাকা খরচা বরাদ্দ হয়েছে।

এদিকে রাজকোষ শূন্যপ্রায়; কোম্পানির নিজের কাজের জন্যই এসেছে ওরা, খরচ-খরচা কোম্পানির থেকেই করা হবে; কিন্তু বেগম নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই এই এলাহি ব্যাপার করে চলেছে। একমাস দু'মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল; বেগম অকাতরে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে চলেছে ওদের পিছনে।

জিয়াৎরামউদ্দৌল্লাকে সহ্য করতে পারে না হেস্টিংস। মীরজাফরকে, মীরণকেও নিঃশেষ করেছে। ওই বংশের সকলের রক্তে আছে স্বাতন্ত্র্যের বীজ। জিয়াৎরামও নন্দকুমারের সঙ্গে একযোগ হয়ে বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করেছিল এককালে। মুর্শিদাবাদে আসবার সময় নজরানাও দিতে চায়নি জিয়াৎরাম।

বুব্ব বেগম বলে—ওঁদের একটু খোস করার দরকার, জানেনই তো সাহেবদের মেজাজ।

বুব্বু জিয়াৎরামকে যেন সাবধান করে দিচ্ছে।

জিয়াৎরাম প্রতিবাদ করে—উলটে নবাবকে ওরাই নজরানা দেবে ভাবী-সাহেবা। নবাবকে কোম্পানি বৃত্তি দেয় মাত্র তিরিশ লাখ টাকা, তার থেকে নজরানা দিতে গেলে নবাবের চুরি করতে হবে।

কথাটা হেস্টিংসের কানেও পৌঁছায়; মণিবেগম সর্বত্রই চর রেখেছে, মহলের কোথায় কি হচ্ছে তাও জানতে বাকি থাকে না তার। সেই দিনই মণিবেগমের মহল থেকে পঁচিশজন হাবশী খোজা শোভাযাত্রা করে হাজির হয় সাহেবের কুঠিতে; রূপোর বারকোশে সুগন্ধি গজদন্ত ভস্ম থেকে শুরু করে হীরার নজরানা পাঠায় মণিবেগম।

মিঃ মিডলটন প্রথম একটু ইতস্তত করে,—কোম্পানির নতুন আইনে কোন কর্মচারীর মাত্র চারশো টাকার বেশি নজরানা নেওয়া নিষেধ রয়েছে —ইয়োর এক্সেলেন্সি!

হেস্টিংস কাৎ হয়ে পড়ে আলবোলায় সুগন্ধি তামাক টানছিল, মিডলটনের কথায় হেসে ওঠে,

—এভরি 'ল' হ্যাজ সাম্ এক্সেপশন। টেক ইট ইজি মাই ডিয়ার। ইট ইজ ইয়োর অনার ক্রম দি নেটিভ।

হেস্টিংস মিডলটনকে শোষণ মন্ত্রে পাকাপাকি দীক্ষা দিল। এরপরই বেগমসাহেবা নিজে এসে ওদের আমন্ত্রণ জানায়।

—আপনারা আমার অতিথি। মহাভাগ্য আমার।

হেস্টিংস চেয়ে রয়েছে মণিবেগমের দিকে। মিডলটনের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে বেগম। ওর দেহ-যমুনায় আজও ভাঁটার স্তিমিত টান আসে নি! হেস্টিংস বলে ওঠে,

—খুব খুশ হয়েছি বেগমসাহেবা, আমার ফ্রেণ্ড মুর্শিদাবাদে এসেছে, হার এক্সেলেন্সির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

মিডলটন মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাল মণিবেগমকে।

নেটিভ মেয়েদের সম্বন্ধে মিডলটনের ধারণা বদলাচ্ছে। ওদের মধ্যে বিশেষ কাউকে বের হয়ে এসে বিদেশী অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখেনি, এ তাদের থেকে স্বতন্ত্র। রূপ! এত রূপ বড় একটা দেখেনি মিডলটন।

হেস্টিংস সায় দেয়—সি ইজ এ জুয়েল। এ লেডি অব চয়েস।

সন্তর্পণে পা টিপে চলেছে বেগম. চালের সামান্য ভুল হলেই সব বরবাদ হয়ে যাবে। বুঝ্ আর জিয়াৎরামই বাজি মাত করে দেবে। বিবিমহলের চকমিলান দখলমে নাচের মুশায়েরা বসেছে। ইতাবর খাঁ লোকজন নিয়ে তদারক করছে; কয়েকটা রঙীন বেলজারে কয়েক বৎসরের পুরানো বিদেশী পানীয়; ঘুঙুর আর সারেঙ্গীর সঙ্গে তবলা বাজছে, মাথা নাড়ছে হেস্টিংস। মিডলটন মেতে উঠেছে। বাইজীর সজীব দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে সে কল্পনা করে কি অসীম তৃপ্তির স্পর্শ। তাকে যেন ডাক দেয় ওই বিদেশিনী নর্তকী কি এক আবেশের ঘোরে; হেস্টিংস চেয়ে রয়েছে বেগমের দিকে; মনে পড়ে অতীতের দিনগুলো, এমনিই একজন পেশাদার নর্তকী ছিল মণিবেগম; এমনি জলদ তার পেশকার, এর চেয়ে তুরন্ত ছিল ত্রিতালের ছন্দ। মণিবেগম নতুন নবাব মবারককেও ডেকে এনেছে এই আসরে সাহেবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে।

মবারক বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। এ অন্য কোন জগতের সন্ধান পেয়েছে সে। স্বপ্নরঙ্গীন, সুরমুখর কোন সভা! এতদিন এর খবর সে পায় নি। কে যেন এগিয়ে দিয়েছে এক গ্লাস পানীয়; মণিবেগম ওর দিকে চেয়ে

আছে ; মবারকের হাত কাঁপছে—চোখের পাতায় কি যেন মদির নেশার স্পর্শ। ধীরে ধীরে যেন মণির হাতে আসবে ও। আসবার জন্যই তাকে বিচিত্র এই জগতের সন্ধান দিয়েছে মণি। মণিবেগমের ইশারায় বাঁদীয়া মবারককে এগিয়ে দেয় পানপাত্র। ওর দিকে চেয়ে আছে মণিবেগম—জীবনের ভোগবিলাসে ডুবে যাক মবারক। নিঃশেষে ভুলে যাক সবকিছু।

রাত্রি কত জানে না। মিডলটন বেটোর হয়ে উঠেছে। বিবি মহলের ওদিককার ঘরেই রয়েছে সে। হেস্টিংসের দিকে চেয়ে আছে বেগম ; নির্জন ছাদে ওরা মুখোমুখি দুজনে দাঁড়িয়ে, গঙ্গার বুক থেকে ভেসে আসছে ঝড়ো-হাওয়া ; সারা মুর্শিদাবাদ সুপ্তিমগ্ন, নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে তারা। রাত্রির অতন্দ্র প্রহর গণনা করছে ওরা দুজনে।

—মাই ডারলিং !

ও ডাক চেনে মণি ; বিদেশীর ওই ডাক তাকে সব ভুলিয়েছে। আজ নিজের দাবীর কথাও বলতে সময় পায় নি। হেস্টিংসের নিবিড় বাঁধনে ধরা দিয়ে বেগম আজ সমস্ত ভুলে যেতে চায়।

নীচে তখনও গান চলেছে। মবারকের তরুণ কণ্ঠের জড়িত চিৎকার শোনা যায় ; নতুন দীক্ষালাভ করে সে আজই প্রকৃত নবাব হয়ে উঠেছে। চমকে ওঠে বেগম ! চোখের সামনে আকাশের তারাগুলো কাঁপছে ; হেস্টিংসের নিবিড় দৃষ্টি তাকে ঘিরে রেখেছে, এ যেন স্বপ্ন দেখছে বেগম ; সব ভুলে যাওয়া কোন স্বপ্ন !

গঙ্গার জলস্রোত ছন্দমুখর হয়ে জেগে রয়েছে রাতের নিরন্ধ্র অন্ধকারে। কোথায় রাতজাগা পাখি একবার ডেকেই থেমে গেল।

সম্পূর্ণভাবেই ইংরাজ গ্রাস করেছে দেশের স্বাধীনসত্তাটুকু ! ওদের রাজ্য-নেশায় স্তব্ধ হয়ে গেছেন মহারাজ। ইংরাজ বণিকসম্প্রদায়কে বাণিজ্য ছাড়াও সাম্রাজ্যের স্বপ্নে পেয়ে গেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর সমস্ত রাজস্ব আদায়ের ভার নিজের হাতেই নিতে চায় তারা। এতদিন ওই কাজটা নবাব নিজামত থেকে করা হোত এবং শাসনব্যবস্থাও ছিল নিজামতের হাতে। রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট টাকা জমা পড়ত ইংরেজের তহবিলে। অবশ্য মধ্যেও কিছু হাত ফেরত হবার অবকাশ থাকত। এবার থেকে ইংরেজ পাকাপাকি ভাবে রাজস্ব আদায়ের ভার নিজেদের হাতে নিতে চায় ; দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং,

কান্তবাবু, নবকেষ্ট প্রমুখ কর্মচারীরাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। নবাব নিজামতের শুধু ভার থাকবে আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার, আর বাকি শোষণপর্বটা ইংরেজ চালাবে।

নিজামতের রাজস্ব সংগ্রাহকের পদে ছিলেন রেজা খাঁ, তখনও বন্দী রয়েছেন তিনি। নবাব এস্টেট পরিচালনার জন্য গুরুদাসকে বহাল করা হয়েছে বার্ষিক ছ'হাজার তঙ্কায় এবং নাবালক নবাব মবারকের অভিভাবক হয়েছে মণিবেগম। চমকে উঠেছেন মহারাজ সংবাদটা শুনে।

জিয়াৎরাম নিজে এসেছে মহারাজের বাড়িতে সংবাদটা দিতে। স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন মহারাজ। থমথমে ঘরখানায় ওঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়,

—হেষ্টিংস এমনি একটা কিছু করবে তা অনুমান করেছিলাম ছোটহুজুর।

—আগে বলেন নি কেন ?

জিয়াৎরামের প্রশ্নে মুখ তুলে চাইলেন মহারাজ, ভাবলেশহীন শূন্য সেই দৃষ্টি, শুষ্ক কণ্ঠে বলেন তিনি—কোন ফলই হোত না।

—রাজ্যের অবস্থা কি হবে জানেন ?

মহারাজ বলে ওঠেন—অরাজক! তবে ইংরেজের খরচ কমেছে ; নবাবের বৃত্তি বত্রিশ লক্ষ থেকে কমিয়ে ষোল লক্ষে দাঁড় করানো হল। হেষ্টিংস যে অন্যায় ভাবে আপনাদের বঞ্চিত করল তার জন্য কোম্পানির বোর্ড থেকে প্রশংসাই পাবে সে। একদিকে ষোল লক্ষ টাকা লাভ, অন্যদিকে বাংলার সমস্ত রাজস্ব সংগ্রহের ভার নিয়েছে নিজেদের হাতে।

জিয়াৎরাম কি ভাবছে, মুখে ফুটে ওঠে উত্তেজনার ছাপ ; বলে ওঠে,

—নবাব এখন ইংরেজের মাইনে করা নফর মাত্র ?

—তাছাড়া আর কি ?

শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এনে ফেলেছে হেষ্টিংস। মণিবেগম সামান্য ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আজ নবাবের সমস্ত ক্ষমতা, ন্যায্য অধিকার ইংরেজের হাতে ছেড়ে দিল, বিনিময়ে সে পেল নাবালকের অভিভাবকত্ব, তাও অর্ধমূল্যে। এর আগেই হেষ্টিংস, মিডলটন মুর্শিদাবাদে আসার পর থেকে কয়েক মাসে দুজনের পিছনে ৭৩,০০০৲ টাকা করে খরচা হয়েছে। নিজের সত্তাকে পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়েছে মণিবেগম হেষ্টিংসের সামনে। বহুগুণ মূল্য দিয়ে কিনেছে পর্দানসীন বেগমের পদ। তবু প্রতিবাদ না করে পারে না সে। মণিবেগম দৃঢ় প্রতিবাদ করে।

তবু হেষ্টিংস নির্বিকার! মণিবেগম একটু উত্তেজিত হয়েই বলে চলেছে,

—মাত্র ষোল লক্ষ টাকা বৃত্তিতে চলবে কি করে! এই টাকা থেকে নবাবের বিলাসিতা, সাংসারিক খরচ, সামরিক ব্যয়, মীরজাফরের আত্মীয়-স্বজনের রক্ষিতাদের বৃত্তি, আলিবর্দীর বংশধরদের বৃত্তি, পূর্বতন নবাব নাজিমদের কয়েকজন অনুগ্রহভাজনের বৃত্তি দিতে হয়। সত্রিশ লক্ষ টাকাতেও কুলোতো না। এখন উপায়?

হেষ্টিংস বলে ওঠে—বৃত্তি দেবার কথা চিরকাল নেই। তাদের মাসোহারা বন্ধ করে দিন।

—আমি বন্ধ করে দোব! তাদের অনেকেই অনাথা, বৃদ্ধ, পঙ্গু!

হেষ্টিংস নির্দয়ভাবে বলে—তাদের মরাই উচিত। সরকার অতিথিশালা খোলেনি। আর নবাবের খরচ? তাও কমাতে হবে। হাতি-ঘোড়া-উট সব তুলে দিতে হবে। যেটুকু না থাকলে নয় তাই থাকবে মাত্র।

নবাবের প্রকৃত অবস্থা আজ সেই পর্যায়েই এসেছে। হাতির খাওয়া কয়েতবেলের মত, উপরের খোলাটুকু মাত্র সার।

মণিবেগম আজ বুঝতে পারে হেষ্টিংস কতটুকু পুষিয়ে নিয়েছে। আলবোলার নলটা মুখ থেকে সরিয়ে সাহেব বলে,

—এই টাকাতেই বুব্বুবেগম-জিয়াংরাম গার্জেন হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বেগম; আই লাভ ইউ, তাই ওদের কথায় কান দিই নি!

বেগম কথা বলে না, আজ অনুভব করে কোন অতলে নামিয়েছে সে নিজের সামান্য স্বার্থে নবাব নিজামতের প্রতাপ। আজ তার পোষ্যবর্গের জন্য বৃত্তি বন্ধ করবার নির্দেশ আসছে, রাজস্ব সংগ্রহের কাজ হাতছাড়া হতে বসেছে; নবাবের চালচলনও কমাতে হবে।

ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সাহেব, ওর লাল গণ্ডদেশে লেগেছে অস্তরবির গাঢ় লালিমা, দুচোখের কালো তারায় সুদূরের স্পর্শ, অসহায় বন্দী হরিণীর মত মাধুর্যভরা একটি নারী। মণিবেগম আজ অসহায় মনে করে নিজেকে।

—বেগমসাহেবা।

মণি চমকে ওঠে; ওর এই ডাক, সামান্য স্পর্শ এড়িয়ে থাকতে চায়; এ যেন সর্বনাশা নেশা, তার প্রতিবাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে বেগম।

নিজের স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব হারিয়ে সাধারণ কামনাব্যাকুল নারীতে পরিণত

হয়ে যায়। এ এক বিচিত্র অনুভূতি! সব হারিয়ে আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মণিবেগম। মরে যেতে চায়। হেষ্টিংস ওকে বলিষ্ঠ বন্ধনে কাছে টেনে নিয়ে বলে চলেছে,

—তোমার ক্ষেত্রে সব আইনেরই ব্যতিক্রম থাকবে বেগমসাহেবা ; বাংলার মাটিতে দৌলত ছড়ানো, যে ভাবে পারো তুলে নাও, কোনদিনই অভাব হবে না। আমরাও প্রতিবাদ করবো না তোমার এই কাযের।

সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে সে বিকিয়ে দিয়েছে নবাবের রাজ্য শাসন করবার অধিকার, রাজস্ব সংগ্রহ করবার অধিকার। নবাবকে মাত্র ষোল লক্ষ টাকার নোকরে পরিণত করেছে ধূর্ত ইংরেজ। সব দিক থেকে নিদারুণভাবে বঞ্চিত হয়েছে মণিবেগম।

সান্ত্বনা দিচ্ছে সাহেব তার প্রিয়াকে, এ সান্ত্বনার অর্থ বোঝে বেগম। হেষ্টিংস তার বহু অন্যায় অপকর্মকে প্রশ্রয় দিয়েছে, নিছক ব্যক্তিগত কারণেই। অবশ্য তার জন্য হেষ্টিংসেরও লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

সন্ধ্যার রাগিণী বাজছে নহবতখানায়, ক্লান্ত দিনের শেষে শান্তিমগ্ন সন্ধ্যার তমসা আসছে। হেষ্টিংস নেমে চলে গেছে, একাই বসে কি ভাবছে বেগম আকাশ-পাতাল। মশালচী বাতি দিয়ে গেছে। এত অন্ধকারে সামান্য বাতির একটি রোশনীও কেঁপে কেঁপে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বড় একা মণি।

একটি পরিচিত কণ্ঠের স্বর আঁধারতল থেকে ভেসে আসে। অতীতের স্বপ্নমাখা স্মৃতি,

- দেখো মুঝে যো দিদায়ে ইবরৎ নিগাহ্ হো
মেরি শুনো যো গোশ্ সে নাসিহাৎ নিয়োশ হ্যায়॥
সাকি বাজালবায়ে দুশমনে ইমান্ ওয়াগ হি
মাতরিব্ বানাগ্ মা এ রহে জানে তান্‌কিন্ হোঁশ হ্যায়॥

বীণকার এগিয়ে আসছে, জীর্ণ দেহ, চোখ দুটোতে কি এক তৃপ্তির ইশারা! মাঝে মাঝে আঁধারতল থেকে প্রদীপের শিখার মত এগিয়ে আসে, আবার মিলিয়ে যায় পথের বাঁকে। ওর গায়ের শুনে একটু বিস্মিত হয় বেগম।

বীণকার চাতালে বসলো। মুখে মিষ্টি হাসির আভা।

—কি গাইলে বীণকার ?

—কবি বলছেন—প্রণয় প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়োনা মশাফির ; প্রেমের

ব্যর্থজ্বালা কত বড় সর্বনাশ আনে আমাকে দেখে অনুমান কর। এখনও বেহুঁশ যদি না হয়ে থাকো, তবে শোন—সাকী তার রূপ যৌবনের মদিরায় বেহুঁশ করে তোমার বিবেক-বিবেচনা সব লুট করে নিয়ে তোমার জিন্দগী তামাম বরবাদী করে দিয়ে যাবে।

মণি চমকে ওঠে; সন্ধ্যার বি চত্র অনুভূতির কথা স্মরণে আসে। হেস্টিংসের ছোঁয়া তাকে বেহুঁশ করে দেয়। তার ইজ্জত, সম্পদ, দৌলত সবই লুটে নিয়েছে বিদেশী, বীণকার তারই নিষ্ঠুর ইঙ্গিত করেছে। কঠিন হয়ে ওঠে বেগম, এই চরম দুর্বলতার কথা কোথাও প্রকাশ করতে চায় না সে।

—কি বলছো বীণকার?

হাসছে ওয়াজিদ—আমি বলিনি বেগমসাহেবা, সারা মুর্শিদাবাদের লোক বলছে, বেগমসাহেবা বিদেশীর কাছে নিজামতের সমস্ত অধিকার বিক্রি করেছে। নবাবকে ফকির বানিয়েছে। দরবেশ মানুষ, এসবের হিসাব রাখা আমার পেশা নয়, কানে আসে তাই বললাম।

বীণকার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বেগমের দিকে, সেদিনের মণি বাঁদীর চোখেও এমনি মোহব্বতের নিদারুণ ব্যর্থতার জ্বালা দেখেছিল, ওয়াজিদ তাকে সুখী করতে পারে নি, আজও বেগমের চোখের তারায় সেই অন্বেষণের ইঙ্গিত। পথ হারানো মুসাফিরের মত ব্যাকুল সে দৃষ্টি। মণি প্রশ্ন করে,

—একথা তুমি বিশ্বাস করো বীণকার?

মাথা নামাল ওয়াজিদ, নিষ্ঠুর সত্যকথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। ধীরে ধীরে বলে—আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে বেগমসাহেবার কিছু আসে যায় না। তবে ভুল করলে খোদার রাজত্বে তার বিচার একদিন হবেই; সেখানে ফাঁকি দিতে আজও কেউ পারেনি।

মণিবেগমের মনে ঝড় বয়ে চলেছে, তার দুর্বলতার সংবাদ নিয়ে ওরা আলোচনা করে প্রকাশ্যে, বীণকারকেও আজ যেন সহ্য করতে পারে না। ভুল! কোথাও কোন ভুল সে করে নি। সহজ স্বাভাবিক মানুষের পরিচয় নিয়ে সে আজও বেঁচে আছে। অর্থ-প্রতিপত্তি ছাড়াও অন্য কোন কামনা কি নারীর থাকতে নেই? সে নারী, তার সেই সহজাত প্রকৃতিকে নিঃশেষে হত্যা করতে পারে নি।

সহজ কণ্ঠে জবাব দেয় বেগম—ভুল আমি করিনি বীণকার।

ওয়াজিদ ওর দিকে [illegible] দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, নিজেকে ফাঁকি দিতে

পারেনি মণি ; ওর চোখে মুখে সেই তৃপ্তির আমেজ ; নেশার মত পেয়ে বসেছে তাকে।

রাতের আকাশে একসঙ্গে ডেকে ওঠে কতকগুলো ঘুমভাঙ্গা চন্দনা পাখি। আবার স্তব্ধতা নেমে আসে চারদিকে। ধীরে ধীরে বীণকার বের হয়ে এল। মণিবেগমের দেহে মনে এসেছে পরিবর্তন, স্রোতে ভেসে চলেছে সে। ইচ্ছা করলেও কূলে ওঠবার সামর্থ্য তার নেই. এখন দাঁড়ানো মানেই নিশ্চিত মৃত্যু।

বাংলার মৃতদেহের উপর হাজারো শকুন নেমে এসেছে। দীর্ঘ কঠিন শাণিত ঠোঁট দিয়ে তারা ঠুকরে ঠুকরে ওর বুক খণ্ড খণ্ড করে নিজেদের আকাশজোড়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করছে। ওদের ঠোঁট মুখ রক্তমাখা। বীভৎস চাহনিতে আকাশের দিকে চেয়ে আছে, চিৎকার করছে তীক্ষ্নস্বরে।

হেস্টিংস বাংলায় নতুন করে জরিপ শুরু করিয়েছে, নতুন আইনে রাজস্ব ধার্য করা হবে এলাকার পরিমাণ হিসাবে। এতদিন বহু জমি তারা বিনা রাজস্বে ভোগ করেছে। সমস্ত ফাঁকি ধরে ফেলেছে কোম্পানি। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং, কান্তবাবু, নবকেষ্ট প্রমুখ নীতিবিদ কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত জমি জরিপ করা হলে নতুনভাবে বন্দোবস্ত করা হবে। সমস্ত জমিদার যারা ছিল মন্বন্তরের আগে এবং পরে, দেবী সিং, রেজা খাঁয়ের দৌলতে আজ তারা ফৌত হয়ে গেছে। আর বেশি কিছু দেবার সামর্থ্য তাদের নেই। জমিদারী হাত ফেরতা হলে রাজস্বের পরিমাণ তো বাড়বেই, উপরন্তু হেস্টিংসের হাতে আসবে মোটা নজরানার টাকা। সমস্ত জমি লপ্তে লপ্তে ভাগ করে এক একজন ফার্মার জেনারেলকে ইজারা দেওয়া হবে কয়েক বৎসরের জন্য ; যা আদায় হবে - রাজস্ব বাদ দিয়ে সেটা তারই আয়।

নেটিভ কর্মচারীদের অনেকেই এই সুযোগে কিছু জমিদারী হাত করে নেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। হেস্টিংসকে খুশি করবার জন্য সবাই ব্যস্ত।

কলকাতার আদি বাসিন্দা নবকেষ্ট, জমি-জিরাত চাষাবাদের কিছুই বোঝে না। হেস্টিংসের কাছে এসে দরবার করছে।

- ভেরি পুওর স্যার।

পাতু কাহার চোখ বুজে পাখা টানছিল, সাহেবের আলবোলার মৃদু মৃদু শব্দ কানে আসে। হঠাৎ নবকেষ্টর কথা কানে যেতেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

ইংরেজের আশে-পাশে থেকে ইংরিজি দু একটা কথা শুনেছে—মানেও জানে। একটু অবাক হয়ে যায় সে, নবকেষ্টবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধের দিনগুলো ভুলতে পারে না। তেমনি লোক হঠাৎ গরীব হয়ে উঠেছে—হাতজোড় করছে সাহেবের কাছে! কান্তবাবুকেও এমনি হাত কচলাতে দেখেছিল।

হেস্টিংস বলে ওঠে—তুমি মিথ্যা কথা বলছ কেষ্টবাবু।

নবকেষ্ট জমি ইজারা চায়; বংশানুক্রমিক ভাবে যাতে ভোগ দখল করতে পারে ঠাট-বাট বজায় রেখে। হেস্টিংস বলে ওঠে—নজরানা দিতে হবে। ফার্মার জেনারেল কি মুফত হয় বাবু?

গরুড় পাখির মত হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে নবকেষ্ট। বহুদিন, বহু বৎসর অক্লান্তভাবে সব রকমে সেবা করে এসেছে কোম্পানিকে। আজও করছে।

—তুমিই হর্তাকর্তা সাহেব, তুমি করলে সবই হয়।

হাসছে হেস্টিংস ওর দিকে চেয়ে—বহুত ক্লেভার তুমি নবকেষ্ট। অল রাইট। গো নাউ।

সাহেব যেন প্রসন্ন হয়েছে। হেস্টিংস বাংলা জোড়া জাল ফেলেছে; এ-সময় কর্মচারীদের চটানো নিরাপদ নয়। নবকেষ্ট, কান্তবাবু আর গঙ্গাগোবিন্দ সিং তার প্রধান আশা ভরসাস্থল। ওরা ভাগ চাইবে বৈকি।

মহারাজ নন্দকুমার ইতাবর খাঁকে তলব করে গুদাম নৌকা সমস্ত আটক করেছেন। লাখো টাকার চোরাই মদ ধরা পড়েছে। নিজামতের বহু আয় এমনি করে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে যান মহারাজ! ইতাবর খাঁ সেদিনের দরিদ্র সীতানাথ পণ্ডিত, আজ এত সম্পদ সে কোথায় পেল! মুর্শিদাবাদে খবরটা ছড়িয়ে পড়বার আগেই পিক্রসাহেব রাতারাতি তার সমস্ত মালপত্র অন্যত্র সরিয়ে ফেলে, মদের দাম এক হাঁকে চার পাঁচগুণ বাড়িয়েছে।

মণিবেগম একটু বিপদে পড়ে; কিন্তু এসব বিপদ তার কাছে সামান্য। সারা মুর্শিদাবাদে জানাজানি হয়ে গেছে; ইতাবর খাঁ একপাশে দাঁড়িয়ে আছে—বেকুফ তুমি। মণিবেগম তিরস্কার করছে তাকে।

—হ্যাঁ, বেগমসাহেবা। ইতাবর খাঁ বেগম মহলের সমস্ত হাল হকিকত,

আদব কায়দা শিখে গেছে। প্রতিবাদ করা এখানের কানুনে মস্ত বড় বেয়াদবি। মাথা নেড়ে সায় দেয় বেগমের কথায়।

মহারাজকে আসতে দেখে ইতাবরের উদ্দেশে চিৎকার করে ওঠে বেগম, —তোমাকে জ্যান্ত গোর দিতে পারি জান? এত বড় বেকানুন আমি সইব না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ইতাবর; মণিবেগম তত উষ্মা প্রকাশ করে চলেছে। মাঝে মাঝে হাতজোড় করছে ইতাবর খাঁ।

সমস্ত ব্যাপারটাই একটা প্রহসন বলে ঠেকে মহারাজের কাছে। মণি-বেগমের প্রকৃত মুখোশ খুলে পড়েছে। নিজের হাতে তুলে নিয়েছে এ মামলা।

—যাও! মণিবেগম জোর করেই সরিয়ে দিল তাকে। ইতাবর সরে গেল।

চারিদিকে চেয়ে দেখেন মহারাজ, বেগমকেও। অতীতের কয়েক বৎসর আগেকার একটি দিনের কথা মনে পড়ে। শত্রুবেষ্টিত মীরজাফর; অসহায় বেগম সেদিন ইংরেজের সাহায্যবঞ্চিত হয়ে কাতরভাবে তাঁকে অনুরোধ করতে গিয়েছিল, নিজের সবকিছু তাঁর হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত ছিল বেগম। আর আজ! দিন বদলেছে। ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে বেগমের দিকে।

বেগমসাহেবা ধীরভাবে বলে কথাটা।

—ইতাবরের মালপত্র ছেড়ে দেন মহারাজ, ও আমাকে কথা দিয়েছে কখনও এ কাজ আর করবে না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন মহারাজ—ছেড়ে দিতে বলছেন, এমনিই! মদ ধরিয়ে সারা জাতটাকে শেষ করে দেবে, আপনি প্রশ্রয় দেবেন সেই কাজে? রাজকোষেও ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে এতকাল!

এর কোন উত্তর দেবার উপায় বেগমের নেই। মহারাজ প্রকৃত তথ্যটা অনুমান করেছেন। ইতাবরকে অন্তরালে প্রশ্রয় দিয়েছে বেগম নিজে। বেগম মহারাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে নিজেকে বিব্রত বোধ করে। মনের কথা গোপন থাকে না ওই তির্যক সন্ধানী দৃষ্টির সামনে। এড়িয়ে যাবার জন্যই মণিবেগম একটু নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে,

—আমার বক্তব্য আমি জানিয়েছি।

—বেগমসাহেবা! মহারাজ এর প্রতিবাদ করতে চান।

মণিবেগম আজ বদলে গেছে। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে,

—আমার অনুরোধ নয়, এ বেগমসাহেবার আদেশ। নবাব নিজামতের সব কাজই আমার হুকুমে চলেছে এটা ভুলে যাবেন না মহারাজ।

টকটকে মুখ অপমানে রাঙ্গা হয়ে ওঠে মহারাজের, নিস্ফল রাগে কাঁপছে সারা শরীর। চোখের সামনে এই দুর্নীতি হীনতার প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হতে হবে তাঁকে! চুপ করে বের হয়ে এলেন।

ইতাবর খাঁ পাশের কামরাতেই ছিল, মহারাজ বের হয়ে যেতেই এগিয়ে আসে। বেগমসাহেবার মুখ চোখ থমথমে, ইতাবরের দিকে নীরবে চেয়ে থাকে; ওই দৃষ্টির অর্থ বেশ বোঝে ইতাবর খাঁ! এই জঘন্য কাজ সে ইতিপূর্বে কয়েকবার করেছে, রাতের অন্ধকারে নিঃশেষে কাউকে সরিয়ে দেওয়া এ অতি সোজা কাজ। প্রতিবাদ করবার ভাষা আর থাকবে না, নির্বিবাদে আবার শুরু করতে পারবে অন্ধকারের বেসাতি। মণিবেগমের দুচোখে বিদ্যুতের ঝিলিক, অমানুষিক হিংস্রতা ফুটে উঠেছে দুচোখের দৃষ্টিতে।

ছেঁড়াছিঁড়ি শুরু হয়েছে বাঙ্গলাদেশে। রাণী ভবানীর জমিদারী, দিনাজপুর; বাহিরবন্দ পরগনা, বর্ধমানের জমিদারি, কৃষ্ণনগরের এলাকা সব মাপজোখ হচ্ছে, নতুন খাজনা বৃদ্ধি করছে কোম্পানি। হাঁক-ডাক পড়েছে জমিদারদিকে, নতুন খাজনা বৃদ্ধির স্বপক্ষে বিপক্ষে যদি বলবার কিছু থাকে আসতে পারে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং আজ বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা হেস্টিংসের ডান হাত, ওদিকে নবকেষ্ট। দিনাজপুরের দেওয়ান কলকাতার কুঠিতে পড়ে আছে।

টাকা উড়ছে আকাশে-বাতাসে। কৃষ্ণনগরের রাজা দরবারে লোক পাঠাতে পারলেন না, গঙ্গাগোবিন্দ সিংকে পত্র লিখেছেন।

—পুত্র অবাধ্য।

দরবারে অসাধ্য,

ভরসা কেবল গঙ্গাগোবিন্দ।

সারা বাংলার জমিদারদের ভরসাস্থল তিনিই। নবকেষ্ট পেয়েছে একটা লাট, রাজস্ব দিয়েও প্রভূত মুনাফা থাকবে। কান্তবাবুর জমিদারির সীমানা বেড়ে গেছে, নাটোরের রাণী ভবানী চিরকালই স্বাধীনচেতা মহীয়সী নারী। তাঁর জমিদারির সেরা অংশটাই এসে ঢুকেছে কান্তবাবুর জমিদারিতে। বাহিরবন্দ পরগনা তাঁর হাতছাড়া হয়ে হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র কাশিমবাজারের কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথ নন্দীর হাতে এল। বাহিরবন্দের বার্ষিক আয়

৩,৫০,০০০৲ টাকা। এই সম্পত্তি মাত্র ৮২০০০৲ টাকার খাজনায় জমাবন্দী হয়ে গেল লোকনাথবাবুর নামে। বর্ধমান এস্টেটও অবিচার পেয়েছে প্রচুর।

ছোটখাট বহু জমিদার আজ বঞ্চিত হয়েছে। না হলে দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ, কান্তবাবু, কালাচাঁদ, নবকেষ্ট এরা জমিদার ফার্মার জেনারেল হবে কি করে?

এর প্রতিবাদ জানাবার কেউ নেই। টাকা, নজরানা যে হেস্টিংসকে দিতে না পেরেছে তাকে সর্বস্বান্ত হতে হল। বাংলার ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর পরিবর্তনের কোন প্রতিবাদই হবে না! প্রজারাও ক্ষেপে উঠেছে মনে মনে।

রাণী ভবানী ক্ষুব্ধ মর্মাহত হয়েছেন ইংরেজের এই অবিচারে। তাঁর জমিদারির বেশি অংশই অন্যায়ভাবে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। নিজেই এসেছেন বড়নগরের বাড়িতে। বাংলায় মাত্র একজন আছেন যিনি এর প্রতিবাদ করতে পারেন। বর্ধমানের দেওয়ান, মেদিনীপুরের নায়েবও এসেছেন মুর্শিদাবাদে মহারাজ নন্দকুমারের কাছে এই অবিচারের প্রতিকারের আশায়।

স্বপ্ন দেখে বুব্বুবেগম, জিয়াংরাম; কিন্তু কোনদিনই তাদের মসনদের স্বপ্ন সত্য হবে না। মবারক নবাব হয়েই বিলাস-ব্যসনের স্রোতে গা এলিয়ে দিয়েছে। মণিবেগম, ইয়ার জঙ্গ তীরে দাঁড়িয়ে দেখছে মবারকের নৌকা কেমন বাদাম পালে বয়ে চলেছে বিলাসসমুদ্রের তুফানে। চারিদিকে তুফান উঠেছে।

কলকাতার কুঠিতে সংবাদ পৌছেছে; বাহিরবন্দ-রাজসাহী পরগনা থেকে পাঁচ হাজার প্রজা দল বেঁধে এগিয়ে আসছে; এগিয়ে আসছে রুদ্ধস্রোত জলধারার মত ওদের দল—অন্তরের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ, বিদ্রোহ নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে।

হেস্টিংস চঞ্চল হয়ে ওঠে—ফৌজরা কি করছে? মিঃ মিডলটনকে সংবাদ পাঠাও।

অজানা আতঙ্কে বুক কেঁপে ওঠে ওদের।

গঙ্গাগোবিন্দ সিং ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সাহেব ভেবেছে বিদ্রোহ করেছে ওরা, সন্ন্যাসী বিপ্লবীর দল বোধ হয় মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সারা বাংলা জুড়ে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে।

ওদিকে হাজার হাজার তাঁতীরও কাজ বন্ধ। ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে জাহাজ বোঝাই রকমারি কাপড় আমদানি শুরু হয়েছে! ইংরেজ তার ব্যবসার প্রশস্ত জায়গা বেছে নিয়েছে বাংলাদেশে, তাঁতের কাজ বন্ধ; যারা রেশমের নিপুণ শিল্পী তারাও সমস্যায় পড়েছে। চাপ দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শনগুলো নিয়ে বিদেশে চালান করছে ইংরেজ; মসলিন থেস বালুচরী মুর্শিদাবাদী রেশমশিল্পীরাও ক্ষেপে উঠেছে।

দলে দলে অভিযোগ করতে আসে নন্দকুমারের কাছে, কারও চোখে জল, কারও চোখে প্রতিবাদের অগ্নিজ্বালা।

অসহায় নন্দকুমার। হাজারো বিক্ষুব্ধ জনতা যোগ দেয় ওই প্রজাদের প্রতিবাদ শোভাযাত্রায়। ওরাও চলেছে কলকাতার দিকে। কলরব কোলাহলে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে।

এই টলমল অবস্থায় সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজ শিউরে উঠেছে মনে মনে; কিন্তু আসলে এর হোতা গঙ্গাগোবিন্দ সিং, কান্তবাবুর কাছে বেশ কিছু টাকাও পেয়েছে; তাই নিয়ে জমিদারীর বন্দোবস্ত সব উলটে গেছে। গঙ্গাগোবিন্দ সতর্ক করেন কান্তবাবুকে।

—ওদের যেমন করে হোক ঠাণ্ডা করুন। আসল সংবাদ প্রকাশ পেলে সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে।

কান্তবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাশিমবাজারে সংবাদ পাঠান। প্রজাদের চটিয়ে জমিদারী রাখা যাবে না; ওদের সন্তুষ্ট করতেই হবে। ওদিকে রাণী ভবানীকেও মনে মনে ভয় করেন তিনি। সংবাদ পেয়েছেন নন্দকুমারের সঙ্গেও এসে পরামর্শ করে গেছেন রাণী ভবানী, তার পরেই এই আন্দোলন শুরু হয়েছে।

পদ্মার এপারে লালগোলা ভগবানগোলা পার হয়ে আসছে হাজারো জনতার শোভাযাত্রা; পথে পথে যোগ দিচ্ছে অত্যাচারপীড়িত প্রজার দল। এতদিন প্রতিবাদ করবার ভাষা তাদের যোগায় নি, আজ সমুদ্রগামী নদীর সঙ্গে পাশ থেকে ছোট নদী নালা মেশার মত দুপাশ থেকে জনতা এসে যোগ দিচ্ছে তাদের সঙ্গে। বেড়ে চলেছে তাদের আয়তন। সমুদ্রগর্জনের মত তাদের কণ্ঠস্বর মুর্শিদাবাদের স্তব্ধতা নিঃশেষ করে এগিয়ে চলেছে কলকাতার দিকে। তারা হেস্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। মুখোমুখি এর জবাব চায় ওরা।

মহারাজের স্বপ্ন সফল হয়েছে, বাহিরবন্দ পরগনা দেশের বুকে নতুন চেতনার আলোড়ন এনেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা চলেছে পথে পথে, কণ্ঠে ওদের বিদ্রোহের ভাষা।

হেস্টিংসের কাছে সংবাদটা পৌঁছে গেছে নন্দকুমারই এই আন্দোলনের মূল। তিনিই এসব বুদ্ধি যুগিয়েছেন। পায়চারি করছে হেস্টিংস। ওই একটি মানুষ পদে পদে তাকে বাধা দিয়েছে, প্রতিবাদ করেছে। ইংরেজের শান্তির জীবন অশান্তিময় করে তোলবার চেষ্টা করেছে প্রতি পদে পদে। তাকে বহু চেষ্টা করেও দমাতে পারেনি।

চিৎকার করে ওঠে হেস্টিংস। ওদের কণ্ঠস্বর বহুদূর অবধি গিয়ে পৌঁছে। লণ্ডন অফিস থেকে ডিরেক্টার বোর্ড সিদ্ধান্ত করেছেন ভারতের শাসন ব্যবস্থার কাজে গভর্নর জেনারেলকে সাহায্য করবার জন্য একটি বোর্ড গড়ে তোলা হচ্ছে কলকাতায়! বোর্ডের সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস, মিঃ বারওয়েল, জেনারেল ক্লেভারিং, কর্ণেল মনসন এবং মিঃ ফ্রান্সিস।

এদের অনেককেই চেনে হেস্টিংস। এর পর থেকে নিরুপদ্রবে রাজত্ব, অত্যাচার এবং অনাচার করা একটু কঠিন হবে, এবং তাকে নজরে রাখবার জন্যই কোম্পানি এই ব্যবস্থা করেছে, এ যেন হেস্টিংস নিজেরই অপমান বলে মনে করেছে।

চারিদিকের ব্যাপারে তার মনে শান্তি নেই এবং জীবন্ত আতঙ্ক হয়ে রয়েছে মহারাজ নন্দকুমার তার সামনে। তার ঘুমেরও মাঝে দুঃস্বপ্নের মত দেখা দিয়েছে। মণিবেগমও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মহারাজের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে তাকে। কিন্তু হেস্টিংস জানে, বেগমও মর্মে মর্মে বুঝেছে, অন্য ধাতুতে গড়া ওই ব্রাহ্মণ। উৎকোচ, অর্থ, পদ কোন কিছুই তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না, পারেনি। মণিবেগমকে তবুও নির্দেশ পাঠায়, যা হোক একটা ব্যবস্থা করবার জন্য।

হেস্টিংসের মত মণিবেগমও বিব্রত হয়ে পড়েছে। তার গোপন ব্যবসার রন্ধ্রপথে পাথর চাপা দিতে উদ্যত হয়েছেন মহারাজ। নিজামতের হাল বদলে আসছে; মুর্শিদাবাদে আজ ইয়ার জঙ্গের প্রাধান্য কমছে। সন্ত্রস্ত নাগরিক আবার শান্তি ফিরে পেয়েছে। মণিবেগমের কাছে এর চেয়ে অশুভ খবর আর

কি থাকতে পারে। ওদিকে কোম্পানির নতুন বোর্ড আসছে, হেস্টিংসের হাত-পাও বাঁধা হয়ে পড়বে।

হেস্টিংস দয়া করে তাকে পর্দানসীন বেগমের পদ দিয়েছে, কিন্তু বুব্বু বেগম নতুন বোর্ডে প্রতিবাদ করলে হয়তো তার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে, বেগমের ।তিল হয়ে যেতে পারে এবং প্রতিবাদ করার বুদ্ধি দেবে ওই মহারাজ নন্দকুমারই। মণিবেগম তাকে সেদিনও অপমান করেছে ইতাবর খাঁয়ের চোরা মদের কারবার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে।

ভাবছে মণিবেগম! ইয়ার জঙ্গ, ইতাবর খাঁকেও ডেকেছে। দুটি মূর্তিমান শয়তান! চোখে চোখে কি এক নিষ্ঠুর ইঙ্গিত খেলে যায়; সমস্যা সমাধানের পথ অতি সোজা। ইতাবর খাঁ পথ পেয়েছে মায়াকে ছিনিয়ে আনবে, অন্য দিকে সমস্যার সমাধানও হবে।

মায়া একটু বিস্মিত হয়ে উঠেছে; পর পর ক' রাত্রেই দেখেছে দোতালার জানালা থেকে, লোকটা প্রায়ই আশপাশে ঘোরাঘুরি করে, এ বাড়ির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। ভয়ে শিউরে ওঠে মায়া। আজকের ওই শয়তানকে সে ঘৃণা করে সারা মন দিয়ে। কি এক হীন উদ্দেশ্য নিয়ে রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে পথে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করে কয়েকদিন পরই বুঝতে পারে ব্যাপারটা।

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে মায়া। মহারাজের উপরই তার নজর। সে যেন গোপনে চরম আঘাত হানতে চায়! ভাবছে মায়া। একটা দায়িত্ব, কর্তব্য-বোধ তার সারা মনে জেগে ওঠে। মহারাজের জীবন বিপন্ন হতে দিতে পারবে না সে।

ইতাবর খাঁ অন্ধকারের মধ্যে কাকে আসতে দেখে চমকে ওঠে; সাবধানী হাতে খাপ থেকে তলওয়ারখানা খুলতে গিয়ে থেমে গেল। এগিয়ে আসছে মায়া! নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না সে।

—তুমি! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে ইতাবর। যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না ওকে। মায়া এক নিমেষের মধ্যে বদলে গেছে। উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়ে সে। ক' বছরের বিচিত্র জীবনযাত্রা তাকে আরও চতুর সাবধানী করে তুলেছে। চোখের তারায় এসেছে মাদকতামাখা আহ্বান। ইতাবর আজ যেন কাঁপছে পতঙ্গের মত। মায়া হয়ে ওঠে লাস্যময়ী ?ান নারী।

—কেন! আজ আর আমায় মনে ধরে না? বিবিমহলের ওদের চেয়ে আমি কম কিসে?

—মায়া! ইতাবর ওকে আজও যেন ভালবাসে। ঠিক ভালবাসে কিনা জানে না, তবে নতুন করে ফিরে পেতে ইচ্ছা করে।

সেদিনের সীতানাথ পণ্ডিত এই ভোগবিলাসের জীবনকে চেনেনি। আজ মায়াকে নতুন করে ফিরে পেতে চায়, অত্যন্ত চেনা আপন সেই মায়াকে। মায়া এগিয়ে আসে, কণ্ঠে তার ব্যাকুল আহ্বান।

—চল, এখান থেকে চলে যাই আমরা। নিয়ে যাবে আমাকে?

এই ডাক শোনবার জন্যই যেন কান পেতেছিল ইতাবর। কিন্তু সামান্য কাজ তার বাকি, কাঁটাকে না সরিয়ে সে যেতে পারে না। মণিবেগমও তাকে ক্ষমা করবে না। দোটানার মধ্যে পড়েছে ইতাবর। একদিকে ছোট্ট সংসার, অর্থের অভাব থাকবে না, অন্যদিকে মণিবেগমের বাবসা! পথের কাঁটা। মায়া হাত ধরেছে তার, কাঁপছে ইতাবর। বলে ওঠে ইতাবর খাঁ,

—কিন্তু একটা কাজ বাকি আছে, তুমি ইচ্ছে করলেই পার।

—তোমার জন্য সব করতে পারি। মায়া বলে ওঠে।

ইতাবর ওকে দেখছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, ওর কণ্ঠস্বরে কোন জড়তা বা দ্বিধা নেই। কি ভেবে পকেট থেকে একটা মোড়ক বের করে তুলে দেয় মায়ার হাতে।

আঁধারে ফিস ফিসিয়ে বলে ওঠে ইতাবর, চোখদুটো জ্বলছে তীব্র জ্বালায়,

—নন্দকুমার আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। যদি—

মায়াকে চোখে চোখে ইঙ্গিত করে সে সমস্যা সমাধানের সোজা পথ দেখিয়ে দেয়।

চমকে ওঠে মায়া। হাত কাঁপছে তার; আবছা অন্ধকারে দেখে ইতাবরের দুচোখ শ্বাপদ লালসায় জ্বলছে। আজ মায়া স্পষ্ট বুঝতে পারে ওদের গভীর চক্রান্ত। মায়া অনুভব করতে পেরেছে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু পর মুহূর্তেই সামলে নেয় নিজেকে। ইতাবর চলে গেছে। স্তম্ভিতের মত বাড়ি ঢুকলো মায়া, সে যেন স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। কি এক নিবিড় দুঃস্বপ্ন!

মহারাজ তখনও নিজের ঘরে আলো জেলে কাজ করছেন, খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে তাঁর প্রশস্ত ললাট, শান্ত মূর্তিটা দেখা যায়। ওঁকে সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন; পিছনে কি হীন চক্রান্ত চলেছে রাতের অন্ধকারে। হাতে

তখনও রয়েছে ইতাবরের দেওয়া বিষটুকু। পরক্ষণেই থমকে দাঁড়াল মায়া, সারা বাংলার একটি মাত্র মানুষ, যাকে আজ ইংরেজ, নিজামত ভয় করে; সারা দেশের শ্রদ্ধার পাত্র তিনি। তাঁকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিজেই নিতে পারবে সে; এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে, তার জন্য যদি দরকার হয়—কল্পনা করতেও শিউরে ওঠে মায়া! মহারাজকে ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেবে না।

চুপ করে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে ইতাবর, খুন জখম রক্তপাত করতে হবে না, নীরবে কাজ হাসিল করা যাবে। একবিন্দু বিষেই ঢলে পড়বে মহারাজ, নিষ্কণ্টক হবে নিজামত; নিশ্চিন্ত হবে মণিবেগম, হেস্টিংস। তার প্রতিষ্ঠা বেড়ে যাবে নিজামতে, সেই সঙ্গে ফিরে আসবে মায়া। কল্পনা করতেও আনন্দ পায় সে।

টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যা থেকেই জনহীন হয়ে উঠেছে পথ; ঠাণ্ডা হাওয়া পথচারীদিকে তাড়িয়ে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে রেখেছে; চকবাজারের দোকানদাররাও বন্ধ করেছে বেচাকানা, ইচ্ছাগঞ্জ মহল্লার নির্জন পথ দিয়ে চলেছে ইতাবর। শীতের হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে তোলে, মনের উষ্ণ অনুভূতি তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মায়া এসে দাঁড়িয়ে থাকবে পথের ধারে আঁধার গাছতলায়; একটু স্বপ্ন! চলেছে সে তারই ঘোরে নেশাগ্রস্তের মত।

জানালার আবছা আলোও আসে না, সব অন্ধকার। মশালচীও আলো দিয়ে যায় নি এ পথে; মায়া কম্পিত বুকে দাঁড়িয়ে আছে নিষ্ফল প্রতীক্ষায়। ছায়ামূর্তিটা জমাট অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে। চমকে ওঠে মায়া! দৌড়ে পালাবে নাকি! না, ইতাবরই আসছে। আশাভরে এগিয়ে আসছে ইতাবর, আনন্দে ভরে উঠেছে তার বুক। সাবধানী দৃষ্টিতে চারিদিক দেখে ওর কাছে এসে দাঁড়াল।

—কাজের কতদূর? ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে ইতাবর।

—ভয় নেই, আজ রাত্রেই সব ব্যবস্থা করে এসেছি। জবাব দেয় মায়া।

আজ সে বদলে গেছে। ইতাবর ওকে কাছে টেনে নিয়েছে! মায়ার সারা দেহে একটা শিহরণ খেলে যায়; সাপের মত হিমশীতল ওর স্পর্শ!···মায়া বলে চলেছে—আজ রাতেই চলে যেতে হবে।

ইতাবরও তৈরি—জরুর। এরপর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

মায়া ওর দিকে চেয়ে আছে, পানের ছোপ লেগেছে রঙ্গীন ঠোঁটে; পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপছে কিসের দোলানিতে; ইতাবরের দিকে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে।

—কি দেখছো মায়া? ইতাবরের মনে হালকা সুরের রেশ।

মায়া ওর হাতে তুলে দেয় একটা পান—খাবে?

ইতাবর মুখে দিল—ইস, যা ঠাণ্ডা পড়েছে। জর্দা আছে?

একটি মুহূর্ত! সামনে যেন সারা আকাশ ভেঙ্গে বাজ পড়ছে; বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে ওঠে দিক্-বিদিক্! ইতাবর কাঁপছে! মায়া দুহাতে চোখ ঢেকেছে দুঃসহ ব্যথায়! সারা শরীরে একটা প্রকম্প দুর্বলতা। তীব্র বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে ইতাবরের রক্তে।

গর্জন করে ওঠে সে—বিষ দিয়েছিস্ রাক্ষসী?

—হ্যাঁ! স্থির কণ্ঠে জবাব দেয় মায়া।

ওর কঠিন দুটো হাতের নিষ্পেষণে মায়ার কণ্ঠনালী পিষে ফেলতে চায় ইতাবর; আঙ্গুলগুলো সাঁড়াশীর মত চেপে বসেছে মায়ার গলায়, দম বন্ধ হয়ে আসছে, তবু ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে না মায়া; কাঁপছে ইতাবর,…হাতের বজ্রমুষ্টি আলগা হয়ে আসছে। চোখের সামনে জমাট বেঁধে আসে অন্ধকার। অস্ফুট আর্তনাদ করে সশব্দে ছিটকে পড়ল ইতাবরের প্রাণহীন দেহটা রাস্তার কাদাতেই।

কাদের পায়ের শব্দে চমকে ওঠে মায়া, থরথর করে কাঁপছে সে।

—তুমি!

আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে মায়া। মহারাজ ফিরছিলেন কাজ সেরে সঙ্গের পাইক দুজন আলোটা তুলে ধরে দেখে প্রাণহীন দেহের দিকে। চমকে ওঠেন মহারাজ,

—ইতাবর খাঁ! আমাদের সীতানাথ পণ্ডিত না?

মায়া পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। মহারাজ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—একি ব্যাপার মায়া?

—ওকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছি মহারাজ। নিজের স্বামীকে হত্যা করেছি! ওরা আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল।

—মায়া! মৃতদেহটার পাশ থেকে মহারাজ টেনে নিলেন ওকে।

মায়া যেন উন্মাদ হয়ে গেছে ; নিজের দুটো হাত দিয়ে নিজেরই কণ্ঠরোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে।

মহারাজের চোখের উপর কি যেন রহস্য ঢাকা নাটকের একটা দৃশ্যের অভিনয় হয়ে চলেছে। অন্ধকার মুর্শিদাবাদের পথে পথে চলেছে শয়তানের অভিযান, বাংলার আকাশজোড়া তমসায় জেগে উঠেছে শ্মশান কিঙ্করের দল।

টিপিটিপি বৃষ্টি নেমেছে আবার।

কান্তবাবু কাছারী ঘরে বসে কি ভাবছে ; ভাদুরে ভাপ্‌সা গরম, জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় গঙ্গার বুকে কয়েকটা নতুন জাহাজ এসে নোঙর করেছে, বাতাসে উঠছে ওদের নিশান ; ওপারে ঘন বনঢাকা গাছগাছালির মাথায় তির্যক রেখায় পড়েছে রোদের আভা। দেওয়ানজী হেঁকে ওঠেন,

—জোরে টান।

টানা পাখাওয়ালার বোধ হয় ঢুলুনি এসেছিল গরমে ; বাবুদের হাঁকে ঘুম থেকে উঠে আবার টানতে শুরু করেছে পুরোদমে।

—আর চাকরী করা যাবে না দেওয়ানজী। একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর। আর চারজন প্রভু যে এসে হাজির হয়েছেন! কে জানে কোন দেবতা কোন্ ফুলে তৃপ্ত হন!

নবকেষ্ট বড় চিন্তায় পড়ে গেছে। একা নবকেষ্ট কেন অনেকেই ফাঁপরে পড়েছে। কাগজপত্র রেকর্ড জমাবন্দী পড়চা সর্বত্রই গলদ। হেষ্টিংস সাহেব বেকায়দা বুঝলে ঝাঁকের কই ঝাঁকেই মিশে যাবে। ফেঁসে যাবে তারাই। কান্তবাবু সাবধান করে,

—একটু এদিক ওদিক মেরামত করে নিন দেওয়ানজী, দরকার হয় দু'চার জন খাতাঞ্জী বসিয়ে দিন। যো সো করে কাগজপত্র সেরে ফেলুক। ব্যাটারা যদি খাতাপত্র তলব করে দেখবেন হুলোটা বেমালুম আমাদের ঘাড়েই সব বদনাম চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়বে, তখন ?

দেওয়ানজীও তাই ভাবছেন—হেষ্টিংসকে বিশ্বাস নেই। ও সব পারে। কোথাও কোন সইসাবুদ লেখাপড়ায় সে নেই ; ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে সাহেব। নবকেষ্ট বলে ওঠে,

—দিনকতক তীর্থে যাব বলে মনে করছি।

—কেটে পড়ার তাল নাকি হে? কাশী, অযোধ্যা গিয়েও রেহাই পাবে না। সেখানেও হেষ্টিংসের চর সেপাই আছে। বুঝলে?

দেওয়ানজীর কথায় অপ্রস্তুতের মত হাসতে থাকে নবকেষ্ট—না, না।

হন্তদন্ত হয়ে হেষ্টিংসের খাস পেয়াদা পাতু কাহারকে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয় দেওয়ানজী। দুপুরের সময় সাহেব আহারাদি সেরে এক ছিলিম অম্বুরী তামাক টেনে একটু দিবানিদ্রা সারেন; এ সময়টা কোন কাজ এত্তেলা পাঠান হয় না। আজ সব নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে।

—সাহেব আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন দেওয়ানজী, এখুনি চলুন। হাঁফাচ্ছে পাতু।

—কি হল রে? এখুনিই? অবাক হয়ে যায় সকলেই।

—হবে আর কি? কাল থেকে সাহেব বেদম চেঁচাচ্ছে। মামাকে এক লাথি মেরে বসেছে, আবার দেখেন কিনা—

ওর পিঠে কয়েক ঘা চাবুকের দগদগে দাগ ফুটে রয়েছে।

পাতু বলে ওঠে—ই চাকরী আর করব নাই দেওয়ানজী, কাঁহাতক মেজাজ সইতে পারবো না। ঘরে পাঁচ বিঘে ধান জমি করেছি, তাই চাষ করবো আজ্ঞে, কাঁহাতক গোবেড়েন খাওয়া যায়—বলেন?

শিউরে ওঠে দেওয়ানজী; হেষ্টিংসের মেজাজ আজ বিগড়ে গেছে কোম্পানির নতুন কর্মব্যবস্থায়।

—সব সামলে-সুমলে নেন কান্তবাবু; ব্যাপার ভালো নয়। দেখি আবার কি আজ্ঞা হয়।

জাবেদাখাতায় মিহিবালি ছড়িয়ে কালি শুকাতে দিয়ে খাকের কলমটা নামিয়ে রেখে ইষ্টদেবতা স্মরণ করে পাতু কাহারকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেল দেওয়ানজী। সারা কাছারি তোশাখানায় একটা থমথমে ভাব।

মিঃ বারওয়েল, জেনারেল ক্লেভারিং, কর্নেল মনসন, মিঃ ফ্রান্সিস এসে পৌঁছেছেন কলকাতায়। দেশ ছেড়ে ভারতের নতুন উপনিবেশে এসেছেন তাঁরা। লণ্ডনে বসেই ভারতবর্ষের অবস্থা, কোম্পানির কর্মচারীদের কুকীর্তির কথা শুনেছেন কিছু কিছু। কর্নেল মনসন, জেনারেল ক্লেভারিং সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মচারী, নীতিবোধ তাঁদের আছে। বিদেশে এসেও তাঁরা ভোলেন নি সুসভ্য ইংরেজ তাঁরা, ভৌগোলিক সীমা এবং উপনিবেশের কানুনে তাঁদের

মনুষ্যত্ব বদলায় নি। কোম্পানির জেনারেল কোডে এবং প্যারাগ্রাফে তাঁদের প্রতি নির্দেশ এসেছে,

—We direct that you immediately cause the strictest inquiry to be made into all oppressions which may have been committed either against Natives or Europeans, and into all abuse that may have prevailed in their collection of the revenues or any part of the civil Govt. of the Presidency.

হেস্টিংস মনে মনে শিউরে উঠেছে, নিজেকে বাঁচতে হবে। সমস্ত অন্যায়-অবিচারের দায়িত্ব নেটিভ কর্মচারীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দরকার হয় নতুন প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিমকোর্টে তাদের বিচার করা হবে। ঘুম ছুটে গেছে তার; দুপুরের পচা গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। পায়চারি করছে ঘরময় পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত; তার হাত পা আজ অনেকখানি যেন আটকে ফেলেছে কোম্পানি।

দেওয়ানকে ঘরে ঢুকতে দেখেই চিৎকার করে ওঠে,

—খাতাপত্র সব রেডি করে দাও আজই, পাই টু পাই হিসেব চাই। জমিদারী বন্দোবস্তের পেশকাশ করেক্ট হাজির করো। মাই অর্ডার; নইলে সব অ্যারেস্ট করবো। ইউ রটন্ স্টাফ।

দেওয়ানজী ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, পাকাচুলে বুদ্ধিও পেকেছে। সাহেবের কথার ধরনেই বুঝতে পেরেছে, ভয় পেয়ে গেছে হেস্টিংস, নিজের দোষ এড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। স্থির কণ্ঠে বলে দেওয়ানজী,

—ঘাবড়াবেন না সাহেব। নিজের গা বাঁচাতে গিয়ে যদি সব দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপান তাতে আপনিও বাঁচবেন না, আমরাও একা বিপদে পড়ব না, প্রমাণ সাক্ষী সমেত সব কথাই ফাঁস হয়ে যাবে সেদিন।

হেস্টিংস জালেপড়া মাছের মত দাপাচ্ছে—হোয়াট!

হাসছে দেওয়ানজী,

—কলমি লতায় ঢাকা পুকুর দেখেছেন? ঘাটের এক দিককার লতা ধরে টান দিলে অন্য দিকের লতাও এসে হাজির হয়। একা বাঁচবার চেষ্টা করলে সুবিধা হবে না সাহেব। সবাইকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন।

কথাটা যেন অনুভব করতে পেরেছে সাহেব। একাই নিষ্কৃতি পাওয়া

সম্ভব নয়; এতদিনকার ক্লেদ জমে আছে। নেটিভের দেশে এসে হাতের কয়েকজনমাত্র মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত কর্মচারীকে চটানো ঠিক হবে না, হেষ্টিংসের জীবন মরণ সমস্যা, ওদের সাহায্য ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। একটু স্বর নরম হয়ে আসে সাহেবের।

—দেন সামথিং মাস্ট বি ডান দেওয়ান। যা হয় ব্যবস্থা করো।

—তাই বলুন সাহেব। সে সব হয়ে যাবে। গঙ্গাগোবিন্দ সিং অভয় দেয়।

—হাউ! সিট ডাউন। বসে কিছু পথ বাতলাও। বোর্ডের সাহেবদের প্রথমেই একটা জবাব দিতে হবে।

বৈকালের পড়ন্ত রোদ পশ্চিম আকাশে স্নিগ্ধ লালিমা এনেছে; দুপুরের ভাপসা গরম কেটে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া, ঝিলের বুকে হাঁসগুলো আবার ডাকতে শুরু করেছে। চারদিকে নেমে এসেছে জীবনের ছন্দ স্বর। দেওয়ানজীর কথাগুলো শুনে চলেছে হেষ্টিংস। যুক্তিপূর্ণ কথা। সব প্রশ্নের জবাবও মিলবে এবং বোর্ডের নজর এড়িয়েও ভবিষ্যতে কোথায় কি ভাবে কাজ চালান যাবে তারও ইঙ্গিত রয়েছে।

—আপনাকেই সব ভার হাতে নিতে হবে। সাহেবদের জানাতে হবে যে আপনি ওদের চেয়ে ঢের বেশি কাজের লোক; বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ওদের পরামর্শ নেবেন না। সর্বদাই অন্যরকম বুঝিয়ে ওদের অন্ধকারে রাখতে হবে।

কাঠিন্য কেটে গেছে হেষ্টিংসের মুখ থেকে; পথ দেখেছে সাহেব; তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার, সামান্য ইঙ্গিতেই পথের সন্ধান পেয়েছে। বাকিটা কল্পনা করে নেয়।

—তুমি বড় ক্লেভার আছ দেওয়ান। ভেরি সার্প ইনটেলিজেণ্ট।

—তুমিও কম নও সাহেব; দোষ যা তুমি আস্ত গোঁয়ার। এ সব করতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। এখনও জোয়ান বয়স, একটু বয়স বেশি হলে আমাকে সাতঘাটের জল খাওয়াতে পারবে তুমি।

নিজের প্রশংসায় হাসতে থাকে সাহেব; অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। বোর্ডের সাহেবদের মধ্যেও দু'একজনকে দলে ভিড়োবার চেষ্টা করতে হবে, সকলেই মনে হয় মহাপুরুষ নয়।

—ইউ গো দেওয়ান।

হেষ্টিংস একাই নির্জনে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে বালিশান দিতে থাকে। বিচার

রাজস্ব শাসন তিনটে বিভাগে নিজের হাতের লোক বসাতে হবে। কি যেন ভাবছে সে। পথের সন্ধান পেয়েছে।

বীণকার ওয়াজিদ আলি কয়েক বৎসর পথে পথে ঘুরেছে; পরিক্রমা করেছে দেশ-দেশান্তরের তীর্থ; আজমীরের দরগা শরীফের মসজিদে নেওয়াজ পড়েছে, দূর দুর্গম মক্কাশরীফ, পুণ্যভূমি কাবায় গেছে; জমজমের পানি ছিটিয়েছে সারাদেহে; উষর মরু-প্রান্তরে উটের কারোঁয়ায় বসে দেখেছে পশ্চিম আকাশ ছেয়ে রঙের তুফান; শত দৃশ্য, শত সহস্র স্মৃতির রঙ্গে রঙ্গীন কতদিন; শত কাজের ফাঁকেও বালুস্তরের পাশে জাগর রাত্রির প্রহরে মনে পড়েছে মণিবেগমকে। তার ডাগর দুচোখের চাহনি যেন অহরহ চেয়ে রয়েছে, ঘিরে রেখেছে তাকে। যতদূরই যাবার চেষ্টা করেছে, ততই মনে হয় নিবিড়তর করে পেয়েছে তাকে। তারাজ্বলা প্রান্তরে, ভোরের নেওয়াজে দোওয়া মেনেছে।

—আমাকে বেভুল বেহুঁশ করে দাও খোদা!

তবু ভুলতে পারে নি ওয়াজিদ মণিবেগমকে, মুর্শিদাবাদকে।

তাই হয়তো তীর্থ পরিক্রমা সেরে আবার ফিরে এসেছে মুর্শিদাবাদের চক-মসজিদে। মণিবেগম তার কথা রেখেছিল; সইফুদ্দৌলার পুণ্যাহের সময় একটি সন্ধ্যার অন্ধকারে ওয়াজিদ বলেছিল,

—একটু ঠাঁই দিতে পারো বেগম? একটি ছোট নির্জন মসজিদ বানিয়ে দিও মেহেরবানি করে।

বেগম চকমসজিদ গড়ে দিয়েছে ওয়াজিদকেই। দেওয়ান দরবেশ বীণকার মাঝে মাঝে দুদিন তার পথচলার ফাঁকে সেখানে এসে জিরিয়ে নেয়, আবার পথে নামে। মসজিদের বুড়ো ইমাম বলে,

—এ যে তোমার সরাইখানা বীণকার। এক সন্ধ্যার আঁধারে আসো আবার ফজিরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে উধাও হও।

হাসে বীণকার—তামাম দুনিয়াই তো সরাইখানা ইমাম। তুমি, আমি সবাই তো দুদিনের রাহী মেহমান; তারপর কে কোথায় যাবো কেউ জানি না।

এবার বীণকার ফিরে এসে অবাক হয়ে গেছে। মনে হয় এখানে না

ফিরলেই ছিল ভালো। মুর্শিদাবাদ যেন ক্রমশ জাহান্নামের পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে। মণিবেগম বদলে গেছে।

কয়েক বৎসর পর দেখছে মণিবেগমকে। প্রথম দৃষ্টিতেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এ অন্য কোন নারী, সারা মনের ক্লেদ কলুষ ফুটে উঠেছে ওর মুখের মসৃণ চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে। চোখের চাহনিতে এসেছে অন্তরের নীচতার কালো ম্লানিমা, সেই দীপ্তি আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। নিস্পৃহ মুসাফিরের চোখে এই হাতাশা পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে।

মণিবেগমও ওকে দেখে অবাক হয়ে যায়,

—বহু তীর্থ ঘুরে এসেছ, মক্কা মদিনায় গিয়ে চেহারা যে বসরাই গুলাবের মত করে তুলেছ বীণকার।

কণ্ঠস্বরে কেমন জড়তা। গালিচার উপর ছড়ানো ফুলদল, জুতোর চাপে কে যেন পিষে দলে গেছে, ওদিকে কাত হয়ে পড়ে আছে দুটো পানপাত্র, খানিকটা তাজা রক্তলাল শরাব গড়িয়ে পড়েছে মার্বেলের শ্বেতশুভ্র মেজেতে, মণিবেগমের গাল ও চোখের নীচে ভাজ পড়েছে; কিসের জন্য তা ভাল করেই জানে ওয়াজিদ বীণকার—বহুকালের পুরানো ভূতপূর্ব সারেঙ্গীদার। জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠে মণিবেগম,

—গভর্নর সাহেবও বলে আমি নাকি বসরাই গুলাবের মত খুবসুরত; তুমি তো আসলি গুলাব দেখে এসেছ, সাচ বাত বলো দিকি বীণকার?

বংলার মসনদের পর্দানসীন বেগম আজ বিদেশী ইংরেজ বণিকের অঙ্কশায়িনী।

বালকুণ্ডার ঝুপড়ি থেকে এগিয়ে এসে বাঁদী আজ বেগম হয়েছে। জীবন নাট্যের এতগুলো চমকপ্রদ অঙ্কের নীরব দর্শক ওই বীণকার।

—এ জীবন এখনও ভাল লাগে মণি? বীণকার বলে ওঠে।

হঠাৎ হাসির বাঁধভাঙ্গা ঝলকে গড়িয়ে পড়ে মণিবেগম, হাসচে। দোল খাচ্ছে ওর বুক, ওর সুগৌর কণ্ঠদেশের মোতির শ্বেতবর্ণ মালা, গায়ের মসলিন উড়নি খুলে পড়ে আলতোভাবে। ওর উদ্দাম লাস্যময়ী রূপের সামনে দাঁড়াতে কেমন যেন কুণ্ঠাবোধ করে দরবেশ। মণি জবাব দেয়,

—জীবনে অন্য কোন পথ পাই নি বীণকার; এই স্রোতেই গা ভাসিয়েছি। তোমাদের জন্য খোদার বেহেস্ত আছে। জাহান্নামে যাবার লোকও তো চাই বীণকার; নইলে খোদার গড়া জাহান্নাম যে বরবাদী হয়ে যাবে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসছে। অন্ধকার নিথর রাত্রি। কাঁপছে তারার রোশনী, সানাইয়ে ললিত রাগিণী কোমল পর্দাগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছে, গঙ্গার জলস্রোত অসীম দিগন্তের দিকে বয়ে চলেছে, মণিবেগম ওর দিকে চাইল ; স্থির দৃষ্টি পড়েছে বীণকারের মুখের উপর।

আমাকে ঘৃণা কর আজ বীণকার? তোমার দৃষ্টিতে তা ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ পথের সন্ধান কে আমাকে দিয়েছে বলো তো?

একটু চমকে ওঠে বীণকার ; মণি কি যেন সত্য কথা আজ বলছে। এ কণ্ঠস্বর তার অত্যন্ত পরিচিত, বেগম মণিবাঈ নয়, বালকুণ্ডার সরল সহজ মেয়েটির পুনর্জন্ম ঘটেছে ওর মনে ক্ষণিকের জন্য। বলে চলেছে মণি,

—তুমি! তুমিই প্রথম আমাকে নবাবী দরবারে 'পেশকার' নাচের নেশা ধরিয়েছিলে ; ব্যারা উৎসবের রাতে যেদিন প্রথম মুর্শিদাবাদে ঢুকি তুমিই বেগমের তাঞ্জাম দেখিয়ে আমায় লুব্ধ করেছিলে। যদি এ পথে কোন পাপ, কোন গুণাহ্ হয়ে থাকে তার জন্য কি তুমিও দায়ী নও বীণকার? নিজের পথে তুমি দূরে সরে গেলে আমাকে এই বিলাসব্যসনের মসনদে বসিয়ে। আজ এসেছ মণিবেগম জাহান্নামের কতদূর অতলে তলিয়েছে তারই হিসাব করতে? বেশ্ থ্।

অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে বীণকার, এ অভিযোগের উত্তর দেবার ভাষা তার জানা নেই।

হয়তো ওর কথার মধ্যে সত্য কিছু আছে। মণিবেগমের সমস্ত বাহ্যিক আবরণ ছাড়িয়ে তাই হয়তো মনে এই সুর আবার ফিরে ফিরে বাজে।

—মসনদে বসা সিংহের উপর বসারই সামিল বীণকার ; যতক্ষণ তুমি তার উপরে থাকবে সে তোমারই হুকুম তামিল করবে। যে মুহূর্তে তুমি ছিটকে পড়বে তার উপর থেকে নীচে, সেই মুহূর্তেই সে তোমাকে নিঃশেষ করে দেবে। আমারও নীচে নামবার আর উপায় নেই, বরবাদী জীবনের বাকি ক'টা দিন আত্মরক্ষার জন্য এই পথেই এই স্রোতেই খড়কুটোর মত ভেসে যেতে হবে।

বীণকার চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মণির নীরব কান্নার অস্ফুট আর্তনাদ তখনও কানে ভাসছে তার। মণি উঠে দাঁড়াল,

—যাও, রাত হয়েছে বীণকার। তুমি খোদার মেহেরবানি পেয়েছো, যদি পারো তবে আমার জন্য তাঁর কাছে দোওয়া পেড়ো ; তোমার খোদাকে ডাকবার সময় আমার তো নেই।

ওয়াজিদ বীণকার চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে। মণি কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন, বীণকার সরে এল।

দখলমে বার বার ডাকছে হীরামন, কোকিলগুলো। আঙ্গুরীবাগে রাতের বাতাস সোঁ সোঁ শব্দ তুলেছে।

চাঁদ উঠেছে মধ্যরাত্রির পর; মলিন পাণ্ডুর চাঁদ! এক ঝলক আলোয় এনেছে রাত্রি শেষের বিষণ্ণ স্তব্ধতা। মণিবেগম একাই বসে আছে। নিষ্কম্প দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে সেজের আলোর চারপাশে ক্লান্ত একটা পতঙ্গের সর্বনাশা মিলন প্রয়াস। ওয়াজিদ অনেক আগেই চলে গেছে।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ কানে আসে; কে যেন কাঁদছে। বাঁদী মনিবানের ডাকে এসে সামনে দাঁড়াল। প্রশ্ন করে মণিবেগম,

—কে কাঁদছে এত রাত্রে?

—নবাবজাদার খাস বাঁদী, রোশনবাঈ।

উঠে দাঁড়াল মণিবেগম; জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে মবারক। তরুণ কিশোর বাঘের মত শ্বাপদ লালসা নিয়ে মেতে উঠেছে। মণিবেগম শিউরে ওঠে; মবারকের মনের পশুত্বকে সেই-ই জাগিয়ে তুলেছে তিলে তিলে, নিজের হাতের মধ্যে রাখবার জন্য। মবারক আজ সমস্ত সীমা যেন ছাড়িয়ে গেছে।

—বাঁদীকে মদ দিতে বল, যত পারে খাক আর বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকুক ওই হতভাগা মবারক, বুঝলি!

মণিবেগম আবার বদলে উঠেছে। ক্ষণিকের জন্য যে চিরন্তন নারীত্ব আজ জেগে উঠেছিল তাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে চায় বেগম। একদিকে হেষ্টিংস—অন্যদিকে মবারকউদ্দৌলা; দুই পশু নিয়ে বাজি মাত করতে হবে তাকে, কোন দুর্বলতার ঠাঁই এখানে নেই।

প্রথম সূর্যকিরণ গঙ্গার বুকে এনেছে নবজীবনের অফুরান প্রবাহ; নদী তীরের গাছগাছালির মাথায় প্রথম দিনের বন্দনা অর্ঘ্য রচনা করেছে। পাখিগুলো সুর তুলেছে সমবেত কণ্ঠে। আবক্ষ গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি-পুটে সূর্য অর্ঘ্য নিবেদন করছেন মহারাজ নন্দকুমার। এ তাঁর জীবনের দৈনন্দিন কাজ।

মেয়েদের ঘাট থেকে স্নান সেরে উঠে এসেছে মায়া। সারাদেহে তার অসীম শূন্যতা। শীকরকণা ওর চোখের পাতায় মুখে এনেছে স্নিগ্ধ শান্ত

যুঁই ফুলের সকরুণ নিবেদনের আকুতি। ইতাবর খাঁয়ের মৃত্যুর পর থেকে মায়া সাদা থান পরতে শুরু করেছে, হাতেও বলয় কঙ্কন কিছু নেই। মহারাজ বাধা দেন নি, ধর্মান্তরিত হলেও স্বামী স্ত্রীর পরিচয় একটু ছিল—তার অবর্তমানে মায়া বৈধব্য মেনে নিয়েছে বেশভূষাতেও; প্রাত্যহিক গঙ্গাস্নানে সেও মহারাজের সঙ্গে আসে।

—চলো মা।

—হ্যাঁ বাবা।

মহারাজ তাকে নতুন এক স্নেহের বশে কন্যার মতই দেখেন; মনে মনে মেয়েটিকে শ্রদ্ধা না করে পারেন নি। ইতাবর খাঁ তাকে হত্যা করতোই, মায়া সে কাজে বাধা দিয়েছে এই কৃতজ্ঞতার জন্য শুধু নয়; মায়ার অন্তরের আসল পরিচয় পেয়েছেন। মায়া তার যথাসর্বস্বের চেয়ে ধর্মকেই বড় করে দেখেছে; তারই জন্য এতবড় আত্মত্যাগ করতে পেরেছে।

রাণী ভবানী ওকে বলেন—চলো মা, কাশীর বাড়িতে থাকবে তুমি।

রাজি হয়নি মায়া, জবাব দেয়,

—বাবা মা যতদিন আছেন ততদিন তাঁদের কাছেই থাকি; কাশী তো জীবনের পরম চরম লক্ষ্য বলে তোলা আছে রাণীমা।

রাণী ভবানীও তাকে দেখেছেন, শুনেছেন তার কাহিনী। নন্দকুমারের সংসারে মেয়ের আদরেই আছে মায়া।

নন্দকুমার ওর শাসনে ব্যতিব্যস্ত—বুড়ো ছেলেকে তুমি যে অস্থির করে তুল্লে মা!

—আপনি বড় অনিয়ম করেন বাবা। নাবান্ন-খাবার সময় নেই, এত কি কাজ?

হাসেন মহারাজ।

ক'দিন থেকে কাজ বেড়েছে। হেস্টিংস এসেছে মুর্শিদাবাদে; কোম্পানির আপিস, কাঠামো বদলে যাচ্ছে; বেশ প্রত্যক্ষ করেছেন মহারাজ হেস্টিংস ভয় পেয়ে গেছে, তার একচ্ছত্রাধিপত্য আর চলবে না।

সুপ্রিম কোর্ট বসেছে কলকাতায়, কোম্পানি বাংলায় পাকাপাকি ভাবে কায়েমী শাসনব্যবস্থা এনেছে এবং সমস্ত ক্ষমতা একা হেস্টিংসের হাতে আর নেই; বোর্ডের সামনে তাকে প্রয়োজন বোধে কৈফিয়ত দিতে হবে। পিছনের সমস্ত গলদ তাই দূর করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সাহেব।

নিজামতে সেদিনই এসেছিল মহারাজের কাছে। রেজা খাঁ-ও ফিরে এসেছে কলকাতা থেকে। সেই কথাটাই জানিয়ে দেয় সাহেব মহারাজকে, প্রকারান্তরে।

—আপনার খাতাপত্র ঠিক রাখবেন মহারাজ।

হেস্টিংস যেন সাবধান করছে মহারাজকে। ওর দিকে চেয়ে থাকেন মহারাজ, দীর্ঘ বহু বৎসরের ইতিহাস দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছে, মীরজাফরের আমলে কাশিমবাজার কুঠিতে সমস্ত রাজস্ব জমা দেবার হুকুম মানেন নি মহারাজ। অগ্রাহ্য করেছিলেন তাকে, কলকাতায় ক্লাইভের সামনে অপদস্থ করেছিলেন একবার হেস্টিংসের কোন কথার জবাব না দিয়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অত্যাচারী হেস্টিংসের ঘরের কড়িকাঠে ঝুলন্ত সেই নারী-মূর্তি। পিটারসন কমিশনের রিপোর্ট বানচাল করেছে ওই মিথ্যাবাদী ইংরেজ। আজ আবার কোনও উদ্দেশ্যে এসেছে নিশ্চয়। জবাব দেন মহারাজ,

—সমস্তই ঠিক আছে।

—নিজামতের বাজে খরচ খাতে যে কয়েক লক্ষ টাকা লেখা আছে? হেস্টিংসের কথার মর্মার্থ এইবার বুঝতে পেরেছেন মহারাজ। বাজে খরচ খাতে লক্ষ লক্ষ টাকাই কোম্পানির সাহেবদের হাতে গেছে পিছন দরজা দিয়ে; সেদিনও মণিবেগম হেস্টিংস এবং মিডলটনের আতিথ্য বাবদ এক লাখ ছেচল্লিশ হাজার টাকা খরচ করেছে। সেগুলোও মুছে ফেলা প্রয়োজন। হেস্টিংস তারই জন্য ইঙ্গিত করছে। মহারাজ বাতাসে কিসের গন্ধ টের পেয়েছেন। বলে ওঠেন,

—এত টাকার খরচ চাপা দেওয়া অসম্ভব।

রুষ্ট হয়ে উঠেছে হেস্টিংস—অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। মিঃ মিডলটন!

মিডলটন মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট, হেস্টিংসের বিশ্বস্ত কর্মচারীদের অন্যতম। সেও বলে ওঠে,

—ইয়েস স্যার, ভেরি ইজি। মহারাজ যদি না পারেন উই ক্যান টেক হেল্প অব রেজা খাঁ।

চমকে ওঠেন মহারাজ। হেস্টিংসের মনের কথাও ফাঁস হয়ে গেছে দেখে হেস্টিংসও অপ্রতিভ হয়, সামলে নেয় পরক্ষণেই।

—তা হয় না মিডলটন, মহারাজ মাস্ট ডু দিস।

কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠেন মহারাজ—আমায় দিয়ে ও-কাজ হবে না সাহেব, যে পারবে তাকেই ডাক।

হেস্টিংস রুদ্ধ-মুখ আগ্নেয়গিরির মত বসে আছে, মহারাজ আজ নিজামতের বহু গুহ্য গোপন খবর জানে, তাকে চটানো নিরাপদ নয়। কিন্তু ওর কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য পাওয়া যাবে না ; উলটে বিরুদ্ধাচরণই করবে ওই ব্রাহ্মণ। জীবন্ত বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক অগ্নিগর্ভ ওই মানুষটি। দুজনেই দুজনকে চেনে, কেউ কাকেও এড়িয়ে যেতে চায় না।

—ওয়েল।

মহারাজ হেস্টিংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। একটা নীরব যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে দুজনের মধ্যে।

দুর্নীতির প্রকাশ পথ বন্ধ করতে হবে। চারদিক ছেয়ে অন্ধকার আসছে। সদর-উল-হকের এতবড় স্পর্ধা সম্ভব নয় ; পিছনে অন্য কোন লোক আছে।

হেস্টিংস বিশ্বাস করেছে মহারাজ নন্দকুমারই সাহস দিয়েছে সদর-উল-হককে প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে এই দুর্নীতির।

—ইট মুড বি স্টপড্ মিডলটন। পোড়া সিগারেটটা জুতো দিয়ে টিপে আগুন নিভিয়ে দেয় সাহেব।

জগৎচাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা পড়েছে। কোম্পানির লোকজন তাকে ঠিক বিশ্বাসের চোখে দেখে না, পিক্র সাহেবও কেমন মালপত্র যোগান দিচ্ছে কোম্পানির গুদামে ; অথচ শ্বশুরমশায়ও জগৎচাঁদকে কেমন অবিশ্বাসের চোখে দেখেন, ওর দুদিকেই বিপদ। মহারাজ নন্দকুমারের জামাই হয়ে মস্ত পাপ করেছে সে। টাকা খাটাবার সঙ্গী হিসেবে এসে জুটেছে মোহনপ্রসাদ !

বুলাকীদাসের গদির চালু কারবার এখন ধ্বসে পড়েছে। মহারাজ নন্দকুমারের বহুদিনের প্রিয় বুলাকীদাস ; নানাভাবে মহারাজ তাকে সাহায্য করেছিলেন, বুলাকীও তার প্রতিদান দেবার চেষ্টা করেছে।

মহারাজ তাঁর একছড়া মুক্তার মালা, একখানি কল্কা, একটি শিরপেঁচ, চারটি হীরার অঙ্গুরী ওকে বিক্রি করতে দেন. সাকুল্যে তার দাম স্থির হয় ৪৮০২১৲। কিন্তু কিছুদিন পরই বুলাকীদাসের গদি লুঠ হয়ে যায়, নিঃস্ব বুলাকীদাস আবার নিজের সততায় ব্যবসা করে বড় হয়ে ওঠে, সমস্ত টাকা পরিশোধ করবার মত অবস্থা বুলাকীদাসের তখনও হয় নি, বুলাকীদাস ওই মেগ্দার টাকার একটা অঙ্গীকারপত্র লিখে দেয় মহারাজকে।

মহারাজও তাগাদা দেননি ও টাকার, বলেছিলেন,

—ও-টাকা যেদিন সম্ভব হয় দেবেন শেঠজী।

এইভাবেই ঋণটা ছিল। শেঠ বুলাকীদাস মৃত্যুকালেও তার ওয়ারিশান-দের ওই ঋণ পরিশোধ করতে বলে যায়; ক্রমশ মহারাজ তার ওয়ারিশানদের কাছ থেকে ওই টাকা পেয়ে দলিলও ফিরিয়ে দেন।

কয়েক বৎসর গত হয়ে গেছে, ওটা নেহাত চাপা-পড়া ঘটনাতে পরিণত হয়েছে। বুলাকীদাসের ওয়ারিশান পদ্মমোহনও গত—এস্টেট চালাচ্ছে পদ্মমোহনের বিধবা স্ত্রীর আমমোক্তার মোহনপ্রসাদ; পূর্বেকার পরিচিতি থেকে জগৎচাঁদও এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিল, মোহনপ্রসাদও তার বন্ধুস্থানীয়। বর্তমানে মোহনপ্রসাদ নিষ্কর্মা, শয়তানী বুদ্ধি পাকিয়ে জগৎ-চাঁদকে দলে ভিড়িয়ে সে ব্যবসায় নামতে চলেছে। সন্ধানটা মোহনপ্রসাদই দেয়।

—কোম্পানি নুনের কারবার করছে, গুদামও রয়েছে তোমার, রাখী কারবার করা যাক দুজনে মিলে।

টাকাকড়ি দেবার সামর্থ্য তার নেই। ধ্বসে-পড়া এস্টেটের নামেই আমমোক্তার, পয়সাকড়ি আমদানি নেই। নামেই তালপুকুর, ঘটি ডোবে না।

এতে দিন চলে কি করে, শেষে মৌজা বিক্রি করে কয়েক বৎসর আগে মহারাজ নন্দকুমারের ঋণ শোধ করেছে, সেই মৌজাটা থাকলেও যা হয় কিছু আসত। সে গুড়েও বালি। কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারে না মোহনপ্রসাদ।

তবে করিতকর্মা লোক জগৎচাঁদ সেইজন্য হাত মিলিয়েছে তার সঙ্গে।

ভেবে চিন্তে ওরা শেষতক মিডলটন সাহেবকেই মুরুব্বি পাকড়ায়। চক-বাজারের লোকের মুখে মুখে তখন ছড়িয়ে পড়েছে মহারাজ এবং কোম্পানির সাহেবদের মধ্যে মন কষাকষির সংবাদ। রেজা খাঁ হয়ত আবার নিজামতে যাচ্ছে।

একদল লোক আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ইয়ার জঙ্গ তাদের অন্যতম। পিক্র সাহেবও তিনখানা ব্রুহাম গাড়ি কিনেছে; একখানা ইতিমধ্যেই রেজা খাঁকে ভেট পাঠিয়েছে। ধূর্ত মোহনপ্রসাদও তার কর্মপন্থা ঠিক করে নিয়েছে।

মিডলটন ওর কথাবার্তার মধ্যে কিসের সন্ধান পায়।

—আজ বিকালে কুঠিতে আসবে তোমরা দুজনেই।

মোহনপ্রসাদ আর জগৎচাঁদ দুজনেই স্বপ্ন দেখছে।

হেস্টিংস প্রথমে পাত্তাই দিতে চায় নি ওদের।

—কিছুই হবে না মিডলটন, ক্যান ইউ বিলিভ দেম ?

—হ্যাঁ স্যার; মোহনপ্রসাদ চালাক চতুর লোক। মহারাজের উপর খুব চটা, মোহনপ্রসাদ বলে, নন্দকুমার নাকি ভুয়ো দলিল দেখিয়ে ওদের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে ৪৮০২১৲ টাকা নিয়েছে।

—ইয়েস।

হেস্টিংসের পাইপ টানা থেমে যায়, দেওয়ালে কোথায় একটা টিকটিকি শব্দ করে, নীরবতা ভেদ করে শোনা যায় সেই ক্ষীণ শব্দটুকু।

চমকে ওঠে ধূর্ত ইংরেজ। চোখের সামনে সমস্ত সমস্যা এক লহমার মধ্যে সমাধান হয়ে যায়। প্রমাণ করাতে হবে নন্দকুমার জালিয়াত—চিট। ইংরেজ আইনে ফোর্জারির কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান দেখতে পায় সে। কিন্তু ওই মোহনপ্রসাদের সঙ্গে রয়েছে জগৎচাঁদ, নন্দকুমারের জামাই। ঠিক ব্যাপারটা গোলমাল ঠেকে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চায় হেস্টিংস। দেখাই যাক কতদূরে জল গড়ায়; হাতে রাখতে হবে ওদের। উত্তেজনা চেপে রেখে বলে ওঠে সাহেব,

—কল দেম মিডলটন।

মোহনপ্রসাদ, জগৎচাঁদ এসে সাহেবকে আভূমি নত হয়ে সেলাম করল; হেস্টিংস তির্যকদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাদের পানে। চেহারায় অত্যাচারের ছাপ, চোখের দৃষ্টিতে কুটিল মনের প্রতিবিম্ব! হ্যাঁ, তার কাজে আসবে ওরা। কাছে এসে সন্ধানীদৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে,

—দুলাখ টাকার কাজ দিলে তুলতে পারবে ?

মোহনপ্রসাদের নিজের মূলধন তত নেই, ভরসা ওই জগৎচাঁদ। জগৎ-চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে সে আশাভরে।

জগৎচাঁদ বেপরোয়া ভাবে জবাব দেয়—ইয়েস স্যার।

মোহনপ্রসাদ কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পায় না; হেস্টিংস ওদের সামনে ধরাছোঁয়া দিতে চায় না; কঠিন স্বরেই বলে,

—ইউ মাস্ট বি ফেইথফুল টু দি কোম্পানি। ইউ মাস্ট বি অনেস্ট। আই লাইক অনেস্টি। দিস ইজ আওয়ার মটো।

সাধুতা, সততাই কোম্পানির মূল মন্ত্র; হেস্টিংসও তার ধারক এবং বাহক। মিডলটন ওদের অফিসের দিকে নিয়ে চলে।

অন্তরালে হেস্টিংস সাবধান করে দেয়,

—ওদের উপর কড়া নজর রাখো মিডলটন। স্পেশ্যালি অন ছ্যাট্ মোহন-প্রসাদ। আই ওয়াণ্ট ছ্যাট ম্যান।

উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারে না মিডলটন। তবে গূঢ় কোন তথ্যের সন্ধান যে পেয়েছে সাহেব তা অনুমান করে। নইলে এক কথায় কাউকে এতবড় কাজ বিনা নজরানায় দিতে দেখেনি হেস্টিংসকে। মিডলটনের মাথা এত পরিষ্কার নয়।

কোম্পানির সাহেবদের কাছে খাতির পয়সা পাচ্ছে। জগৎচাঁদ বেশ খুশি হয়ে উঠেছে। জুড়ি হাঁকিয়ে জগৎচাঁদ বহুদিন পর নন্দকুমারের বাড়ি এসেছে। ভিতরে ঢুকে মায়াকে দেখে দাঁড়াল; মায়া যেন একটু বিব্রত বোধ করে; জগৎচাঁদ হাসছে; ওর মুখের দিকে চাইতে পারে না মায়া; কেমন ভয় করে। ইয়ার জঙ্গের মত শয়তানির ছাপ মাখানো রয়েছে ওতে। কুটিল নিষ্ঠুর হাসি।

—সম্পর্কে তুমি আমার স্ত্রীর ছোট বোন। একটু রসিকতা না হয় করলামই? ওকে কেমন যেন সহ্য করতে পারে না মায়া। বীভৎস ওর চাহনি।

ভয়জড়িত কণ্ঠে বলে মায়া—উপরে চলুন, মা অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।

জগৎচাঁদ ওকে একা দেখে এগিয়ে যায়—মায়ের সঙ্গে দেখা করাটাই খুব বড় নয়, বুঝলে! তুমি তো একদিন সৈদাবাদে যেতে পারতে। সত্যি বলছি!

—একি! মায়া শিউরে ওঠে। জগৎচাঁদের চোখে নেশা লেগেছে। ইয়ার জঙ্গ, মোহনপ্রসাদের কথাই সত্যি! এত রূপ জীবনে সে চোখে দেখেনি, যেন বেহুঁশ করে দেয় তাকে। মায়ার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, কাঁপছে মায়া। নির্জন ঘরে একা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে।

হঠাৎ খড়মের শব্দটা এসে দরজার কাছেই থেমে গেল, মায়া নিষ্কৃতি পেয়ে সহজ হয়ে ওঠে; জগৎচাঁদের চোখে মুখে থমথমে একটা চাপা উত্তেজনা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহারাজ জগৎচাঁদের দিকে চেয়ে থাকেন। মহারাজ নন্দকুমার জগৎচাঁদের স্বরূপ চেনেন। ওর বন্ধু-বান্ধবদেরও জানেন ভালো করে। আজ যে দৃশ্য অভিনীত হতে যাচ্ছিল কল্পনা করতেও তিনি শিউরে ওঠেন লজ্জায় ঘৃণায়।

—তুমি ভিতরে যাও মা।

মায়াকে সরিয়ে দিয়ে মহারাজ ওর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। ওঁর তীব্র দৃষ্টির সামনে মাথা নীচু করে জগৎচাঁদ।

ও কথা এড়িয়ে গিয়ে নতুন পথে চলেন মহারাজ—ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্য করছ খবর পেলাম। কিন্তু এ বাড়িতে যাতায়াত আছে শুনলে তোমার ব্যবসার পক্ষে ক্ষতিই হবে জগৎ, আসা-যাওয়া আপাতত এখানে না করাই মঙ্গল, নিরাপদ। বুঝলে?

অর্থাৎ সোজা কথায় তাকে চলে যেতেই বলা হচ্ছে বাড়ি থেকে। জামাইয়ের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগে; জগৎচাঁদ রেগে উঠেছে। কি যেন বলতে গিয়েও পারল না। নিষ্ফল আক্রোশে জবাব দেয়—আচ্ছা।

তেড়েফুঁড়ে বের হয়ে গেল সে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মহারাজ; স্ত্রীর কথায় ফিরে চাইলেন।

—কাজটা ভালো করলে ঘরের ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়ে?

স্থির কঠিন কণ্ঠে জবাব দেন তিনি—যা ভাল বুঝেছি ঠিক তাই করেছি। এ ছাড়া পথ ছিল না।

স্বামীর কথার উপর কোন দিনই কথা বলেন নি তিনি।

আজ যেন না বলে থাকতে পারেন না। চারদিকে শত্রুর সংখ্যা বাড়ছে। এক কথায় চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এসেছেন। এ সব যেন ঠিক মেনে নিতে পারেন নি তিনি। স্ত্রীও ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছেন।

—আজকাল তোমার যেন সবতাতেই বাড়াবাড়ি।

কথা কইলেন না মহারাজ, স্ত্রীর দিকে বিরক্তিভরা চাহনিতে চাইলেন। গুরুদাসও এসে পড়েছে। মায়ের কথাগুলো কানে গেছে তার; বাবার এই সিদ্ধান্ত ঠিক অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে পারে নি সেও; নিজামত, বেগমসাহেবা, স্বয়ং হেস্টিংসের বিরুদ্ধে যেতে সাহস পান কোত্থেকে আজও বুঝতে পারে নি গুরুদাস। ছেলেকে আসতে দেখে মহারাজ বলে ওঠেন,

—তুমি কিছু বলবে গুরুদাস?

বাবার ব্যক্তিত্বের সামনে কোনদিনই কোন অভিযোগ করতে পারেনি গুরুদাস। নিজে এখনও সে নবাব এস্টেটের চিফ্ স্টুয়ার্ট; আরও উন্নতির আশা রাখে; বেগম সেদিন কথা দিয়েছে তাকে 'রাজগৌড়পৎ' উপাধি দেবার জন্য সুপারিশ করেছে হেস্টিংসকে। অর্থাৎ উন্নতি তার হবেই। বাবার এই ব্যবহারগুলো ঠিক মেনে নিতে পারে নি সে।

—আপনি যেন কোথায় ভুল করছেন বাবা! গুরুদাস বলে।

—ভুল! ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে তাঁর। এতবড় কথা গুরুদাস এত সহজেই বলতে পারবে কল্পনা করেন নি মহারাজ।

সারা মনের চাঞ্চল্য চেপে ধীর ভাবে বলেন তিনি,

—আমি ভুল করেছি না ঠিক করেছি তার বিচার সারা বাংলার আগামী কালের মানুষ করবে গুরুদাস। কালের দৃষ্টিতে সত্যমিথ্যা যাচাই হবে। এত বড় অন্যায়, এত রাশি রাশি অবিচার অত্যাচার কেমন করে সহ্য করি বল? অত্যাচারী ইংরেজের এই দুর্নীতির কোন প্রতিবাদই হবে না? একটি কণ্ঠও কি ধ্বনিত হবে না ওদের বিরুদ্ধে?

গুরুদাস বাবার উত্তেজিত মূর্তির সামনে কোন কথা বলল না।

বুব্বু বেগম, জিয়াৎরাম জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে, মসনদে তার পর্দানসীন বেগমের দাবী কেউ কানে তোলে নি। বাৎসরিক মাত্র সাত হাজার টাকা বৃত্তি নিয়েই চুপ করে থাকতে হয়েছে তাকে। তাতেও দুঃখ ছিল না, কিন্তু তার একমাত্র সন্তানকে মণিবেগম নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নরকের অতলে তলিয়ে দিচ্ছে, এই যন্ত্রণায় মায়ের মন কুঁকড়ে ওঠে। সবই সংবাদ পায় কিছু কিছু। দিনরাত সে এখন ওই বিবিমহলেই পড়ে রয়েছে, নয়তো মদের নেশায় বেঘোর হয়ে থাকে। বেসরম বেবশ বেকুফ মবারক। বুব্বু বেগমের সঙ্গে দেখা করতেও তার মানা।

সেদিন অনেক চেষ্টা করে বুব্বু বেগম দেখা পেয়েছে মবারকের। মহলের একপ্রান্তে গোলাপ বাগিচায় মার্বেল বাঁধানো দখলমে বসে আছে সে; কে যেন গান গাইছে; চারদিকে ছড়ানো কয়েকটা পানপাত্র; হাসির শব্দে বাগিচা কাঁপিয়ে তুলেছে মবারক; বাঁদীগুলোও হাসছে নির্লজ্জ কদর্য ভঙ্গীতে। শিউরে ওঠে বুব্বু। এই দৃশ্য বুব্বু বেগম জীবনে কল্পনাও করেনি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওপাশে। মীরজাফরের কথাগুলো মনে পড়ে। বাংলার মসনদ রক্তমাখানো অভিশপ্ত, ওখানে যে বসবে সেই অতলে তলিয়ে যাবে নিঃশেষে। সিরাজ গেছে, মীরকাশিম, মীরজাফর, নিজামদ্দৌলা, সইফুদ্দৌলা গেছে তারই চোখের উপর; এইবার পালা পড়েছে তারই আপন সন্তান মবারকের। শিউরে ওঠে মায়ের অন্তর! চোখের উপর প্রত্যক্ষ দেখতে পায় সর্বনাশের কালোছায়া।

জিয়াৎরাম ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করে—মগুপ অবস্থায় ওর সামনে না যাওয়াই ভালো ভাবীসাহেবা।

—ওকে কখন সুস্থ অবস্থায় পাবো বলুন ?

জোর করে এগিয়ে গেল বুব্বু বেগম ; মণিবাঈ আজও তার উপর এমনি করে তিলে তিলে শোধ নিয়ে চলেছে আগেকার অত্যাচারের। বিন্দুমাত্র কশুরও মাপ করেনি। ষোল আনা ওয়াশীল করে নিয়েছে।

—মবারক! আর্তনাদ করে ওঠে বুব্বু বেগম।

চমকে ওঠে মবারক, নেশার ঘোর ঠিক কাটেনি। দুচোখে জড়তা। সেই অবস্থাতেই বলে ওঠে মবারক,

—তুমি আবার কে এলে এ সময় ? এগিয়ে এসো দেখি কেমন গুলাব তুমি। গুলাব বাগিচার সবই তো গুলাব।

চমকে ওঠে বুব্বু! এই মগুপ জানোয়ারটা তারই সন্তান! নিজের উপরই অনুশোচনা আসে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে বুব্বু।

—এতদূর অধঃপতনে গেছো বেয়াদপ। মায়ের ইজ্জৎ রাখতে জানো না ?

উঠে দাঁড়ালো মবারক ; বেশ আমেজে ডুবেছিল, সব যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ; গর্জন করে ওঠে—কে আছিস, এ্যাই, একে বাগিচার বাইরে নিয়ে যা।

জিয়াৎরাম আর থাকতে পারে না, সারা শরীরের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে বৃদ্ধ বয়সেও এই বর্তমান নবাবের স্বরূপ দেখে ; কোন রকমে নিজেকে সংযত করে নেয়।

বুব্বু ফিরে আসছে! অপমানিত, বিতাড়িত হয়ে ফিরে আসছে শূন্য হাতে নিজের ছেলের কাছ থেকে, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে।

—যেতে নিষেধ করেছিলাম ভাবীসাহেবা।

জিয়াৎরামের কথায় সাড়া দিল না বুব্বু ; কান্নায় তার বুক ভেসে চলেছে। একবার মণিবাঁদীর সঙ্গে দেখা করে শেষ বোঝাপড়া চুকিয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়েই ফিরে যাবে সে জাহানাবাদে। শেষজীবন সেইখানেই শান্তিতে থাকবার চেষ্টা করবে। অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলে ওঠে বুব্বু বেগম,

—চোখের উপর এই সর্বনাশ আমি দেখতে পার্বো না। মণিকেই বলবো।

বাধা দেয় জিয়াৎরাম ওকে—মণিবেগমের কাছে আবেদন! এতে মণিবাঈ-এর কাছে অপমানিতই হবেন ভাবীসাহেবা।

—তা জানি। তবু এত বড় হয়ে সে ব্যথা বাজবে না। এর জবাব চাইবো

তার কাছে। কি এমন কশুর আমি করেছি যে আমার বুক থেকে আমারই সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে জানোয়ার বানিয়েছে সে!

কান্নায় ঢেকে যায় বুব্বুর কথাগুলো।

—মণিবেগম আজ আর মানুষ নেই ভাবীসাহেবা, মসনদের নেশায় ওকে পেয়েছে।

জিয়াৎরাম আজ শিউরে উঠেছে ইংরেজের চক্রান্তে। মণিবেগম নিঃশেষে ওদের দলেই যোগ দিয়েছে। তার দরকারেই আজ মবারককে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছে, প্রয়োজন হয় এক মুহূর্তেই নিঃশেষ করে দেবে।

হেস্টিংস নন্দকুমারের সম্বন্ধে শেষ চেষ্টা করে দেখছে তাকে দলে ভিড়োন যায় কি না এবং কথাটা সে মণিবেগমের মারফত বলাতে চায়। তাই-ই আজ নিজে পাশের ঘরে বসে থেকে মণিবেগমকে এগিয়ে দিয়েছে মহারাজের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা মীমাংসায় আসতে। সহযোগিতা না করুন, তিনি যেন প্রতিবাদ না করেন।

—মীরজাফর খাঁয়ের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন আপনি।

মণিবেগম বলে চলেছে মহারাজকে। নন্দকুমার প্রথম একটু বিস্মিত হয়েছিলেন আজকের আমন্ত্রণে। হয়তো কোন পরামর্শ চাইবে বেগম ইংরেজের হাত থেকে বাঁচবার জন্য, কোন কর্মপন্থা নিতে হবে তারই উদ্দেশ্যে কথা বলবে। নইলে আসতেন না তিনি। বেগম বলে চলেছে,

—ইংরেজ আজ শক্তিমান।

—সে কথা আমি মানি, ন্যায়ে হোক অন্যায়েই হোক ইংরেজ আজ বাংলাকে নিঃশেষ করেছে।

চমকে ওঠে বেগম, হেস্টিংস পাশের ঘরেই রয়েছে; কথাগুলো সে শুনছে।

মণিবেগম স্থিরভাবে আবেদন জানায়,

—কোম্পানি আজ বোর্ড গড়ে তুলেছে, যাতে শাসন ব্যবস্থা নিখুঁত হয়ে ওঠে। আপনি চান বাংলায় শান্তি ফিরে আসুক, এই কাজে আপনার মত যোগ্য লোক কোম্পানিকে, নবাবকে সাহায্য করুন।

বেগম কথাগুলো বলে ওঁর দিকে চেয়ে থাকে; নন্দকুমার বলে ওঠেন,

—হেস্টিংস এখন গভর্নর; তিনি কি এটা চান?

—নিশ্চয়ই! নবাবের পাশে আপনি এসে দাঁড়ান। মীরজাফর গাঁয়ের বিশিষ্ট বন্ধু আপনি; মৃত্যুকালে তাঁর শেষ শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর সন্তানকে সাহায্য করবেন।

হেষ্টিংস পাশের ঘরে পানপাত্র হাতে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে, বেগমের কথায় খানিকটা ফল ধরেছে বেশ অনুমান করতে পারে।

মহারাজ কি যেন ভাবছেন! মণির সন্ধানী দৃষ্টির সামনে সেই ভাবান্তর নজর এড়ায় না। কণ্ঠে সহানুভূতির আর্দ্রতা এনে বেগম বলে ওঠে,

—ভুল হয়তো অনেক আছে, কিন্তু আপনি এসে সেই ভুল সংশোধন করুন। শাসন চালাতে গিয়ে অনেক অযোগ্য লোককে প্রশ্রয় দিতে হয়েছে, সে সব শুধরে নিন। বাংলাকে আপনিও কম ভালবাসেন না। বাঙালী কি আপনার কাছে এই স্বার্থত্যাগ আশা করে না?

মহারাজ কথাগুলো অস্বীকার করতে পারেন না। একটা কঠিন কর্তব্যকে এড়াবার জন্যই হয়তো অসহযোগিতা করে চলেছেন তিনি।

মহারাজ ভাবছেন।

পাথর গলছে; মণিবেগমের হৃদয়ের উত্তাপে পাথরও গলতে পারে মনে হয়।

হঠাৎ কোন দিক দিয়ে কি হয়ে গেল! জিয়াৎরামের সব নিষেধ অগ্রাহ্য করে বুব্বু এসে মণিবেগমের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। চমকে ওঠে মণিবেগম, মহারাজ নন্দকুমারও। বুব্বু বেগমের দিকে চাওয়া যায় না। সারা দেহে মনে এসেছে রুক্ষ শীর্ণতা; সেই সৌন্দর্য আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে। জিয়াৎরাম জীবনভোর বঞ্চনা ব্যর্থতা সহ্য করে কঠোর কঠিন হয়ে উঠেছে। হারেমের নিষ্ঠুরতা বুব্বুর জীবন যৌবন ব্যর্থ করে দিয়েছে, তার মাতৃত্ব আজ ব্যর্থ-বেদনা মাত্র। আর্তনাদ করছে বুব্বু কান্নাভেজা স্বরে।

—কি ক্ষতি তোমার করেছি মণি; এতটুকু মেয়েকে আমার মা দয়া করে ঠাঁই দিয়েছিল। খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছিল; সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধের জন্যই কি আমার একমাত্র সন্তানকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে জাহান্নামের পথে নিয়ে চলেছো? তোমার শিক্ষায় সে আজ মায়ের ইজ্জত ভুলেছে। নবাব! তুমি তাকে শয়তান বানিয়ে নিজে মসনদে বসে বিদেশী ফিরিঙ্গীর সঙ্গে মোহব্বত করছো।

চমকে ওঠেন মহারাজ! মীরজাফরের মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি শপথ করেছিলেন মবারককে, বুব্বু বেগমকে সাহায্য করবেন। কিন্তু পথ আজ

কোন দিকে! বুব্বুবেগম আজ কাঙ্গাল, মবারক আজ শয়তান। মণিবেগম আর হেষ্টিংসই আজ বাংলার সর্বেসর্বা। সেই শোষণযন্ত্র খাড়া রাখবার কাযে আজও তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে চায় মণি।

মণিবেগম চমকে ওঠে; পরক্ষণেই কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে,

—তোমার পাগলামি করবার জায়গা এটা নয় বুব্বু। তুমি পাগল বলেই কোম্পানি তোমার হাতে মসনদ তুলে দেয় নি।

বুব্বু প্রতিবাদ করে—তোমার স্বার্থে হেষ্টিংস আজ সারা বাংলাকে 'পাগল' বলবে। ওই রক্তমাখা মসনদে তুমিই বসো মণি, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও; তাকে নিয়ে আমি চলে যাব জাহানাবাদে। সুখে দুঃখে আমাদের দিন কাটবে। এ মসনদে তার দরকার নেই। তাকে শুধু ফিরিয়ে দাও তার মায়ের বুকে। দয়া কর মণি।

কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে তার কণ্ঠস্বর। বুব্বু কাঁদছে। নন্দকুমার যেন স্বপ্ন দেখছেন। ভাবতেও শিউরে ওঠেন।

মণিবেগম ঘরে বাইরে কি নিষ্ঠুর বঞ্চনা করে চলেছে। একটা মত্ত চিৎকার শোনা যায়। এগিয়ে আসছে সেই চিৎকার এই দিকেই।

—কে ওদিকে গুলাব বাগিচায় পাঠিয়েছিল আম্মাজান? ওই পাগলী বেগমকে? খোজা হাবশীগুলোকে চাবকাবার হুকুম দিয়ে এসেছি।

মত্তাবস্থায় ঢুকলো মবারক। পা টলছে, চোখ দুটো টকটকে রাঙ্গা। কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যাচ্ছে। মণিবেগমের কাছে নালিশ করতে এসেছে মবারক। এসে ওদের এখানে দেখে আরও চটে ওঠে,

—ও, এখানে আসা হয়েছে তোমার কাছে নালিশ করতে? বাগিচায় একটু ফূর্তি করেছি, তাতেই এত হাঙ্গামা? তা কি বলছে ওরা?

মবারক এগিয়ে আসে বুব্বুর কাছে। বুব্বু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তার দিকে; নন্দকুমারের সামনে কোন নাটকের করুণতম দৃশ্য অভিনীত হয়ে চলেছে। মবারক বলে ওঠে,

—এবার কি কোম্পানির হেষ্টিংস সাহেবের কাছেও নালিশ করতে যাবে?

হঠাৎ গর্জন করে ওঠে মত্তপকণ্ঠে মবারক -যাবে এখান থেকে, না চাবকে বের করতে হবে? বেতমিজ উল্লুর দল।

বুব্বুর মাতৃ অন্তর হাহাকার করে ওঠে—মবারক! তোর মায়ের ইজ্জত কি থাকবে না?

মহারাজের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঘটনাগুলো। ওরা চিরকালই অত্যাচার করে এসেছে; মানুষকে পশু বানিয়ে এসেছে। স্বামীর বুক থেকে মায়াকে ছিনিয়ে এনেছে; রামবেনিয়ার বোন কড়িকাঠে ঝুলে জীবন দিয়ে ওদের প্রতিবাদ করে গেছে; নিতু আজ রাস্তার ভিখেরী; ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের হাজারো মা বোন কুলবধূর আর্তরোল বাংলার আকাশ থেকে মুছে যায় নি আজও। হেস্টিংস আর মণিবেগম; বাংলার ইতিহাসে অভিশাপ। আজ বুব্বুর মাতৃঅন্তর কাঁদে ব্যর্থতায়।

চমকে ওঠেন মহারাজ; মবারকের হাতের চাবুক আশমানে উদ্যত হয়েছে, মণিবেগম উপভোগ করছে; ছেলে আপন মাকে নিষ্ঠুর আঘাত করতে উদ্যত, তাঁরই ভূতপূর্ব মনিব মীরজাফরের আত্মা আজ জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে আর্তনাদ করে ওঠে বাতাসে বাতাসে। নিমেষের মধ্যে এগিয়ে যান নন্দকুমার, বলিষ্ঠ মুষ্টিতে ধরে ফেলেন নবাবের উদ্যত হাত।

বুব্বু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে—মেরে ফেল আমাকে মবারক। চোখের সামনে এই অনাচার আমি দেখতে চাই না।

বাধা পেয়ে মবারক থামল; ওর হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে মেজেতে ফেলে দেন মহারাজ। একটি মুহূর্ত! মণিবেগম স্তব্ধ হয়ে গেছে, মবারকও। প্রাসাদের হর্ম্যতল কেঁপে ওঠে মহারাজের সতেজ কণ্ঠস্বরে,

—আমার কর্তব্য স্থির করেছি বেগমসাহেবা। এই অকথ্য অত্যাচারের আমি প্রতিবাদ করব। মৃত্যুকালে মীরজাফরকে কথা দিয়েছিলাম তা আমি আজও ভুলিনি। চলুন বেগমসাহেবা।

বুব্বু, জিয়াৎরাম ওঁর পিছু পিছু বের হয়ে এল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মণিবেগম, মবারক। ওদিকে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে নতুন বাঁদী রোশনী। ভয়ে শিউরে উঠেছে, হরিণশিশুর ডাগর চোখের নীরব কান্নামাখা সে দৃষ্টি।

হেস্টিংস দামী গালিচার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত; আপোসের কোন আশা আর নেই; হাতের ভিনিসিয়ান কাঁচের তৈরি পান-পাত্রটা উত্তেজনাবশে চাপ দিতেই ভেঙে চুর চুর হয়ে যায়; দুহাতে গড়িয়ে পড়ে রক্তবর্ণ পানীয়ের সঙ্গে মিশে যাওয়া তারই হাতের ক্ষতনির্গত রক্ত! মেজেতে পড়ছে বিন্দু বিন্দু করে।

স্তব্ধ হয়ে তাই দেখছে সে। দরজার কাছে এসে মণিবেগমও থমকে

দাঁড়াল। হেস্টিংসের দুহাতে রক্তের দাগ; মুখে চোখে সেই আতঙ্ক তখনও মিলোয়নি।

হেস্টিংস, নবকেষ্ট সজাগ হয়ে উঠেছে বোর্ডের সাহেবদের হাতে রাখবার জন্য। ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং, মনসন যেন অন্য ধাতুতে গড়া; বারওয়েলকে চিনে ফেলেছে হেস্টিংস। ইতিমধ্যেই বারওয়েল জমে গেছে হেস্টিংসের সঙ্গে, অন্যতম বন্ধু ইলাইজা ইম্পে'ও এসে পৌঁচেছে ভারতে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়ে। ইম্পেকে আসতে দেখে হেস্টিংস ভরসা পায়; বাল্য বন্ধু। ওর নাড়ি নক্ষত্র ভাল করেই জানে হেস্টিংস। ছেলেবেলা থেকেই একটা পা একটু বিকৃত, মনের দিক থেকেও একটা বিকৃতি আছে। পল্লীঅঞ্চল থেকে নতুন জমিদাররা জীবন্ত নারীমাংস ভেট পাঠাচ্ছে, হেস্টিংস তাদের সুতানটীতে বসবাসের ব্যবস্থা করেছে। রাতের অন্ধকারে ওরা আসে সাহেব-কুঠিতে; বিদেশী মদ আর নেটিভ মেয়েদের সামনে শাসকগোষ্ঠীর ন্যায়মূর্তির প্রকাশ পায়। অন্ধকার তমসাও সেই নির্লজ্জ প্রকাশে শিউরে ওঠে।

সেদিন বাংলোয় উৎসব, কলকাতার গাছে গাছে বসন্ত নেমেছে। গঙ্গার তীরভূমির আমবাগানে বৌলের মিষ্টি গন্ধ; সোঁদাল গাছে গাঢ় হলুদের বর্ণ, পাখিডাকা বনভূমি কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম আভায় মেতে উঠেছে।

হেস্টিংস ভোজসভায় আপ্যায়িত করছে ওদের। মিঃ ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং, মনসনের মধ্যে মিঃ ফ্রান্সিসকেই একটু সমীহ করে হেস্টিংস; বলতে কইতে পারেন, স্বাধীন মতামত তাঁরই বেশি। ইচ্ছে করেই একটু বেশি মাত্রায় পান করিয়েছে তাঁকে।

বাংলোয় ফিরছেন তিনি।

পাখিডাকা বনভূমিতে সন্ধ্যা নামছে। গাঢ় রক্তাভা গাছের মাথা থেকে তখনও মুছে যায় নি। আকাশে বাতাসে কিসের সুর; কোথায় মন্দিরে আরতি হচ্ছে, শঙ্খধ্বনি ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। সারা মনে একটা স্নিগ্ধ স্পর্শ জড়িয়ে আসে। ফ্রান্সিস চুপ করে চেয়ে থাকেন। বিরাট প্রশান্তি ঢাকা নির্জন বনপথে তাঁর মন তীর্থযাত্রা করছে কোন অদেখা ভারত তীর্থ ভূমির অন্ত প্রত্যন্তে।

বাংলোয় অন্ধকারে জ্বলছে বাতিগুলো; ক্লান্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে

থান ; কে যেন কাঁদছে ! উপুড় হয়ে ফ্রান্সিসের পায়ের উপর ছিটকে পড়ে সে। সবটাই ঘটে যায় এক মুহূর্তের মধ্যে। হকচকিয়ে উঠেছেন সাহেব !

—তুমি আমার বাবা সাহেব ! দোহাই তোমার ; আমাকে যেতে দাও !

আবছা আলোয় দেখে মেয়েটি কাঁদছে। রূপ স্বাস্থ্য কোনটারই অভাব তার নেই, কোন ভদ্র ঘরের মেয়ে, জোর করে ধরে এনেছে তাকে। ফ্রান্সিস এখনও বাংলা বোঝেন না ; চাকরটাকে হাঁক দেন। ক্রমশ বুঝতে পারেন ব্যাপারটা, কিন্তু তাঁরই বাংলোতে কে ধরে আনলো তাকে এটা অনুমান করতে পারেন না। রাগে অপমানে ফুলতে থাকেন।

দরজার কাছে হেস্টিংসকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে যান তিনি। জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠে হেস্টিংস—এনজয় মিঃ ফ্রান্সিস। দি নেটিভস্ আর মেণ্ট ফর ছাট। বি হোমলি হিয়ার।

তাঁকে নিয়ে এতবড় পরিহাস করতে সাহস করবে হেস্টিংস এটা যেন ফ্রান্সিস কল্পনাই করতে পারেন না। চাকরটার সঙ্গে মেয়েটিকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ওর দিকে চাইলেন, তখনও হাসছে হেস্টিংস,

—ইউ আর কাওআর্ড।

এগিয়ে আসেন মিঃ ফ্রান্সিস। হেস্টিংসের স্বরূপ, তার শাসনের নমুনা আজ নিজেই খানিকটা টের পেয়েছেন তিনি। সারা ইংরেজ জাতির নামে ও আতঙ্ক পুঞ্জীভূত ঘৃণা এনেছে ভারতবাসীর মনে। অন্তরালে আরও কত বড় অত্যাচার যে সঞ্চিত হয়ে আছে, তারই সন্ধান বা কে জানে ! দুচোখে ঝরে পড়ে পুঞ্জীভূত ঘৃণা।

কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠেন ফ্রান্সিস—ইউ আর নট ইন ইওর সেন্সেস্। ইউ গো নাউ।

একটি মুহূর্ত। হেস্টিংস থমকে দাঁড়াল। মদ খেয়ে কোন দিন জ্ঞান সে হারায় না। বরং সমস্ত শয়তানি বুদ্ধিটাই জাগ্রত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। মদ না খেলেই তার সব ঘুলিয়ে যায় ; ফ্রান্সিসকে যে পথে নামাতে চেয়েছিল, সে পথের মানুষ ফ্রান্সিস নয়। দুজনে দুজনকে চিনেছে সমান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। মিঃ ক্লেভারিং, মনসন আর ফ্রান্সিস—এরা তার কাজকে সমর্থন করবে না এ বিশ্বাস আজ অর্জন করেছে সে।

—গুডনাইট।

চিন্তিত মনে বের হয়ে এল হেস্টিংস। যুদ্ধের প্রস্তুতি জেগেছে তার মনে। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে দাঁড়াতে চায় সে।

বোর্ডের অফিস মিঃ জোসেফ ফুকের চার্জে। বোর্ডের কাছে ক্রমশ অভিযোগ আসছে; তার মধ্যে ক'খানা বেশ সাড়া জাগায়। জমিদার রূপ-নারায়ণ চৌধুরী, বর্ধমানের রাণীর অভিযোগ এসে পৌছল, জমিদারীর পুনর্ব্যবস্থা নিয়ে নানান ছোটখাটো অভিযোগ।

১১ই মার্চ, ১৭৭৫ সাল। মিঃ ফ্রান্সিস চিঠিখানা পেয়ে চমকে ওঠেন; নিজামতের ভূতপূর্ব প্রধান কর্মচারী বাংলার অন্যতম বিখ্যাত জননেতা মহারাজ নন্দকুমার অভিযোগ এনেছেন ওআরেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে।

—I have the strongest written vouchers to produce in support of what I have advanced; and I with and entreat for my honour's sake, that you suffer me to appear before you to establish the fact by an additional incontestable evidence

বোর্ডে একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়; এই রকম বলিষ্ঠ অভিযোগ ইতিপূর্বে আর আসেনি। ক্লেভারিং, কর্নেল মনসন, মিঃ ফ্রান্সিস একমত হয়ে ওঠেন—এর তদন্ত প্রয়োজন। হেস্টিংসের স্বরূপ আরও প্রকাশিত হওয়া দরকার। মিঃ বারওয়েল চুপ করে থাকে; হেস্টিংসকে তলব করা হয়েছে তার স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য।

—হেস্টিংস মাস্ট এক্সপ্লেন অ্যাণ্ড আনসার অল দিস কোর্স্টনস!

তাকে জবাবদিহি করতে হবে বোর্ডের কাছে।

সংবাদটা পেয়েই দপ্ করে জলে ওঠে হেস্টিংস। সেই সন্ধ্যায় ফ্রান্সিসের চাহনি আজও ভোলেনি সে। সেই ব্রাহ্মণ এতদিন গোপনে শক্তি সঞ্চয় করেছিল, আজ বোর্ডের সামনে সরাসরি অভিযোগ আনতে সাহসী হয়েছে। বহু তত্ত্ব এবং তথ্য সে জানে, তার হাতে হেস্টিংসের অনেক মৃত্যুবাণই সঞ্চিত রয়েছে। মণিবেগম সারা বাংলাকে হাতের মুঠোয় এনেছে তার ছলা কলা আর লোকজনের সাহায্যে; কিন্তু ওই তেজস্বী নির্ভীক লোকটিকে বশ করতে পারেনি। রেজা খাঁও হার মেনেছে। সমস্ত আক্রোশ পড়ে ওই ব্রাহ্মণের উপর; আজ থেকে নয়, বহু বৎসর আগে থেকেই সে প্রতিবাদ করে এসেছে

হেস্টিংসের কাজের; ইংরেজের শত্রু সে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে কোনদিনই ক্ষমা করে নি।

আজ হেস্টিংস সরাসরি অগ্রাহ্য করবে তাকে, অগ্রাহ্য করবে বোর্ডের প্রাধান্য! এই নিয়ে আলোচনা করে বন্ধুদের সঙ্গে।

ইলাইজা ইম্পে পরামর্শ দেয়—আইনে ওদের আপনার কৈফিয়ৎ চাওয়ার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে মিঃ হেস্টিংস।

হেস্টিংস চিন্তিত মনে জবাব দেয়—ও আইন দরকার হলে পার্লিয়ামেণ্ট থেকে অ্যামেণ্ড করিয়ে নেবে ওরা।

আজ শিউরে উঠেছে হেস্টিংস, আইন বদলাতে ওদের দেরী হবে না।

ইম্পে বলে ওঠে—সেটা সময় সাপেক্ষ, তার মধ্যে অন্য কিছু ঘটে ওঠা সম্ভব।

হেস্টিংস কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। কড়া সুরেই সে বোর্ডকে জবাব দেয়,

—Before the question is put, I declare that I will not suffer Nandakumar to appear before the board as my accuser: I will not sit at this board in the character of a criminal, no do I acknowledge the members of this board to be my judges.

বন্দী সিংহের মত ফুঁসছে হেস্টিংস। তুচ্ছ একটা নেটিভ কোথায় কোন অভিযোগ করেছে তারই জন্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসকে? তার আগে হেস্টিংস-ই ও কাজ সারবে। চাকা ঘুরিয়ে দেবে হেস্টিংস, মহারাজ নন্দকুমারকেই দাঁড়াতে হবে কাঠগড়ায়। গর্জন করছে হেস্টিংস—আই স্যাল টিচ হিম ইম্পে। ইউ উইল সি।

হ্যাঁ; আলোর সন্ধান পেয়েছে হেস্টিংস। পাক খাওয়া সরীসৃপ হিংসার আগুনে তেতে উঠেছে, ধীরে ধীরে কুণ্ডলী থেকে মাথা তুলছে, নিঃশ্বাসে ওর বিষাক্ত হাওয়া; ধারাল চিড়-খাওয়া জিবটা লিকলিক করছে মৃত্যুনীল বিষের ইঙ্গিতে।

একজন মাত্র হেস্টিংসের এই নিঃসঙ্গ জ্বালাময় মনের সান্নিধ্যে এসেছে। বিপদের মুখে হেস্টিংস নিজেকে অত্যন্ত একক ও অসহায় বলে মনে করে। বোর্ডের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেই ক্ষান্ত থাকলে চলবে না। নন্দকুমার প্রথমবার চিঠি দিয়ে উত্তর না পেয়ে দ্বিতীয়বার ফ্রান্সিসের হাতে তুলে দিয়েছে অভিযোগপত্র।

একমাত্র বেগমই তাকে অভয় দেয়; মণিবেগম তার পাশে দাঁড়িয়েছে।
—এত চঞ্চল হবেন না ইয়োর এক্সেলেন্সি। হেস্টিংসের হাতটা স্পর্শ করল সে।

হেস্টিংস চাইল তার দিকে। মহারাজ নন্দকুমারের দেওয়া আঘাত আজ তাদের দুজনকে অদৃশ্য নিবিড় এক বাঁধনে বেঁধেছে। দুজনে চেয়ে থাকে দুজনের দিকে, নতুন করে এ যেন চেনা। দুঃখের গাঢ় অসহায় তমসায় নিবিড় এ সান্নিধ্য।

—আমার সাহায্য আপনি পাবেন। বেগমের কণ্ঠে কি এক আকুতি ফুটে ওঠে। হেস্টিংস ওকে কাছে টেনে নেয়,

—থ্যাট আই নো বেগম।

আজ ওর নিবিড় স্পর্শে কোথাও অভিনয়ের সামান্যতম ফাঁক ফাঁকিও নেই।

মোহনপ্রসাদ রাতারাতি এই পরিবর্তনে অবাক হয়ে গেছে। নুনের গুদাম ছেড়ে দিয়েছে তাকে কোম্পানি, মণিবেগম তাকে নিজের খাসকামরায় ডাকিয়েছে। অদৃশ্য পথে অদৃষ্ট আজ তাকে উপরের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

ফিনফিনে মলমলের পাঞ্জাবিতে কড়া গিলে চাপিয়ে কিস্তী টুপিটাকেও তেমনি মানানসই করে নিয়ে চলেছে মোহনপ্রসাদ বেগমের দরবারে। কানের ভাঁজে কনৌজী আতরের মিষ্টি গন্ধ তার মনে আমেজ আনে। ফুরফুরে আমের বোল ফোটা বাতাসে ভ্রমরের মত তর হয়ে চলেছে সে। পা ফেলে যাবার কোন কষ্টই তার মনে নেই, মনে হয় যেন ডানায় ভর করে আশমানে চলেছে সে।

এবার জুড়ি একখানা কিনবে। হাটাহাঁটি কাঁহাতক পারা যায়।

মণিবেগম ওর দিকে চেয়ে থাকে; দীর্ঘ কয়েক বৎসর মসনদ চালিয়ে এসেছে, নিজের জীবনের বহু অভিজ্ঞতার বিনিময়ে সে লোক চিনতে শিখেছে। তাই মোহনপ্রসাদকে চিনতে তার এক মুহূর্তও দেরী হয় না। মোহনপ্রসাদও ওর ডাগর কালো চোখের অতল চাহনির সামনে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

—ইতাবর খাঁয়ের জায়গায় আমি একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছিলাম।

মোহনপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে—বিশ্বাসী লোক! আজ্ঞে আমি কি পারবো? মোহনপ্রসাদ পাকা মোসাহেবী সুর ধরেছে। বেগম বলে ওঠে,

—হ্যাঁ, তোমায় দ্বারা হবে।

পরক্ষণেই মোহনপ্রসাদও বদলে যায়—তা চেষ্টা করলে পারব বই কি। ধরুন এতবড় এস্টেট চালাচ্ছি; এদিক ওদিক সবই তো জানি। তাছাড়া ইয়ার জঙ্গ রয়েছে, তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন; গলা কেটে ফেল্লেও পেটের কথা আমার বেরুবে না।

মণিবেগম ওর নির্লজ্জ ভাঁড়ামিতে অবাক হয়ে গেছে। মোহনপ্রসাদই বলে চলেছে—মানে এ অবস্থা কি আমার হতো? সবই ঐ নন্দকুমারের কাজ! পথে বসিয়ে ছেড়েছে বেগমসাহেবা; নয় ছয় করে দিল কোত্থেকে বস্তাপচা এক দলিল বের করে। বলে কিনা দাও আটচল্লিশ হাজার টাকা! বুঝুন ঠেলাখানা! দু পাঁচটা টাকা নয় আটচল্লিশ হাজার টাকা কান মলে নিয়ে গেল।

বেগমসাহেবা বলে ওঠে—তা নালিশ কর না কেন?

—নালিশ! মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে? তাহলেই হয়েছে।

পরিষ্কার কথাটা বলে ফেলে মণিবেগম—আমি সাহায্য করব।

হাওয়া কোনদিকে বইছে ঠিক অনুমান করতে পারে না মোহনপ্রসাদ। একটু থেমে বলে ওঠে—মানে, ওই যে চাকরীর কথা বলছিলেন?

হাসে বেগম ওর শয়তানী বুদ্ধিতে, আসল কথা থেকে সরে আসতে চায় না। জবাব দেয়—তাও হবে; কাল থেকেই কাজে যোগ দাও। মাসিক হাজার তঙ্কা মাইনে পাবে।

কোন রকমে বিস্ময় আনন্দ চেপে রেখে বলে ওঠে মোহনপ্রসাদ—আপনার অশেষ দয়া বেগমসাহেবা।

মাথা নীচু করে কুর্নিশ করছে সে। মণিবেগম বলে ওঠে—তোমার সেই দলিলখানা একবার দেখাবে কাল।

মোহনপ্রসাদ আবার ৪৮০০০৲ টাকার স্বপ্ন দেখছে। বেগমসাহেবা সাহায্য করলে ন্যায্য দাবীকেও অন্যায্য বলে প্রমাণ করতে কতক্ষণ!

—নিশ্চয়ই! আপনার রাজ্যে অন্যায়ের কোন ঠাঁই নেই তা আমিও জানি। আপনি মেহেরবান! দেন না একটা হিল্লে করে।

মণিবেগমও আজ স্বপ্ন দেখে, হেস্টিংসের মুখে ফুটে উঠেছে জয়ের হাসি। মণিবেগমই তার হাতে তুলে দিতে পেরেছে মহারাজের মৃত্যুবাণ; এর ফলাফল কি তা ভালভাবেই জানে বেগম; তবু হেস্টিংসের বিপদ দেখে সে স্থির থাকতে

পারেনি। সমস্ত ন্যায় অন্যায় বিচারবোধ তার আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। কি যেন নেশার ঘোরে কাজ করে চলেছে সে।

হেস্টিংস আজ বেগমের কাজে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না। মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গে আপোশ মীমাংসার শেষ চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়েছিল বুব্বু বেগম, জিয়াৎরামের আর মবারকের আকস্মিক আবির্ভাবে। আজ মণিবেগম মোহনপ্রসাদকে প্রলুব্ধ করেছে।

—মাই ডারলিং।

হেস্টিংসের নিবিড় বন্ধনে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিয়ে মণিবেগম নিশ্চিন্ত হতে চায়; হারিয়ে ফেলতে চায় তার উতরোল সত্তার সমস্ত অস্তিত্ব।

সারা মুর্শিদাবাদ কেঁপে উঠেছে। প্রাসাদের ভিত নড়ে উঠেছে প্রচণ্ড বেগে। ওয়াজিদ বীণকার স্তম্ভিত হয়ে যায় শুনে। রেজা খাঁয়ের মত লোকও চমকে উঠেছে। ধূর্ত ইংরেজ আজ মণিবেগমকে হাত করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চলেছে—সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে বাংলার আকাশে-বাতাসে। মোহনপ্রসাদ সুপ্রিমকোর্টে নন্দকুমারের নামে জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে। বুলাকীপ্রসাদের নামে জাল দলিল করে মহারাজ ৪৮০২১৲ টাকা নিয়েছেন। সমস্ত সাক্ষী মায় বুলাকীপ্রসাদ সকলেই মারা গেছে বহুদিন আগে। সেই মৃতের দলিল দাখিল করেছে মোহনপ্রসাদ!

মণিবেগম বহুদিন পর বীণকারকে আসতে দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠে; এই ঔদাসীন্য বীণকারের দৃষ্টি এড়ায় না।

—এ কি করেছো বেগম? বীণকারের কণ্ঠে বেদনার আভাস।

মণিবেগম জবাব দেয়—আমি কোন নালিশ করিনি, মোহনপ্রসাদের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেবার আমার কোনও অধিকার নেই।

—মিথ্যা কথা বলে এড়িয়ে যেও না মণি! সারা মুখে তোমার সেই হিংসার ছাপ। জানো না কি সর্বনাশ করতে চলেছ তুমি?

—সমস্ত পাপই আমার? মণিবেগম উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ; ইতিহাস তাই বলবে। সারা বাংলার লোক তাই বলছে।

বীণকার আজ সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে এসেছে তার অন্যায়ের।

মণিবেগম তেজদৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে—তাদের কথা আমি অগ্রাহ্য করি বীণকার। যেদিন মণি মুজরোতে নাচতো সেদিন বাংলার লোক তাকে গ্রাহ্য করেনি। আজ তার ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতে আসে কোন মুখে?

—নিজের বিবেকের কাছে লজ্জা পাওনি তুমি?

মণিবেগম একা ওকেই যেন ভয় করে মনে মনে। ওই একটি লোক যে মণির আসল পরিচয় জানে; একটা দুর্বলতা কোথাও আছে মণির মনে, তাই ওর কঠিন কথাগুলোর জবাব দিতে পারে না।

—বাংলার একটিমাত্র প্রদীপশিখা তোমার ফুৎকারে নিভে যেতে বসেছে মণি; জানো না এ কি সর্বনাশ তুমি করেছ।

কথা কইল না মণি! ঘাড় উঁচু করে দৃপ্ত ভঙ্গীতে ঝরোখার বাইরে গঙ্গার প্রশস্ত বুকের দিকে চেয়ে আছে। হাজারো মাণিকজ্বলা ঢেউ বাতাসে উঠে পড়ে একাকার হয়ে মিশে চলেছে কোন অন্তহীন মহাসমুদ্রের বুকে। লাখো জীবনের ভিড়ে এমনি একটি কোন সামান্য জীবন ভেঙ্গে পড়ে কালসমুদ্রে তলিয়ে যাবে প্রকৃতির সহজ নিয়মে, এর জন্য ওদের এত কলরব কোলাহল কেন বুঝতে পারে না মণি। উঠে পড়ে,

—আমার একটু জরুরি কায আছে।

বীণকারের কথার জবাব না দিয়েই বের হয়ে গেল। আজ ওদের উপেক্ষা, অগ্রাহ্য করবে সে। তুচ্ছ একজন দরবেশ মুসাফির রাজকাজের সমালোচনা করবে, এটা আজ প্রথম তার কাছে অসহ্য ঠেকে।

বীণকার স্তব্ধ হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। মণি সরে গেল তার সামনে থেকে। জবাব দেবার কিছুই নেই ওর। নীরবে বের হয়ে এল ওয়াজিদ; মণি আজ বদলে গেছে। শয়তান ভর করেছে তার উপর।

চমকে উঠেছে রেজা খাঁ। আজ ইংরেজ শাসনের নমুনা দেখে মণিবেগমের নীচতায় শিউরে উঠেছে সে। বহু বৎসর নিজামতে কাজ করেছে; এই বন্দীদশা, অপমান তার ভাগ্যেও জুটেছে। নন্দকুমারকে নিবিড়ভাবে চিনেছে সে, কিন্তু নন্দকুমার জালিয়াৎ একথা সারা পৃথিবী মানলেও সে মানবে না। বহু বিরোধ তাঁদের মধ্যে ছিল, কিন্তু রেজা খাঁ আজ অনুভব করতে পারে নিবিড় শ্রদ্ধার আসন পেতেছিলেন মহারাজ তার সারা মনে। রেজা খাঁ নিজের অজ্ঞাতেই আজ ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে নন্দকুমারের কাছে।

—শঠের সঙ্গে শঠতা করাই রাজনীতি মহারাজ। ওরা চায় আপনাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে অপমান করতে। আপনি রাজধানী থেকে অন্যত্র চলে যান, ইংরেজের সাধ্য নেই আপনাকে বন্দী করে।

—ওদের দেওয়া অপবাদ তাহলে স্বীকার করে নেওয়া হবে খাঁ সাহেব। সত্য চিরকালই সত্য ; কোন শক্তিই তাকে গোপন রাখতে পারে না।

দৃঢ়কণ্ঠে মহারাজ প্রতিবাদ করেন। খাঁ সাহেব ওই তেজস্বী ব্রাহ্মণকে চেনে। বাংলার সম্মিলিত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ওঁর কণ্ঠে ; জীবনের পূজারী তিনি। তবু খাঁ সাহেব বলে ওঠে,

—এদের রাজত্বে সত্যের কোন ঠাঁই-ই নেই মহারাজ ; স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীন ষড়যন্ত্র করে সর্বনাশ আনতে চায় ওরা।

—আজ মণিবেগম হেস্টিংসকে নতুন করে চিনেছে খাঁ সাহেব। দেবী সিং আজ হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আজ চাপা পড়ে গেছে। সমস্ত অপবাদ চাপিয়ে ওরা রেজা খাঁকে বন্দী করেছিল, দেশবাসী জানে রেজা খাঁ একটি মূর্তিমান শয়তান। সত্যকথা বললেই, ওদের কাজের প্রতিবাদ করবামাত্র তারা তাকে ওই অপবাদে বন্দী করে আবার অপমান করতে দ্বিধা করবে না। দেশবাসীর সামনে তাই রেজা খাঁ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মূল আসামীই হয়ে আছে।

মনের গোপনে মহারাজের সত্যনিষ্ঠা, তাঁর অসীম সাহসকে শ্রদ্ধা না করে পারে না বৃদ্ধ খাঁ সাহেব ; সারা জীবন বহু পাপ অন্যায় করেছে, আজ আর নয়।

বাইরে জনতার কোলাহল শোনা যায় ; মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ ইংরেজের এই মিথ্যা ষড়যন্ত্রে ক্ষেপে উঠেছে। মোহনপ্রসাদ কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ; রাজ-অতিথি সে। ইয়ার জঙ্গ, মহারাজের জামাই আজ চুপ করে হাওয়ার গতিবেগ নিরীক্ষণ করছে। মহারাজ নিবাত নিষ্কম্প দীপের মত স্থির অচঞ্চল আজ। বলে ওঠেন,

—জীবনে কোন অন্যায়কে আশ্রয় দিই নি। ঈশ্বর যদি থাকেন আমার এই ত্যাগ, সত্যপ্রীতির দাম থেকে কোনদিনই বঞ্চিত হব না। তাই ওদের চক্রান্ত শঠতাকে কোনদিন ভয় করিনি খাঁ সাহেব।

রেজা খাঁয়ের অন্তরে আজ ভাঙ্গাগড়া চলেছে। মহারাজকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল প্রথমে, কিন্তু দেখেছে সত্যপথ থেকে ওঁকে টলানো যাবে না!

মুর্শিদাবাদের রাজপথে টহল দিচ্ছে গোরা সৈন্য; বুরুজের মিনার থেকে দিগন্ত সীমা কাঁপিয়ে উঠে—প্রহরে প্রহরে বাজে বিদেশী বিউগিল, শাসনের তীক্ষ্ণ দাপট। বিলের জলে চাবুকের মত কর্কশ হিংস্র শব্দ তুলে মিশিয়ে যায়; সানাইএর রাগিণী থেমে গেছে—জেগে রয়েছে শাসকের গর্জনের মত ওই বিউগিল। ইংরেজ সৈন্য মুর্শিদাবাদে মার্চ করছে—যেন যুদ্ধের সাড়া পড়েছে। কঠিন হাতে ইংরেজ সমস্ত জনমতকে নিঃশেষে চেপে দিতে চায়; রেসিডেন্ট মিডলটন আজ তারই আয়োজন করেছে। শান্তি ভঙ্গ যেন না হয়।

এ সংবাদ সে আগেই পেয়েছিল; মিডলটনের পাশে দাঁড়িয়ে সহকারী রেসিডেন্ট মিঃ ব্যায়াম মার্টিন। পিটারসন কমিশনের পরিণতি নিজের চোখে দেখছে সে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সে নিজে প্রত্যক্ষ করেছে—তার বিষময় পরিণতিও দেখেছে। ইংরেজ সেদিন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। আজ নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে হেস্টিংসের দলবল ক্ষেপে উঠেছে—মেতে উঠেছে হিংসার তাণ্ডবে।

১৭৭৫ খ্রীঃ, ২ই মে, রাত্রি দশটার একটু আগে মিডলটন এসে ঢুকলো মার্টিনের ঘরে; মার্টিন ইতিহাসের ছাত্র, রোম সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতার কথা মনে পড়ে, সিসিলির গভর্নর ভেরাস দরিদ্র সিসিলির প্রজাদের উপরও বোধ হয় এমনি নিষ্ঠুর অন্যায় অত্যাচার চালায় নি; আইনের নামে এত বড় পাপকে প্রশ্রয় দিতে তার মত হৃদয়হীনও শিউরে উঠেছিল, আফ্রিকার রোমান শাসনকর্তা মারিয়াস প্রিসাসও আফ্রিকানদের উপর এত অবিচার করেছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু ন্যায় এবং সত্যের বিচারালয়ে তাদের অভিযুক্ত করেছিল রোমান বক্তা সিসারো; প্রিসাসকে আসামীর কাঠগড়ায় তুলেছিল বিখ্যাত রোমান ঐতিহাসিক টাসিটাস; তাদেরও বিচার হয়েছিল। কিন্তু হেস্টিংসের শত অপরাধের কোন বিচার আজও হয় নি। বাংলাদেশকে শ্মশানে পরিণত করেছে, কাশীর রাজাকে ধ্বংস করেছে, অযোধ্যার বেগমদিকে অপমান লুণ্ঠন করে পথের ভিখারী করেছে। নারী রক্তে তার হাত রঞ্জিত।

কিন্তু তার শাস্তি আজও হয়নি। রাতের আঁধারে আজ চলেছে হেস্টিংসের দলবল অন্য এক হীন জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে, মিডলটনের কথায় মুখ তুলে চাইল।

—তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে মিঃ মার্টিন।

—দস্যুদলের সঙ্গে অন্যায় করতে যেতে পার্বো না; এক্সকিউজ মি।

মিডলটন কথা বলল না, ওর মুখের দিকে চাইল মাত্র; চাপা রাগ আর আক্রোশে থমথম করছে মুখ। মার্টিন আজ তৈরি হয়েছে চরম পন্থা নেবার জন্য। মিডলটন আপাতত কোন কথা বলে না—বের হয়ে গেল নীরবে।

সারা বাংলাদেশে প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়বার আগেই তারা কাজ শেষ করতে চায়; মহারাজ নন্দকুমারকে আজই বন্দী করা হবে; রাতের অন্ধকারে দস্যুদল এগিয়ে চলেছে, ওদের বুটের শব্দে মাটি কেঁপে উঠছে—শিউরে উঠেছে বাংলার আকাশ-বাতাস।

মহারাজও তৈরি হয়ে রয়েছেন। স্ত্রী, গুরুদাস আজ এসেছে। ওদের চোখে জল, মায়া স্তব্ধ নিস্পন্দ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওঁর দিকে।

—আমার গীতা—উপনিষদ ক'খানা সঙ্গে দিও মা।

যেন তীর্থযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন তিনি।

—এ সময় চোখের জল ফেলো না। সত্যের পথ বড়ই কঠিন কঠোর মা, ক্ষুরধার—নিশিত দুর্গম পথ; জীবনদেবতা সেই পথেই নিয়ে চলেছেন আমাকে। তাঁরই জয় হোক।

গুরুদাস আজ আবার এই আত্মত্যাগের যুক্তি খুঁজে পায় না; ইংরেজের উপর, বেগমের উপর আজ বিতৃষ্ণা জন্মেছে তার। এই বিলাস ব্যসন তার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। মুর্শিদাবাদ তাকে সর্বহারা নিঃস্ব করেছে। মহারাজের চোখে মুখে অস্বাভাবিক দীপ্তি।

—জীবনকে সার্থক কাজে বিলিয়ে দিতে পেরেছি—এই তো চরম পাওয়া।

রাতের অন্ধকারে কাদের মশালের আলো জ্বলছে; লাল হিংস্র আভায় ভরে উঠেছে চারদিক। দরজায় ধাক্কা পড়ল। চরম মুহূর্ত! স্থির হয়ে গেছে ওরা।

এগিয়ে গেলেন মহারাজ নির্ভীক পদক্ষেপে। ইংরেজ সৈন্য এসেছে মিডলটনের নেতৃত্বে।

—ইউ আর আণ্ডার এ্যারেস্ট।

—চল সাহেব, আমি তৈরি।

মায়া ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে। গুরুদাস নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাসের একটি পাতা চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেছে। সব কান্না দুর্বলতা উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে একটি বলিষ্ঠ মানুষ, যুগ থেকে যুগান্তরের দিকে।

সমস্ত দৃশ্যগুলো একজন নির্বাক দর্শকের মত দেখছে। হারেমের আকাশ ছোঁয়া পাঁচিলের অন্তরালে হাবশী খোজার হাজারো দৃষ্টি এড়িয়ে রোশনারা বাঁদী দেখেছে ঘটনাগুলো। বাংলার মসনদের কাহিনী সে শুনেছিল, আজ মিলিয়ে দেখছে বর্ণে বর্ণে—সব সত্যি। মাকে তার মনে পড়ে না; বাবার কথাও ভুলতে বসেছে।

মণিবেগমের অত্যাচার অনাচার, সাহেবদের সঙ্গে অবাধ মেশামেশির নীরব সাক্ষী সে। রূপের জৌলুসে হারেমের অন্ধকার ধাঁধিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়।

মবারককে করুণা করে রোশনারা। নবাবী নয়—যেন কোন বন্দীদশা। মণিবেগম আর হেস্টিংসের পুতুলনাচের আসরে নির্বোধ নবাব নাচছে ওদের অঙ্গুলি সংকেতে। রোশনারার অন্তরে ধীরে ধীরে কি যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে ওই চিন্তা।

শূন্য গোলদরবারের খোলা গবাক্ষ দিয়ে তির্যক রেখায় এসে পড়েছে দিনের আলো; নবাব প্যালেসের মধ্যে দ্বিমহলে দরবার বসান নবাব, রূপোর হাতলের মুখে দুটো সিংহ, মসনদের চারদিকে সিংহের থাবার অনুকরণ। লাল মখমলের পুরু গদি, পাশাপাশি দুটো আসন, ওদিকে রেসিডেন্টের এবং রেজা খাঁয়ের শূন্য আসন পড়ে আছে। মসৃণ মার্বেল পাথর ঢাকা মেজেতে পা রাখা যায় না, মসনদের রাজনীতির পথের মতই পিছল এর জমি।

সিংহাসনের উপর বালুচরের রেশমী কাজ করা চাঁদোয়া থেকে ঝুলছে সাদা মুক্তার ঝালর; থমকে দাঁড়াল রোশনারা, কুখ্যাত ওই মসনদ। ওকে কেন্দ্র করেই বাংলার ভাগ্যচক্র আবর্তিত হয়ে চলেছে; সিরাজের দীর্ঘশ্বাস আজও শোনা যায় হর্ম্যতলে, মীরজাফরের বুক ভাঙ্গা ব্যর্থ কান্নার সুর গুমরে ওঠে ওর চারধারে; শ্বেতশুভ্র মেজেতে পড়েছে মীরজাফরের শেষ পদচিহ্ন, নিজাম-উদ্দৌলা, সইফুদ্দৌলা মরেছে ওইখানে।

মবারক আজ ওখানে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছে অদৃশ্য কোন বিচারকের সামনে। পাপ পুণ্যের পাল্লা ঝুলছে; মবারকের পাল্লা ঝুঁকেছে পাপের বোঝায়।

চমকে ওঠে রোশনারা! কি এক অদৃশ্য আকর্ষণে সে তার অজানতেই মসনদের পাশের আসনে এসে বসেছে! সারা শরীরে বয়ে যায় হিম শীতল স্পর্শ—মৃত্যুর দূত যেন ডেকে গেছে তাকে!

হঠাৎ কার অট্টহাসির শব্দে চমকে ওঠে; বীণকার দূর থেকে দৃশ্যটা দেখেছে। বাঁদীর বেগম হবার দুঃসাহস! মণিবেগম বেগম হয়েছে, আবার রোশনারার শখ জেগেছে মনে। কিন্তু ও জানে না তার পরিণাম।

—বীণকার; হাসছো তুমি?

—না, বাংলার মসনদে সবই সম্ভব।

—সম্ভব? রোশনারার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

এগিয়ে আসে বীণকার—কেন নয়? মণিবেগমকে দেখনি? তবে ও-ভাবে মসনদ চেয়ো না; পারো তবে বাংলার নবাবকে বাঁচাও। যোগ্যতা যদি থাকে গৌরবের দাবী নিয়ে মসনদের আশা করো।

কথা কইল না সে। ওই কথাটা তার মনে যেন ঝড় তুলেছে। তার কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে রোশনারা।

—তোমার কথা আমার মনে থাকবে বীণকার।

মলিন বিষণ্ণ হাসিতে ভরে ওঠে বীণকারের মুখ—একজন ও-কথা বলেছিল রোশন, সে আজ ভুলে গেছে তার প্রতিশ্রুতি—মসনদের নেশায়।

নির্জন দরবারে অসীম স্তব্ধতা নেমেছে। বীণকার বের হয়ে গেল, মবারককে এদিকে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল রোশন। পা টলছে—মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবার হিম্মতও নবাবের নেই।

—তুমি! মবারক ওকে দেখবার চেষ্টা করে! রোশন অবাক হয়ে যায় ওর দিকে চেয়ে, জড়িত কণ্ঠে বলে—আমাকে মহলে নিয়ে চল। নেশায় চোখ বুজে আসছে তার। অসহায় একটি পুতুল মাত্র।

হাতটা ধরল নবাবের, নিশ্চিন্ত নির্ভর মনে করে মবারক ওর হাতেই সঁপে দিল নিজের হাতখানা, বুক কাঁপছে বাঁদীর। পরমুহূর্তে সামলে নেয় নিজেকে, মসনদের সামনে আজ অসহায় নবাবের সব দায়িত্ব যেন কে তুলে দিল তার হাতে। এ দায়িত্ব বইতে হবে তাকে। বীণকারের কথাগুলো তখনও কানে বাজে।

বাঁদীর অন্তরের অন্তস্থলে কি এক নবচেতনার উন্মেষ ঘটেছে।

বুব্বু বেগম সেই ঘটনার পর থেকে এ মহলে আর আসে না। আজ না এসে পারে নি। জিয়াৎরামও বাধা দিতে পারে নি। বুব্বুর ইমানে—ধর্মে সবচেয়ে বেশি আঘাত বেজেছে। মুর্শিদাবাদে এসে অবধি দেখেছে সে সারা নিজামত মীরজাফরকে যেদিন চরম আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছিল মণিবেগমের

নেত্রীত্বে, সেই দুঃসময়ে একমাত্র মহারাজ নন্দকুমারই তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই পরম সুহৃৎকে মবারক আজ এতবড় বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। কোন অতলে নেমে চলেছে মবারক মণির প্ররোচনায়!

সমস্ত অপমানের জন্য তৈরি হয়ে বুব্বু বেগম আজ এ মহলে এসেছে। নির্জন প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে; সিঁড়ির মুখেই সিরাজের সেই ছবিখানার দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে; চিরকালই ও ওইখানে দাঁড়িয়েই হাসছে সর্বনাশা হাসি। নিষ্ঠুর নিয়তির প্রতীক হয়ে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে জেগে আছে নিশিদিন ওই ছবি।

দ্রুতবেগে পার হয়ে এল জায়গাটা, দুরু দুরু কাঁপছে বুক অজানা আতঙ্কে।

দখলমের হীরামন পাখিটা ওকে দেখে ডেকে ওঠে, বাতাসে নড়ছে ঝাড় লণ্ঠনগুলো টুং-টাং সুরেলা ছন্দে; পর্দার ঝালর দোল খাচ্ছে বাতাসে।

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল; রোশন অচেতন নবাবের মাথায় গোলাব জল দিয়ে হাওয়া করছে। বুব্বু বেগমের কাছে এ দৃশ্য নতুন নয়; মীরজাফরের শেষজীবন মদের ঘোরেই কাটত; আজ বুব্বুর চোখের সামনে সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটলো মাত্র। কোথাও কোন ফারকত নেই।

এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল রোশন।

—নবাব অসুস্থ!

বুব্বু কথা কইল না, ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মণিবেগমের মহলের কোন বাঁদীই তাকে সেলাম পর্যন্ত করে না, এ যেন তাদের গোত্রছাড়া। বুব্বু কার কাছেই বা জানাবে মহারাজের কথা; মবারক এ জগতের কোন সংবাদই রাখে না।

— একটু অপেক্ষা করবেন বেগমসাহেবা?

বুব্বু ওর চোখের চাহনিতে কি যেন অন্তবস্তর সন্ধান পেয়েছে; মোহব্বতের শিখা জলে ওর চোখের তারায় তারায়।

—নবাবকে সুস্থ করে তোল—আবার আসব আমি।

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল রোশন। কেমন একটা মমতা বুব্বুর মনে দেখা দেয়, আশার আলোর সন্ধান পায় সে।

—একদিন আমার মহলে আসবে? অনুরোধ ফুটে ওঠে তার কণ্ঠস্বরে। মাথা নীচু করে কুর্নিশ করে রোশন।

—বাঁদী আপনার হুকুম তামিল করবে বেগমসাহেবা।

রূপ! ওর রূপের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বুব্বু। মণিবেগমের এত রূপ কোনদিনই ছিল না। ও পারবে মণিবেগমের সমুচিত জবাব দিতে।

—তুমি যাও, নবাব অসুস্থ!

দ্রুতপদে নেমে এল বুব্বু! সিঁড়ির মাথায় সিরাজের ছবিটার দিকে ইচ্ছা করেই চাইল না। রোশনীর বাঁধ ভাঙ্গা রূপের আলোয় অন্ধকার প্রাসাদ ভরে উঠেছে।

মিঃ ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং, কর্নেল মনসন হেস্টিংসের চক্রান্তে শিউরে উঠেছেন। একটা তদন্তের কোন জবাব না দিয়েই তাঁদের সরাসরি অগ্রাহ্য করে সেই অভিযোগকারীকে এনে দাঁড় করিয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়। সুসভ্য ইংরেজের আইনে গণতন্ত্রের এত বড় অপমান আর কোন দিনই ঘটে নি। জন-স্বার্থের দাবীতে তাদের আইনে রাজার বিচার করেছে—ফাঁসি দিয়েছে প্রথম চার্লসকে। সেই আইন সমুদ্রপারে এসে এমনি বিকৃত হয়ে উঠেছে—একথা কল্পনা করতে তাঁরা লজ্জা পান। বোর্ডের কোন মর্যাদাই হেস্টিংস দেয় নি।

মিঃ ফ্রান্সিস বলে ওঠেন—লণ্ডন অপিসে আমি লিখছি। এ ভাবে কাজ করা অসম্ভব।

ক্লেভারিং ফুরসী টানতে শিখেছেন এদেশে এসে, নীরবে ধূমপান করছেন তিনি, সারা মুখ থমথমে হয়ে রয়েছে; হেস্টিংস ইতিমধ্যে বারওয়েলকে দলে ভিড়িয়েছে। বারওয়েল বলে ওঠে,

—অপরাধীর বিচার হবে না? নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে জালিয়াতির।

—হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আরও গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ এসেছে। বিচার উভয়েরই হোক। আইনের চোখে সবাই সমান।

হেস্টিংস ওপাশে বসে ওদের কথাগুলো শুনে চলেছে। হেস্টিংস নন্দকুমারের আনীত কোন অভিযোগের জবাব দেয় নি, সরাসরি বোর্ডের আদেশ অমান্য করে গেছে। ভারতের ইংরেজ প্রতিনিধি—গভর্নর জেনারেল—তুচ্ছ একজন নেটিভের আনীত অভিযোগের উত্তর দেবে ওদের সামনে?—অসহ্য!

উঠে চলে গেল সে। ফ্রান্সিস তীব্র ঘৃণাভরা চাহনিতে চেয়ে থাকেন ওর দিকে। গর্জন করে ওঠেন,

—সাম ডে হি মাস্ট হ্যাভ টু আনসার।

ইলাইজা ইম্পে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। এই গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ার জন্য বাল্যবন্ধু হেষ্টিংসের হাত আছে অনেকখানি। হেষ্টিংস বেছে বেছে নিজের বিশ্বস্ত লোকদিকে এইসব পদে বসিয়েছে। ইম্পে জীবনে স্বপ্নও দেখেনি এমনি বিশাল ধনসম্পদপূর্ণ দেশের বিচার ব্যবস্থার একচ্ছত্র অধিপতি হবে! আজ সেই বন্ধুকৃত্য করবার দিন এসেছে।

বনে বনে সবুজের ছোঁয়া, পাতালের আড়ালে হরিণ-শিশু কান্না-চাপা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চৌরঙ্গীর বনভূমি নিথর অপরাহ্নে বিষাদময় হয়ে উঠেছে।

বাংলোর বাগানে গোলাপ গাছগুলোয় এসেছে রাঙ্গা ফুল। বসন্তের প্রারম্ভ। সারা বাংলার মাটিতে প্রাণের অঙ্কুর জেগেছে; বাংলোর হাতায় এসে দাঁড়াল হেষ্টিংসের গাড়িখানা। উর্দিপরা খানসামা ছুটতে ছুটতে গিয়ে দরজা খুলে সেলাম জানায়—গুড আফটার-নুন ইয়োর এক্সেলেন্সি।

পা-টা একটু বিকৃত, ওঠানামা করতে অসুবিধা হয়।

তবুও ইম্পে নেমে এসে স্বাগত জানায় তার অন্নদাতাকে।

বৈকালের ম্লান আলো পড়েছে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে বাগানের উপর। পাখির ডাকে নির্জন বনভূমি মুখর হয়ে উঠেছে।

—আই লাইক টু সি দ্যাট দি কেস ইজ প্রপারলি হ্যাণ্ডলড্।

চিন্তিত মনে ইম্পে বলে ওঠে—ইংরেজের আইনে ফোর্জারির শাস্তি মৃত্যু-দণ্ড। কিন্তু এটা ইণ্ডিয়া; এখানে সেই ইংল্যাণ্ডের নিয়মে বিচার করা কি ঠিক হবে?

হেষ্টিংস জবাব দেয়—কেন হবে না? এটা ইংল্যাণ্ডের শাসিত দেশ।

ইম্পে বলবার চেষ্টা করে,—কিন্তু কলোনি। নেটিভরা ইংল্যাণ্ডের প্রজাদের মত সুখ-সুবিধা পায় না; তাই নীতির দিক থেকে ওই আইন প্রয়োগ করলে পরে প্রশ্ন উঠতে পারে। মিঃ ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং, মনসন আছেন।

ইম্পে মনে মনে ওদের ভয় পায় একটু।

চিন্তিত মনে কি ভাবছে হেষ্টিংস; ওরা এসে বিপদ বাগড়া বাড়িয়েছে বই কমায় নি। বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে—দ্যাট আই স্যাল সি।

উত্তেজিত হেষ্টিংস একটা রক্তাভ তাজা গোলাপ তুলে নিয়ে হাতের মুঠোয় সেটা পিষে পিষে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়; চোখেমুখে কি বীভৎস ছাপ! কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে,

—ইম্পে, আই লাইক টু সি হিম—

উত্তেজনার আবেগে কথা বের হল না তাঁর; লাল পাপড়িগুলো ছিটিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে বাগানের সবুজ ঘাসে, সেগুলো দলে পিষে নিঃশেষ করেছে ওই দৈত্য।

—ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ?

সবেগে গিয়ে গাড়িতে উঠল। একা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইংরেজের ন্যায়ধর্মের প্রতিভূ ইলাইজা ইম্পে। সেও কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে, মামলার সাক্ষী-সাবুদ, নথিপত্র সব মিথ্যা হোক সত্য হোক তার অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন নেই; অলিখিত অক্ষরে মামলার রায় নির্ধারিত হয়ে গেছে। রচিত হয়ে গেছে ইংরেজের রক্তাক্ত ইতিহাসের একটি অধ্যায়—নন্দকুমারের জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে; কোথাও আলোর নিশানা নেই; দূর আকাশ কোলে জ্বলছে পথহারা একটি উজ্জ্বল তারকা, আকাশ-বাতাস ঝরা বকুলের গন্ধে বিভোর।

গঙ্গার তীরে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রপাঠ থেমে গেছে। সকলের মুখে চোখে চিন্তার ছায়া। আতঙ্কে শিউরে উঠেছে তারা। বাংলার আকাশ ছেয়ে কালো মেঘ নেমে আসছে ধ্বংসের রূপ ধরে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহারাজ নন্দকুমারকে ইংরেজ চক্রান্ত করে জালিয়াতির মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে শাস্তি বিধান করতে উদ্যত হয়েছে। ফাঁসির বিধান দিয়েছে ইংরেজ।

ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে একটা প্রতিবাদের সাড়া পড়েছে। বাণেশ্বর শর্মা, সমাজপতি কৃষ্ণগোপাল শর্মা, গৌরীকান্ত দেবশর্মা—আরও অনেকে গিয়ে হাজির হন ইংরেজ কাছারিতে আবেদন করতে।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং, নবকেষ্টর সামনেই গিয়ে হাজির হন তাঁরা। এতকাল যারা রাজনীতির বাইরে শান্তিতে জীবন যাপন করতেন—সামান্য দানে আশীর্বাদ বর্ষণ করতেন, সেই ব্রাহ্মণ সমাজকে ম্লেচ্ছের কাছারিতে আসতে দেখে বিস্মিত হয় দেওয়ানজী।

—আসুন, আসুন।

পাতু কাহার রেকর্ড-পত্র নিয়ে এসেছিল, দূর থেকে গড় হয়ে তাঁদের প্রণাম করে। সুতানটী, গোবিন্দপুর, কলিকাতার পূজ্য ব্যক্তি তাঁরা।

হাতের কাগজখানা এগিয়ে দেন দেওয়ানজীর দিকে—এর প্রতিবিধান করতে হবে দেওয়ানজী; আপনারা পদস্থ গণ্যমান্য লোক থাকতে এতবড় অনাচার ঘটবে—এটা কেমন কথা? নবকেষ্টবাবুও রয়েছেন!

একটু পড়েই চমকে ওঠেন দেওয়ানজী, অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন,

—সর্বনাশ! এ আমাদের ক্ষমতার বাইরে শর্মামশায়।

নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম রদ করবার জন্য আবেদনপত্র, নবকেষ্ট উসখুস করছে বাইরে যাবার জন্য; যদি ইংরেজ টের পায় সে ও এই চক্রান্তের সাক্ষী তবে তাকেও রেহাই দেবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণরা ওর পালাবার পথও বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে। দেওয়ানজীর নজর এড়ায় না এটা। গৌরীকান্ত শর্মা এগিয়ে আসেন।

—আপনারা সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিন। এই আবেদন আমরাই তাঁদের কাছে পেশ করব।

নবকেষ্ট বলে ওঠে—মাপ করুন আমাদের। হাতজোড় করছি। কিছু ভূমি, অর্থ চান, বলুন, চেষ্টা করে দেখি। না হয় মহারাজের একটা স্মৃতিমন্দির করুন, আমরা সাহায্য করতে পারি। তবে এ ভাবে—

শিউরে ওঠেন বাণেশ্বর শর্মা—থামুন নবকেষ্টবাবু, এমন কথা আপনার জিভের ডগায় এত সহজে আসে তা জানতাম না। দেওয়ানজী—আপনারও কি এই মত?

হাতজোড় করে দেওয়ানজী বলে—এতে কোন ফলই হবে না। ইংরেজ এই কাজ হাসিল করবার জন্য বহুদিন থেকে চেষ্টা করে আজ সফল হয়েছে। আপনারা কেন, সারাদেশের লোক বিদ্রোহ করলেও নিষ্কৃতি দেবে না তাঁকে।

—এতবড় অন্যায় অবিচার নীরবে সইবেন দেওয়ানজী?

চুপ করে রইল দেওয়ান। এ কথার জবাব দিলে কথাই বাড়বে। ওদিকে ছোটখাট 'রাইটার' সাহেবকে দেখা যাচ্ছে। নবকেষ্ট এই ঝুট ঝামেলা সরাতে চায়।

—তাহলে আসুন আপনারা। কিছু দান—ধরুন অর্থ, কিছু জমি?

—ভিক্ষা করতে আসিনি দেওয়ানজী! বরং আমরা কলকাতা ছেড়েই যাবার মনস্থ করেছি। পড়ে থাক আপনাদের অর্থ, ভূমি, সম্পত্তি।

চমকে ওঠে দেওয়ানজী—চলে যাবেন?

—হ্যাঁ, যে মৃত্তিকায় অন্যায় বিচারে ব্রহ্মহত্যা হয়, ব্রহ্মরক্তে সে মৃত্তিকা

অপবিত্র হয়ে ওঠে দেওয়ানজী, সেখানে দেবাধিষ্ঠান শাস্ত্রচর্চা চলে না। আমরা বালী গ্রাম, শিবপুর বা গঙ্গার পশ্চিমতীরে অন্যত্র কোথাও চলে যাবার মনস্থ করেছি।

ওঁরা বের হয়ে গেলেন। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে দেওয়ানজী। নবকেষ্ট বলে ওঠে—বাব্বা, ছিনে জোঁকের মত লেগেছিল, ছেলের হাতের মোয়া। দাও বললেই দিতে হবে। আরে বাপু, গেলি তো বয়েই গেল। বামুন কত পণ চাই? রূপোর জুতো মারব, ঢের বামুন গড়াগড়ি দেবে।

থামিয়ে দেন তাকে দেওয়ানজী—চুপ কর নবকেষ্ট। বড্ড বাজে বকো তুমি।

চাকরী করতে এসেছে, কিন্তু ওদের আবেদনের অন্তরালের আকুতি সে ভুলতে পারে নি। কিন্তু নিস্ফল ওদের অভিযান।

দেওয়ানজীও ব্যর্থ হয়েছে। রেজা খাঁ কলকাতায় এসেছে। দেওয়ানজী অবাক হয়ে যায় ওর পরিবর্তনে। রেজা খাঁয়ের মত লোক আজ রূপান্তরিত হয়েছে। ওর বাড়িতে দেখা করেছে সে।

—মহারাজকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছি দেওয়ানজী। প্রকাশ্যে না হোক রাত্রির অন্ধকারে। আপনি যদি সাহায্য করেন?

—কিন্তু! দেওয়ানজী ভাবছে। এতবড় একজন লোককে বাঁচান সম্ভব। অর্থের দ্বারা সবই সম্ভব। কারাগার থেকে বাইরে এনে রাতের অন্ধকারে দূর কাশী বা অন্যত্র কোথাও পাঠান যায়। কেল্লার নীচেই গঙ্গার বুকে থাকবে দ্রুতগামী নৌকা। রেজা খাঁ বলে ওঠে,

—টাকার জন্য চিন্তা করবেন না দেওয়ানজী। যত টাকা লাগে নিন।

—আপনি যাকে চিরজীবন শত্রু বলে জেনে এসেছেন—সেই মহারাজকে বাঁচাতে আজ আপনিই এসেছেন খাঁ সাহেব!

বৃদ্ধ ওর দিকে চেয়ে থাকে। মুখে ফুটে ওঠে প্রশান্ত হাসির রেখা—দেওয়ানজী, এতকাল ভুল পথেই চলেছিলাম নসীবের দোষে। যদি রেজা খাঁ আর নন্দকুমার একযোগে কাজ করতে পারত, হেষ্টিংসের ইতিহাস তৈরি হতো না; বাংলার রূপ বদলে যেত। মীরজাফর যে ভুল করে গেছে আমিও সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করেছি মাত্র। সর্বনাশ করেছি নিজের—সর্বনাশ করেছি বাংলার। আমার গোনাহর শেষ নেই।

ছমছমে অন্ধকারে বসে আছে খাঁ সাহেব। বলে—বাইরের সব আয়োজন তৈরি; ছিপ বাঁধা থাকবে কেল্লার ঘাটে; প্রহরীদেরও সংকেত করা আছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। বাংলার ওই একটি দীপ এখনও জলছে দেওয়ানজী, ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এ আমার আপনার সকলেরই দায়িত্ব।

বৃষ্টির ধারাপাতে সামনের আকাশ কোল ছেয়ে গেছে। বাতাস আছড়ে পড়ছে গাছের মাথায়, ম্লান আলোর সামনে কারাগারে বসে আছেন মহারাজ নন্দকুমার। ওদিকে রান্নার যৎসামান্য আয়োজন। কারাগারে স্বপাকেই খান তিনি। ওদিকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি। কম্বলের উপর বসে আছেন তিনি—সামনে গীতাখানা খোলা অবস্থায় রয়েছে। কি যেন গভীর ধ্যানমগ্ন।

জীবনের সব কাজের হিসাব নিকাশ চুকিয়ে দেবার পালা এসেছে। জীবনের বহু দিন—বহু স্মৃতি আজ স্মরণে আসে। বার বার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু নিয়তি তাঁকে ডাক দিয়েছে, এগিয়ে এনেছে মহাবিশ্বের পথে। অন্যায়কে প্রশ্রয় কোন দিনই দেননি—মিথ্যাকে ঘৃণা করেছেন। ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম পথে যাত্রা করেছেন—আজ জীবন দেবতার পায়ে পূত-পবিত্র শতদলের মত নিজেকে উৎসর্গ করবার দিন এসেছে। এসেছে মহা মুক্তির পরম লগ্ন।

ইংরেজ সরকার—হেস্টিংসকে তিনি বড় করে দেখেন নি, জীবনের সমস্ত শ্রী সত্যকে বিকশিত করে দিয়েছে ওদের দেওয়া অবিচার।

হঠাৎ কাকে সামনে দেখে চমকে ওঠেন মহারাজ! আবছা আলোয় এসে ঢুকল খাঁ সাহেব, সঙ্গে গুরুদাস। রক্ষীদিকে সরান হয়েছে। কথাটা পাড়ে সে—এখুনিই বের হয়ে চলুন মহারাজ! সব আয়োজন আমি করে এসেছি।

প্রান্তর পারে ছায়াঘন ভদ্রপুরের ছবি ভেসে ওঠে। উদার আকাশে মুক্তির আহ্বান! আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে যাবেন! কিন্তু! থেমে গেল মহারাজের মন।

—তা হয় না খাঁ সাহেব। এ ভাবে কারাগার থেকে পালিয়ে গেলে ওদের দেওয়া অপবাদ সত্য বলেই ভাববে ইংরেজ, আমার দেশবাসী সকলেই।

—আপনি কি আমাকে অবিশ্বাস করছেন? আল্লার দোহাই!

খাঁ সাহেবের কণ্ঠে অনুতাপের সুর। হাসছেন মহারাজ—মানুষের উপর বিশ্বাস কোন দিনই হারাই নি খাঁ সাহেব। পারেন তবে নবাবকে পথ দেখান

—বাংলাকে বাঁচান ওদের অন্যায় অত্যাচারের হাত থেকে! তার জন্য পথ পরিষ্কার করে গেলাম আমার রক্ত দিয়ে। আমার কথার সত্যাসত্য দেশবাসী, বিশ্ববাসী জানবে। একদিন হেস্টিংসকে এর জবাব দিতেই হবে।

দৃঢ় সতেজ কণ্ঠস্বর, মৃত্যুভয় তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি।

খাঁ সাহেব ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে।

রাত্রির শেষ যাম। নন্দকুমারের জীবনের শেষ রাত্রি। মুক্তি, বাইরের আকাশ আলোর সব আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সামনে মৃদু প্রকম্প আলোক-শিখায় কাঁপছে ওই বিষ্ণুমূর্তি ; সুন্দর অপরূপ এক জগৎ!

ত্বমাদি দেবঃ পুরুষ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে ; সারা অন্তরের আকুতি নিয়ে মাথা নীচু করেন নন্দকুমার।

ঊষা সমাগত—পূর্বাকাশে প্রথম আলোর স্পর্শ জাগছে। জীবনের শেষ প্রণাম জানালেন তিনি সত্যরূপী দিনদেবতাকে।

দমকা বাতাসে এক একটি করে পাতা ঝরছে। নিঃশেষে হারিয়ে যাচ্ছে তারা ; গঙ্গার ঢেউ ওঠে আবার মিলিয়ে যায়।

জীবনের ভিড়ে একটি মহাজীবনও হারিয়ে গেল। নদী মিশেছে মহাসমুদ্রে।

কলকাতার গঙ্গাতীর স্তব্ধ হয়ে গেছে। কাতারে কাতারে লোক অশৌচ স্নান করছে, মহাগুরু নিপাত ঘটেছে তাদের। বাণেশ্বর শর্মা, গৌরীকান্ত প্রমুখ অনেক সমাজপতিই কলকাতা পরিত্যাগ করে গেছেন। সারা বাংলা ছেয়ে নেমেছে শোকের, বিক্ষোভের নীরব কালো ছায়া। থমথম করছে আকাশতল।

সব শেষ হয়ে গেছে। হেস্টিংস নিশ্চিন্ত হয়ে আজ বলনাচের আয়োজন করেছে। হাতের সব রক্তের দাগ মুছে ফেলবে বিদেশী মদের ধারায় ; ইম্পে আজ প্রধান অতিথি। ইংরেজ মহলের সকলেই আমন্ত্রিত, রাইটার থেকে বোর্ডের

পর্যন্ত। হেস্টিংসের আলিপুর প্রাসাদ আলোয় জেগে উঠেছে। বিগ ব্যাণ্ডে দুপুর থেকেই বাজছে ইংরেজী সুর। হাওয়ায় উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক।

মণিবেগম হেস্টিংসের বলনাচে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। দামী কাতানি-কাতের সোনার চুমকিগুলো ঝলমল করছে সেজের আলোয়; বালুচরী উড়নী অশান্ত হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে। আকাশের বুকে বিদ্যুতের শেষ আভা মিলোতে না মিলোতে আবার ঝলসে উঠছে আকাশ। কাঁপছে ধরিত্রী থর থর করে কি যেন দুঃসহ বেদনায়। এই বাদল রাতেই অভিসার সাজে সাজছে বেগম। হেস্টিংস নিজে এসেছে তাকে নিয়ে যেতে; আনন্দে উপছে উঠছে মণিবেগম; মার্বেলের প্রশস্ত হলঘর মেতে উঠেছে ফ্রান্স থেকে আমদানি করা সেণ্টের তীব্র সুবাসে।

ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো গুরুদাস। সারা দেহমনে একটা ঝড় বয়ে গেছে। সুন্দর প্রশস্ত ললাটে ফুটে উঠেছে চিন্তার রেখা। দুচোখের স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে ঝরে পড়ে তীব্র ঘৃণা। মণিবেগম, হেস্টিংস দুজনেই ওকে দেখে চমকে ওঠে। পিতৃহীন গুরুদাস অশৌচ অবস্থাতেই এসেছে।

—আমার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে চাই।

মণিবেগম বিস্মিত হয়—সেকি! চলে যাবে?

—হ্যাঁ। এর পর একমুহূর্তও নিজামতে কাজ করা আমার পক্ষে মহাপাপ। আমাকে নিষ্কৃতি দিন।

মণিবেগম গুরুদাসের উপর কোনদিনই অতৃপ্ত হয়নি। বিশ্বস্ত কর্মচারী। —রাজগণপৎ উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছি ইংরেজের কাছে।

—আমাকে ওই বোঝা থেকে নিষ্কৃতি দেন বেগমসাহেবা; উপাধি খেলাত কোন কিছুরই প্রয়োজন আমার নেই।

গুরুদাস আজ কিছুতেই ভুলতে পারে না এতবড় সর্বনাশ—নীচতার কথা। ইংরেজ ওই মণিবেগমের সঙ্গে যোগ দিয়ে তার দেবতুল্য পিতাকে হত্যা করেছে! তাদের ক্ষমা করতে পারবে না কোনদিনই।

জীবনের কয়েকটা বছর কেটেছে এই জগতে, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিল গুরুদাস। বহু কামনা আশা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিল, আজ সব নিজের হাতেই নিঃশেষ করে দিয়ে বের হয়ে গেল।

বাইরে বর্ষণক্লান্ত তমসাচ্ছন্ন আকাশ তখনও থেকে থেকে গর্জন করছে দুঃসহ বেদনায়—বিদ্যুতের রক্তচক্ষু অলক্ষ্যে থেকে শাসনের চাবুক হানছে।

মণিবেগম চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। হেষ্টিংস ক্ষণিকের জন্য ওর চোখে কি যেন পরিবর্তনের চিহ্ন খুঁজে পায়।

—ডারলিং!

ফিরে চাইল বেগম; হেষ্টিংসের স্পর্শে চমকে ওঠে সে। কাঁপছে মণিবেগম, নীল নেশায় অতল অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে সে; নন্দকুমার, গুরুদাস, মবারকের কোন অস্তিত্বই সেখানে নেই। সব চিন্তা স্তব্ধ হয়ে যায়!

—লেট আস গো।

হেষ্টিংসের কাঁধে ভর দিয়ে বেগম নামছে। অসহায় একটি নারী।

মুর্শিদাবাদে শূন্য হাতে ফিরে গেছে রেজা খাঁ; চোখের উপর বার বার ফুটে ওঠে সেই বৃষ্টিঝরা রাতের আবছা অন্ধকারে দেখা কারাগারের ছবি, তপস্যাতে ব্রাহ্মণের তেজদৃপ্ত চোখ—তার শান্ত মধুর দৃষ্টি! জীবন বলি দিয়ে গেল সত্যের সন্ধানে। বাংলার লোক তাকে দেবতা বলে জানবে।

মবারক একটু বিস্মিত হয়ে গেছে, রোশনও। খাঁ সাহেব নিজে এসেছে তার মহলে। রোশন সরবত এনে দেয়।

—আপনি নিজামতে বসুন নবাব, নিজেই কাজকর্ম দেখুন। সাবালক হয়ে উঠেছেন, নিজের কর্তব্য নিজেকেই করতে হবে।

মবারক রেজা খাঁয়ের কথাগুলো ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না; রোশন ওর দিকে চেয়ে আছে। মবারক মত দিক; বুব্বুবেগমের আশা সফল হোক, রোশন খুশি হবে। মণিবেগম আর আইনত অভিভাবক থাকবার কেউ নয়; বৎসরান্তে কয়েক লক্ষ টাকা খরচও বাঁচবে; ওর প্রতিপত্তি কমবে। মবারক বলে ওঠে,

—ওসব ব্যাপারে আমায় কেন টানছেন খাঁ সাহেব? আপনারা, বেগম-সাহেবা থাকতে আমি আর কি করব?

রেজা খাঁ ওকে নিয়ে গিয়ে নিজামতে বসিয়ে—দায়িত্ব মুক্ত হতে চায়।

—তবু আপনি বসবেন নিজামতে কাল থেকেই।

মণিবেগম কলকাতা থেকে ফিরে আসবার আগেই রেজা খাঁ এই কাজটা চালু করতে চায়। হীন চক্রান্তে আর জড়িত থাকতে চায় না সে। সেই সম্বন্ধে সিদ্ধান্তটা জানিয়ে গেল।

ভাবছে মবারক। জাঁকজমক, হৈ-চৈ লোকজনের হাজারো দৃষ্টির সামনে সেই মূল্যবান আসনে কিংখাবের গদিতে বসতে লজ্জা বোধ করে, নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হয় তার। কপাল ঘামছে।

—শরাব! শরাব! লে আও।

রোশন স্তব্ধ পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। মদ, মদের নেশা তাকে দুর্বল করে দিয়েছে। মণিবেগম তাই বোধ হয় মদই ধরিয়েছিল কিশোর মবারককে। গর্জন করে ওঠে মবারক।

—শুনতে পাচ্ছো না?

কথা কয় না রোশন; ইচ্ছা করেই দাঁড়িয়ে রইল সে, ঘৃণা ফুটে ওঠে দুচোখের দৃষ্টিতে। মবারক উঠে এসে ওর লাল গালে সজোরে এক চড় বসিয়ে দেয়—উল্লুক কাঁহাকা? বাংলার নবাবের হুকুম তামিল করতে হয় তা জান না?

ফিরে চাইল রোশন, ডাগর দুচোখে জ্বালা; গণ্ডদেশ আরক্তিম হয়ে উঠেছে।

—মসনদে বসবার ভয়ে যিনি মদের নেশায় বেহুঁশ হয়ে থাকতে চান—তাঁকে নবাব বলে কুর্নিশ করতেও ইজ্জতে বাধে; হুকুম তামিল তো দূরের কথা।

চমকে ওঠে মবারক; ওই আগুনজ্বালা রূপবতী নারীর সামনে ওর মনের সব খবরই; চিৎকার করে উঠতে গিয়ে ওর দিকে দৃষ্টি পড়তেই অবাক হয়ে যায় মবারক; কাঁদছে বাঁদী। দুচোখ দিয়ে জল ঝরছে।

বহু নারীকেই নির্যাতন করেছে মবারক; ওর হাতের চাবুক অনেকেরই সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করেছে; শাসন অত্যাচার ওর কাছে নতুন নয়। বিবি-মহলের অনেকেরই পিঠে সে কাহিনী লেখা আছে। আজ ওর চোখে জল দেখে কেমন যেন ভাবান্তর আসে, অসহ্য বেদনায় মুচড়ে ওঠে মন; নিজেকে আজ অত্যাচারী হৃদয়হীন বলে বোধ হয়।

—রোশন!

মুখ তুলে চাইল রোশন, একমুঠো অশ্রুসিক্ত যুঁই ফুল! অপরাধীর মতই বাংলার নবাবজাদা বলে ওঠে,

—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে রোশন। আমি নিজামতে গিয়ে বসব।

মাথা নীচু করে কুর্নিশ করে রোশন—বাঁদীর গোস্তাকী মাপ হয় জনাব।

রোশনকে কাছে টেনে নেয় মবারক; রোশনের অশ্রু ভেজা মুখখানা

হাসির আভায় সুন্দরতর হয়ে ওঠে, একফালি ভিজে সবুজের উপর অপরাহ্নের রৌদ্রাভা এনেছে কি এক মায়া স্পর্শ।

মোহনপ্রসাদ, ইয়ার জঙ্গ, জগৎচাঁদ আজ নিজামতের প্রধান হবার স্বপ্ন দেখে। রেজা খাঁকে এই সময়ে মবারককে আনতে দেখে ওরাও ঘাবড়ে গেছে। রেজা খাঁ প্রকাশ করে কথাটা—নবাব সাবালক হয়েছেন, নিজেই তিনি স্টেট দেখাশোনা করবেন।

অর্থাৎ চুনোপুঁটির রাজত্ব আর চলবে না। খাতাঞ্চিখানায় হুকুম দেয় খাঁ সাহেব—নবাবের পাঞ্জা ছাপ ছাড়া কোন খরচ বরাদ্দ হবে না।

চিন্তিত হয়ে উঠেছে ইয়ার জঙ্গ, চাচাজী শেষকালে 'হজ' যাবার বন্দোবস্ত করছে, নইলে দরবেশের মত সৎ হবার শখ কেন?

রেজা খাঁ সমস্ত খরচপত্র, হিসাব কিতাব—কেতা দুরস্ত করে নিজামতের মরচে পড়া চাকাটা সচল করে তুলতে চায়।

রোশনকে আজ বুব্বু বেগম বুকে টেনে নেয়, তার আপ্রাণ চেষ্টায় মবারক আবার সৎ হবার পথ পেয়েছে। খাঁ সাহেব আজ এসেছিল—কোম্পানির বোর্ডে গভর্নর জেনারেলের কাছে চিঠি দেওয়া হল। নবাব নিজের স্টেট নিজেই চালাতে চান। মণিবেগমকে এবার নিষ্কৃতি দেওয়া হোক।

মবারক নবাবীর স্বাদ পেতে চায়। খাঁ সাহেবকে পাশে নিয়ে বাংলার মসনদের স্বপ্ন সত্যে পরিণত করবে।

কলকাতায় খবরটা পেয়েই চমকে ওঠে হেস্টিংস, মণিবেগমও। ধূর্ত রেজা খাঁয়ের নেতৃত্বে আজ মবারক নিজেই গদি নিতে চায়, মণিবেগমকে অভিভাবক বলে মানতে রাজি নয়। মহারাজের মৃত্যু ওদের মনে প্রতিবাদের ভাব এনেছে। মণিবেগম সংবাদটা শুনেই চিন্তিত হয়ে ওঠে।

মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেই মবারককে ডেকে পাঠিয়েছে। আজ হিংসা এবং স্বার্থের জন্য ক্ষেপে উঠেছে মণিবেগম।

বজরা থেকে নেমে পালকিতে আসছিল, জনতার কেউ যেন তাকে দেখেও দেখেনি। কেউ ভুলেও হাত ওঠায় নি কুর্নিশ করতে; নিজামতের সামনে এসে অবাক হয়ে যায়; যথারীতি কাজ চলেছে। নকীবের চিৎকার শোনা যায়।

মবারকের নামের আগে পিছে কতকগুলো লেজুড় জুড়ে পুরোপুরি নবাবী মর্যাদা দিয়ে ঘোষণা করছে তার পেশকাশ্।

মণিবেগম পাতলা ঠোঁট মুক্তোর মত দাঁত দিয়ে চেপে শোনে মাত্র। ওরা দল বেঁধে চক্রান্ত করছে ওর বিরুদ্ধে।

রেসিডেন্ট মিডলটন একা এসে হাঁটু গেড়ে মণিবেগমের সামনে বসে সম্মান দেখায়। হেস্টিংসের গোপন নির্দেশনামা তার হাতে দিয়ে বেগমসাহেবা ওর দিকে চাইল। রাতারাতি কাজ গুছিয়ে নিতে হবে। এ কাজে মিডলটন নিপুণ, এবং এর মূল্যও পাবে সে। কয়েক বারই এ কাজ করেছে সে।

মবারককে ডাকতে পাঠিয়ে পায়চারি করছে বেগম। যেমন করেই হোক এ যাত্রা তাকে বাঁচতেই হবে। মবারককে ওদের হাতে যেতে দিলে তারই সর্বনাশ।

মবারক ঢুকছে বেগমের মহলে দীর্ঘ দিন পর। সমস্ত সামর্থ্য, শক্তি তার নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কাঁপছে বুক। মনে হয় একান্ত অসহায় সে।

মণিবেগম স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে কঠিন তীব্র চাহনিতে, ওর সন্ধানী দৃষ্টির সামনে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

কুর্নিশ করে দাঁড়ালো মবারক ; ইচ্ছা করেই তাকে বসতে বলে না বেগম। কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তোমার নবাবীতে আমি বাধা দিই নি মবারক, আমাকে কোম্পানির বোর্ডের কাছে, জনসাধারণ—নিজামতের কর্মচারীদের সামনে এ ভাবে অপমান করবার কি প্রয়োজন ছিল? আমাকে বললে কি তোমায় দরবারে যেতে বাধা দিতাম?

জবাব দেয় না মবারক। সারা কণ্ঠ তালু শুকিয়ে আসছে। মণিবেগম বলে চলেছে—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তৈরি করেছিল ওই রেজা খাঁ। বাঁদী রোশন আর সেই ধূর্ত ভণ্ড তোমার উপদেষ্টা?

আর কি যেন বলতে গিয়ে থামল বেগম। মবারকের পা কাঁপছে।

বাঁদীকে হুকুম করে বেগম—সরবত আন।

এ সরবতের প্রক্রিয়া অন্যরকম ; তীব্র মরফিয়ার মিশ্রণে তৈরি ; মানুষের ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন চিন্তাক্ষমতা পর্যন্ত লুপ্ত করে দেয় এর নিয়মিত ব্যবহারে। মণিবেগম আজ সেই পথ নিতেও কৃতসঙ্কল্প হয়েছে। একবার এর নেশা ধরলে কোন মানুষই ছাড়তে পারে না।

গুলাব চূর্ণ মিশানো সরবত পান করে মবারক যেন দম ফিরে পায়!

—বসো।

বসলো বেগমের ইঙ্গিতে।

—বিশ্বাস করছো রোশন আর রেজা খাঁকে ?

ওর প্রশ্নের জবাব দিল না মবারক ; শুধু চোখ তুলে চাইল মাত্র।

—ওদের পরিচয় জানো না মবারক, যেদিন জানবে সেদিন শিউরে উঠবে। সত্য কোন দিনই চাপা থাকে না—প্রকাশ পাবেই, সেদিন তোমার এ ভুল ভাঙবে।

মবারক কুর্নিশ করে বের হয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এর চেয়ে নবাবী ছেড়ে দেওয়া ঢের সোজা কাজ। দরকার কি ওসব ফ্যাসাদে।

রোশন আজ অবাক হয়ে যায়। নিজামত থেকে সোজা মবারক ফিরে আসে তার মহলে। রোশন নিপুণ হাতে ফলমূল সাজিয়ে রাখে, ফলের সরবত তৈরি করে, আস্ত তরমুজের এক দিকে ছিদ্র করে তাতে চিনি পুরে মজতে দেয়।

অবসর ক্ষণে নিজেকেও সাজিয়ে নেয় মনোমত করে, পরনে ওর ঢাকাই বুটিদার, হালকা রং মবারকের পছন্দ। থেসের ওড়নায় ক্ষীণ স্বচ্ছ আবরণে নিজেকে ঘিরে রাখে। সারাজীবনের চাওয়া-পাওয়া তার মুঠোর মধ্যে এসেছে। এ কোন স্বপ্নলোকের পরী সে, গুলমোরের সুবাসমাতাল বনে বনে হারিয়ে যাওয়া বুলবুল।

খবরটা শুনে চমকে ওঠে রোশন। মণিবেগম ফিরে এসেছে, মবারক গেছে তারই মহলে। পথ চাওয়াই বৃথা হলো। পড়ে রইল মীর্জার বাগানের তাওয়াদার আম, মধুর গন্ধে উড়ছে দু'একটা মাছি ; খরমুজার খোসবু কেঁদে ফেরে বাতাসে। সূর্য ডুবে গেল হীরাঝিলের বাগান সীমায় ; কালো আঁধার ঢেকে নামল রাত্রি, রোশনের সামনে নিভে আসছে সব রোশনী।

ইয়ার জঙ্গকে অসময়ে ঢুকতে দেখে একটু বিস্মিত হয় রোশন। হয়তো জরুরি কোন খবর আছে। আবছা অন্ধকারে ওর চাহনির সামনে দাঁড়াতে ভয় হয় রোশনের, সরে গেল পাশের ঘরে।

নির্জন মহলের মধ্যে একা ওর পাশে দাঁড়িয়ে কোন প্রশ্ন করতে সাহস পায় না সে।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানে না ; মবারক ফিরছে। তার পায়ের শব্দে এগিয়ে এলো রোশন। ওকে দেখেও দেখে না আজ নবাব, পা দুটো টলছে—চোখের দিকে চাওয়া যায় না। এ যেন আগেকার সেই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল নবাব। মুখে চোখে তেমনি শ্বাপদ লালসা মাখানো।

মণিবেগম আজ রোশনকে হার মানিয়েছে। ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় মবারককে।

—জনাব! আর্তনাদ করে ওঠে রোশন।

—চোপ রও! গর্জন করে ওকে থামিয়ে দেয় মবারক।

সরবতের গ্লাসটা তুলে ধরতে যাবে মুখের কাছে, বাধা দেয় ইয়ার জঙ্গ।

—খাবেন না হুজুর। জহর!

—বিষ! মবারক, রোশন একসঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে।

ইয়ার জঙ্গ বলে চলেছে—ওই বাঁদীর কাজ জনাব। আজ টের পেয়েই আমি এসে হাজির হয়েছি। কোন খসমকে মসনদে বসাবার জন্য আপনাকে জহর দিতে সাহস পেয়েছে তাই ওকে জিজ্ঞেস করুন মেহেরবানি করে।

রোশনের দিকে চেয়ে আছে মত্ত নবাব ; পাশেই একটা বিড়াল বসেছিল, তার সামনে খানিকটা সরবত ঢেলে দিতেই খেতে শুরু করে সে।

বুক কাঁপছে রোশনের ; চোখের সামনে জেগে ওঠে অতলস্পর্শী খাদ ; পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ব্যাকুলভাবে চেয়ে রয়েছে বিড়ালটার দিকে, কয়েকটা মুহূর্ত।

বিড়ালটা বার কতক আর্তনাদ করেই স্তব্ধ হয়ে যায়, তীব্র বিষ তার প্রাণ-শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে। সমস্ত কিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে।

গর্জন করে ওঠে মবারক—শয়তানী!

ওর পায়ের কাছে পড়ে মাথা ঠুকতে থাকে রোশন ; চোখের জলে পাথরের মেজে ভিজে যায়, আর্তনাদ করছে সে।

—এর বিন্দু বিসর্গও জানি না জাঁহাপনা! আল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি।

ছিটকে পড়লো রোশন এক লাথিতে। গর্জন করছে মবারক।

মিডলটন নিমকহারাম নয়। বেগমের নিমকের মর্যাদা সে রেখেছে।

কয়েকদিন পরই রেজা খাঁয়ের খাতাপত্র, হিসাবনিকাশ, তহবিল পরীক্ষা করে নিজামতের হিসাবে পঞ্চাশ হাজার টাকার গোলমাল সৃষ্টি হয়ে গেল চোখের পলকে।

রেজা খাঁও অবাক। ইংরেজ ভেল্কি জানে।

—উই শ্যাল রিপোর্ট দি ম্যাটার টু দি গভর্নর জেনারেল। মিডলটন খাঁ সাহেবকে যেন শাসাচ্ছে। এর ফলাফল কি তাও জানে বৃদ্ধ রেজা খাঁ। ধূর্ত ইংরেজ যখনই কোন কুকাজ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—সঙ্গে সঙ্গে অজুহাতও তৈরি করে নেয়।

ওকে নিজামত থেকে বিতাড়িত করবার চক্রান্ত পাকাপাকি ভাবেই করেছে তারা। মবারক—মণিবেগমও সংবাদটা পায়। মণিবেগম মুচকি হাসে মাত্র, মবারক গর্জন করে,

—তামাম ছুনিয়া বেইমান।

মণিবেগম বলে ওঠে—ওদের হাতে নবাবী তুলে দিতেই বাধা দিয়েছি মবারক। তবুও তুমি আমাকে বিশ্বাস করনি।

আজ তার সমস্ত বিশ্বাস ফিরে গেছে মণিবেগমের উপর। রোশন বাঁদীর ছুঃসাহসের কথা ভাবলে আজও শিউরে ওঠে মবারক। রেজা খাঁ! তার প্রকৃত স্বরূপ সে চিনেও চেনেনি।

—এ নবাবী আমি চাই না আম্মাজান। তোমার কথাই সত্যি—বাংলার মসনদে রক্তের ছাপ আঁকা আছে।

চোখের সামনে সেই সন্ধ্যার কথা ভেসে ওঠে; নিদারুণ মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে বিড়ালটা। অমনি অসহ্য বেদনায় মুচড়ে উঠে স্তব্ধ হয়ে যেত তার দেহ! ওর আতঙ্কিত চেহারার দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টে মণিবেগম। ওর পাশ থেকে ছুটি স্তম্ভকে নিপুণভাবে সরিয়ে দিয়েছে সে—রেজা খাঁ আজ মবারকের চোখে চোর। রোশন একটি রক্তাক্ত ছুঃস্বপ্ন; তাকে নিঃশেষে ভুলতে চায় মবারক।

২৫শে অগস্ট—হেস্টিংস কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারে; মণিবেগম আবার পায়ের নীচে মাটি পেয়েছে। তার প্রিয়তমার জন্য চিন্তিত না হয়ে পারে নি সে। নবাব মবারক নিজে আবেদন জানিয়েছে।

From the time of her suspension until now, I have passed my time, and do still in great trouble and uneasiness. As all

affairs, and particularly the happiness and prosperity of this family, depends on your pleasure, I now trouble you in hopes that you will be so kind as to write in fit and proper terms to her Highness the Begum, that she will always, aa formerly, employ her authority in the administration of the Nizamat and the affairs of this family.

চতুর ইংরেজ এই চিঠিতেই কোন সিদ্ধান্ত লিখিত-পড়িত ভাবে নেয় নি। মণিবেগমকে আরও পাকাপাকি ভাবে নিজামতের এবং নবাবের পক্ষে অপরিহার্য করবার জন্য আরও আবেদন-নিবেদনের অপেক্ষায় ছিল।

৩রা সেপ্টেম্বর, আবার নবাব মবারকউদ্দৌলা ব্যাকুল ভাবে আবেদন জানাচ্ছে।

—Oh I die, I perish, I sink if Moni Begum is not put into the Government of the country. I therefore desire to have her put into the Government of the country, and that you will not keep me longer in this painful suspense.

মনে মনে আজ খুশি হয়েছে হেস্টিংস। মিডলটন রেজা খাঁয়ের বিরুদ্ধে পাকা যুক্তি খাড়া করেছে। নবাবও অধৈর্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং ক্ষেত্র প্রস্তুত।

বোর্ডের সামনে এবার সমস্ত রেফারেন্স দেখিয়ে তার সিদ্ধান্ত পেশ করবে এবং সমর্থন করিয়ে নিতে কোথাও আটকাবে না।

মণিবেগম আবার মসনদের সর্বময়ী কর্ত্রী হবে; হেস্টিংস নিজের মনে হাসছে, চাকা আবার ঘুরেছে নিরাপদেই।

প্রতিবাদ করবার উপায় আর বোর্ডের নেই। কর্নেল মনসন, জেনারেল ক্লেভারিং দুজনেই রোগশয্যায়। তাঁরা প্রতিবাদ করে ক্লান্ত হয়েছেন—হতাশায় ভেঙ্গে গেছে তাঁদের বুক। যে শপথ নিয়ে এসেছিলেন—সেই পবিত্র শপথ রক্ষা করতে তাঁরা পারেননি। ভারতবাসীদের ওদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন নি তাঁরা।

নন্দকুমারের আত্মা আজও হাহাকার করে আকাশে বাতাসে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আসামীদের কোন বিচারই হয় নি; কাশীর হিন্দুরাজকে হেস্টিংস সর্বস্বান্ত করেছে, রোহিলাদিকে হত্যা করেছে—নারীত্বের চরম লাঞ্ছনা করেছে হেস্টিংস অযোধ্যার অসূর্যম্পশ্যা বেগমদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে,

ভারতবর্ষকে শ্মশানভূমি করে তুলেছে—ইংরেজ জাতির নামে এনেছে দুরপনেয় কলঙ্ক।

তাঁরা বাধা দিতে পারেন নি। চোখের সামনে ঘনিয়ে আসছে মৃত্যুর ছায়া। জন ক্লেভারিং আজ দেশ ছাড়া হয়ে সাতসমুদ্র পারে এসে ভারতবর্ষের জন্য চিন্তা করছেন—শেষ বেদনার্ত নিশ্বাস ফেলে গেলেন হতভাগ্য নিঃস্ব ভারতবাসীদের জন্য।

মিঃ ফ্রান্সিস চোখের সামনে দেখলেন জন ক্লেভারিং-এর অপমৃত্যু। হেষ্টিংসের একটি শত্রু নিপাত হল অবহেলা, লাঞ্ছনা আর হতাশায়। একজন প্রকৃত ইংরেজের মৃত্যুর জন্য দায়ী ওই হেষ্টিংসই; কর্নেল মনসনকেও এমনি অনাদৃত অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ফেলতে হ'লো।

ক্লেভারিং, কর্নেল মনসনের আত্মা শান্তি লাভ করুক; মিঃ ফ্রান্সিস এই দিনগুলোর কথা ভুলতে পারেন না। ওঁদের মত নীরবে তিনি হেষ্টিংসের সমস্ত অনাচার সহ্য করবেন না।

রেজা খাঁকে পদচ্যুত করার কোন সঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পাননি; ক্লেভারিং, মনসনও প্রাণ দিয়ে গেছেন; মার্টিনের মত প্রকৃত ইংরেজ পদত্যাগ করে প্রতিবাদ জানাল। এরপর তাঁর নিজের পালা।

রেজা খাঁয়ের এই পদচ্যুতির ব্যাপার নিয়ে তিনি কোম্পানির লণ্ডনের বোর্ডের কাছে কড়া 'নোট' দিয়ে তারই জবাবের আশায় রয়েছেন। ব্যভিচারের নির্লজ্জ প্রকাশে হেষ্টিংস পশুকেও হার মানিয়েছে। মণিবেগমের মত তওফাওয়ালীর হাতে আবার তুলে দিয়েছে বাংলার মসনদ, কোম্পানির স্বার্থের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না রেখে।

অন্ধকার কারাকক্ষের এক প্রান্তে বসে আছে রোশন; উপরের একফালি জানলা দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে এক চিলতে আলো, ওইটুকু দেখেই রোশন দিনরাত্রি সন্ধ্যাকালের হিসাব করে। ভুল করেই ভালবেসেছিল মবারককে। হৃদয়হীন পাষণ্ড; ওর প্রেমের কোন মর্যাদাই সে দেয়নি; এক মুহূর্তেই অবিশ্বাস করেছিল রোশনকে যে তাকেই ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল সর্বনাশের মুখ থেকে।

বুক ভেঙ্গে কান্না আসে। কিন্তু কাঁদবে কার জন্য? বাঁদীর বেগম হবার

শখ! ওয়াজিদ বীণকার সেদিন মসনদের নির্জন ঘরে তাকে দেখে হেসে উঠেছিল। দরবেশ কি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিল তার আগামী ভবিষ্যতের নিষ্ঠুর এই পরিণতি? এর চেয়ে দীন দরিদ্র জীবনই ছিল ভালো, মোহব্বতের ফাঁসে জড়িয়ে এমনি করে তিলে তিলে মরতে হ'ত না।

দরজাটা আর্তনাদ করে খুলে গেল। কে যেন এগিয়ে আসছে। একফালি আলোয় কাছে আসতে ওকে দেখে চমকে ওঠে রোশন। মণিবেগম আসছে। পিছন থেকে হেঁকে ওঠে প্রহরী,

—বেগমসাহেবাকে কুনিশ কর বাঁদী।

বাঁদী আজ বেপরোয়া; বেগমসাহেবা তাকে ভয় করে, তাই বন্দী করে রেখেছে। জানে মনে মনে রোশন আজও সে পারে তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে। মাথা উঁচু করে বিজয়িনীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল বাঁদী। মৃত্যুকে সে আর ভয় করে না; তিলে তিলে তাকে প্রত্যক্ষ করেছে অন্ধকার এই কারাগারে।

—এখনও সাহস আছে দেখছি? বেগম এগিয়ে আসে।

রোশন মুখ তুলে চাইল, ভয় সে আর পায় না। তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে বেগম—বাঁদীর বেগম হবার শখ মিটেছে?

—তওফাওয়ালী যদি পর্দানসীন বেগম হতে পারে—বাঁদীর কাছে তাও কি আশমানের চাঁদ চাওয়ার মতই অসম্ভব হবে?

চমকে ওঠে বেগম। নিজের অতীতকে সে ভুলতে চেয়েছে; সেই নিষ্ঠুর অতীতকে প্রকট করে তুলেছে ওই বাঁদী। আগুনজ্বালা ওর রূপ! ওরা সব পারে; মসনদের ইতিহাস অমনি নীল চোখের মায়ায় উলটে গেছে কতবার।

—সে সাধ আমি মিটিয়ে দোব রোশন। বিবিমহলে যাবে?

শিউরে ওঠে রোশন! রাতের আঁধারে সেখানে নারীমাংসলোলুপ মানুষ-নেকড়ের দল হানা দেয়—তাদের জ্বলন্ত হাজারো চোখ যেন অন্ধকারেই এগিয়ে আসে।

—তার চেয়ে আমার এই কারাগারই ভালো বেগমসাহেবা।

বাঁচতে হলে মানুষের পরিচয়েই বাঁচতো রোশন। জীবন যৌবন তার ব্যর্থ হয়ে গেছে, আগুনজ্বালা রূপের আগুনে নিজেই জ্বলে পুড়ে খাক হয়েছে সে!

হাসছে বেগম। রোশন মোহব্বৎ করেছিল সত্যিই। তাই বেচারা জান

দিতেও ভয় পায় না—ইমানের ইজ্জতের জন্য। কিন্তু কি দাম শুকনো মহব্বতের ? ওয়াজিদ বীণকার তার দিকে ফিরেও চায়নি—মবারকও ভুলে গেছে ওকে। নিজের সেই ব্যর্থ জীবনকে চরিতার্থ করতে গিয়ে ভুলের পর ভুল করে চলেছে আজও ; হিংস্র হয়ে উঠেছে। ওই আগুনজ্বালা রূপ নিয়ে তেমনি হিংস্র রোশন বাইরে গেলে -মণির সর্বস্ব কেড়ে নেবে দুদিনেই।

—তাই হবে রোশন ; আঁধার কোণে জীবনের শেষ ঘনিয়ে আসুক।

দরজাটা বন্ধ হয়ে যায় আবার। নেমে আসে স্তব্ধ নির্জনতা। উপরের ছোট জানালাটা ওরা ইট দিয়ে গেঁথে তুলেছে।

চিৎকার করে ওঠে রোশন—ওটুকু আলো বাতাস থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না ; মসনদ বেগম পদ কিছুই চাই না আমি ; একটুকু আলো, ওইটুকু হাওয়া আমাকে পেতে দাও।

ওর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে। নিরন্ধ্র অন্ধকার জুড়ে ফুটে ওঠে একটা করুণ ছবি—ফৈজির মুখখানা। ফৈজিও হীরাঝিলের প্রমোদকক্ষে এমনি করে মরেছিল অতল অন্ধকারে। রূপ! রূপের অভিশাপ নিয়ে সেও এসেছিল ; আজ আবার ফিরে এসেছে রোশন। সে দীপও ফুৎকারে ওরা নিভিয়ে দিল।

—মবারক!

ওর আর্তনাদ আর মানুষের জগতে কোন দিনই পৌঁছবে না ; ইট পাথরের দেওয়ালে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে বিকট হুঙ্কারের মত নিষ্ঠুর শোনায় ওই নাম! দুকানে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়াল রোশন। চোখের সামনে পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমাট বেঁধে তার নিশ্বাস রুদ্ধ করে তুলেছে।

ফ্রান্সিসের আবেদন নিষ্ফল হয়নি। লণ্ডন অফিস থেকে জবাব এসেছে। হেষ্টিংস বহু অর্থ অপব্যয় করেছে ; যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি অরাজকতা এনেছে ভারতে। ওদিক থেকে মারাঠারাও আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে ; আবার যুদ্ধ। বিনা রক্তপাতে ইংরেজ কোম্পানি বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে দিয়ে ভারতের রাজদণ্ড ধরেছিল ; বিনা মূলধনে লাভ করেছিল এতকাল, হঠাৎ সেখানে যুদ্ধ, সৈন্য-সামন্ত পোষার খরচ চাপতেই চিন্তিত হয় ; আরও চিন্তার কারণ, তারা যদি যুদ্ধে পরাজিত হয় একবার—ভারতের আভ্যন্তরীণ

গোলমালে পদানত শক্তিও মাথা তুলবে, ছারখার করে দেবে বিনা রক্তপাতে অর্জিত এই সাম্রাজ্য। হেস্টিংসের নীতিকে আর যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কোম্পানি। নতুন কমিশন আসছে—হেস্টিংসের নীতির তদন্ত করতে।

একদিকে রোহিলা, অন্যদিকে মারাঠা শক্তি আবার নতুন উদ্যমে ইংরেজকে আক্রমণ করছে। এই সময় হেস্টিংস বাধা পেয়েই স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফ্রান্সিসই এর জন্য দায়ী।

ফ্রান্সিস আজ জোর করে আপত্তি জানান, রেজা খাঁয়ের মত যোগ্য লোকের জায়গায় মণিবেগমকে বসানো অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

Simply she is a whore, the object of your passion and flame, to which you sacrifice as much as Antony ever did to Cleopatra.

—মিঃ ফ্রান্সিস! হেস্টিংসের ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে—আই শ্যাল টিচ ইউ এ লেশন।

—সে চেষ্টা তুমি করো হেস্টিংস।

ফ্রান্সিস আজ হেস্টিংসের শাসনের স্বরূপ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। ক্লেভারিং, মনসন চেষ্টা করেও ব্যর্থহতাশা নিয়ে বাংলার মাটিতে অকালে প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা; নন্দকুমারকে বিচারের প্রহসনে হত্যা করেছে ওরা। মণিবেগম আজও বিলাসব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে হেস্টিংসের প্রিয়তমার ভূমিকায়।

সব রহস্য প্রকাশ করছেন ফ্রান্সিস; লণ্ডন অফিসে সমস্ত সংবাদই সরবরাহ করেছেন, হেস্টিংসের প্রমোদরাজ্যের শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে, এখানকার কাজ তার শেষ হয়েছে—দেশে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

সকালের আলো তখনও ফুটে ওঠেনি, জনহীন গঙ্গার সরু খালের ধারে এসে দাঁড়ালেন ফ্রান্সিস—সামনে আজ হেস্টিংস। দুজনের হাতেই পিস্তল। দুই মতের বিরোধ আজ এই নৃশংস দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। উপলক্ষ্য এক বিদেশিনী নারী, হেস্টিংসের বাঞ্ছিতা সে—ফ্রান্সিসও নাকি তাকে ভালবাসেন। আসলে দীর্ঘ কয়েক বৎসর ফ্রান্সিস তাকে প্রতিটি কাজে বাধা দিয়ে এসেছেন; তার শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করেন নি। আজ তারই সংবাদে ভিত্তি করে লণ্ডন অফিস থেকে এসেছে রেজা খাঁকে নিযুক্ত করবার হুকুম; হেস্টিংসের উপর কড়া মন্তব্য প্রয়োগ করা হয়েছে।

আবছা আলোয় গর্জন করে ওঠে পিস্তল। ফ্রান্সিসের হাঁটুতে আঘাত লেগেছে। হেষ্টিংস নীরবে সরে গেল। সভ্য ইংরেজের এই বর্বর যুদ্ধের সাক্ষী রইল খালের ধারের গাছ গাছালি।

মুর্শিদাবাদের বিবিমহল রাতের অন্ধকারে ঝিমিয়ে পড়েছে; বিনিদ্র রজনীর প্রহর কার আর্ত চিৎকারে চমকে ওঠে। ইয়ার জঙ্গ ফিরছে বাড়ির দিকে; বিবিমহলেই কাটে তার রাত্রি; মদের নেশায় পা পড়ছে না। চোখের চাহনি কেমন ঝাপসা; টলছে এদিক ওদিকে।

হঠাৎ কার খিল খিল হাসির শব্দে থমকে দাঁড়াল; সমস্ত চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে; অতীতের এক কামনামদির স্বপ্ন। আবছা অন্ধকার ভেদ করে সেই স্মৃতি কি এক নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মত এগিয়ে আসছে।

—মায়া! ওকে দেখলে চেনা যায় না। মলিন শতচ্ছিন্ন কাপড়, হাতের নখগুলো বেড়ে উঠেছে; দুচোখের দৃষ্টি কেমন উদ্‌ভ্রান্ত। সেই রূপবতী কন্যা আজ জীবন্ত অভিশাপের মত জাগর রাত্রির প্রহরে মুর্শিদাবাদের পথে পথে ঘুরে বেড়ায় কার সন্ধানে। সব আশ্রয় তার হারিয়ে গেছে।

সীতানাথ পণ্ডিতকে হত্যা করেছে, কিন্তু মহারাজকে বাঁচাতে পারেনি; সারা বাংলার মাটি সেই পুণ্য রক্তে নিষিক্ত করেছে তারা। আজও মায়া ভুলতে পারেনি সেই শান্তিময় কুঁড়েঘরের স্বপ্ন।

হ্যাঁ। একখানা শ্বাপদ লালসাভরা মুখ! সেই পৈশাচিক দৃষ্টি! তার সব স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। হঠাৎ অতিপরিচিত সেই শয়তানকে আসতে দেখে এগিয়ে যায়। ইয়ার জঙ্গ ওকে সামনে দেখে অবাক হয়।

—মায়া!

মায়া হাসছে পাগলের মত; ওর দিকে এগিয়ে যায়।

ইয়ার জঙ্গ যেন ভয়ে চিৎকার করতে চায়; লাফ দিয়ে ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মত এসে পড়েছে মায়া, প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে ওর কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে; বড় বড় নখগুলো দিয়ে চুইয়ে পড়ছে রক্ত। মত্তপ ইয়ার জঙ্গ বাধা দেবার চেষ্টা করেও পারে না, কেমন যেন বেহুঁশ হয়ে পড়ে সে; ওর জ্ঞানহীন দেহটা সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল, তার বুকের উপর বসে কণ্ঠনালী টিপছে প্রাণপণ শক্তিতে সেই উন্মত্ত নারী।

হাসছে পৈশাচিক তৃপ্তিতে খল খল করে। রাতের আঁধার শিউরে ওঠে! রক্ত, তাজা উষ্ণ রক্ত তার হাতময় ছড়িয়ে লেগেছে।

মবারক চমকে ওঠে, আতঙ্কিত হয়েছে সে। পরদিন সকালেই ইয়ার জঙ্গের মৃতদেহটা গঙ্গার তীরে নির্জন রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়; কণ্ঠনালীতে তখনও ক্ষতের দাগ; ইয়ার জঙ্গ মরেছে।

মুর্শিদাবাদের দুষ্ট আত্মা শিউরে ওঠে; শিউরে ওঠে মণিবেগম। একে একে তার পাশ থেকে ওরা সরে যাচ্ছে; চাকা ঘুরছে। ইতাবর গেছে—ইয়ার জঙ্গ গেলো। হেস্টিংসও কেমন মুষড়ে পড়েছে।

মিডলটন চলে যাচ্ছে, তার জায়গায় আসছে রেসিডেণ্ট হয়ে জন ডাওলি। মণিবেগমকে আবার সরে আসতে হয়েছে নিজামত থেকে; রেজা খাঁকে কোম্পানি সমস্ত পরিচালনার ভার দিয়েছে।

মহফিলের হাজারো বাতি জ্বলেছিল; গানের সুরে ভরে উঠেছিল আকাশ-বাতাস, বেজে উঠেছিল সাকীর নূপুরধ্বনি। রাতের তারায় তারায় উঠেছিল রোশনী।

রাত্রির শেষ যাম এগিয়ে আসছে। মুসায়েরায় আগত মেহমানরা বিদায় নিচ্ছে একে একে; দীপ নিভে আসছে। উৎসবশেষে ম্রিয়মাণ হয়ে উঠছে আনন্দমুখর দখলম। মণিবেগম সেই ছন্নছাড়া সর্বনাশের ইঙ্গিত দেখে আকাশ-বাতাসে। তার দিন ফুরিয়ে আসছে; বয়সও হয়েছে। আজ সেই উদ্যম উৎসাহ উন্মাদনা আর নেই; স্তিমিত প্রদীপ শিখার মত নিভু নিভু হয়ে উঠেছে সে।

বীণকারের কথা মনে পড়ে—

—জুলমৎ কদমে মেরে, সর হি আগম কা যোশ হ্যায়।
এ সমা হ্যায় দালিলে—এ সোহর—সো খামোশ হ্যায়॥

একটি প্রদীপও জ্বলছিল, তাও নিভে আসছে; সম্মুখে তার অন্তহীন রাত্রি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেগম; জোয়ার নেমে গেছে; যৌবনের অর্থ

প্রতিপত্তির জোয়ার। আজ এসেছে ভাঁটার টান; অন্তরের সব মলিন ক্লেদ আজ ফুটে উঠেছে—পড়ে আছে যৌবন নদীর দুই তীরে কার ফেলে যাওয়া কণ্ঠমালা, কার নিবেদিত কামনার পঙ্কিল স্তূপ, মরাফুল আর ঝরাপাতার ভিড়ে আকীর্ণ হয়ে উঠেছে স্থবির চেতনা।

হেস্টিংস ফিরে যাচ্ছে দেশে। ব্যর্থ হয়ে চলেছে সে। ইংরেজ তার সাম্রাজ্যবাদী হিংস্র স্বরূপের দ্বারা অর্জিত বিশাল দেশকে রাজ্যে পরিণত করেছে। ক্লাইভ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিস্থাপন করেছে—দৃঢ়তর করে তুলেছে তাকে হেস্টিংস; কিন্তু সেই সম্পত্তি অর্জন করতে হেস্টিংস যে অপবাদ কুড়িয়েছে ইংরেজ জাত সেই অপবাদকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। এ যেন আঠা বাদ দিয়ে কাঁঠাল খাওয়া, সব কলঙ্ক সব অপবাদ শুধু হেস্টিংসেরই। আর অর্জিত সম্পদ হবে সমগ্র জাতির।

মুর্শিদাবাদে আর কোনদিনই ওর পায়ের চিহ্ন পড়বে না; জীবনে বহু দিনরাত্রি বহু আশা-নিরাশার মায়াজাল বোনা মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজার হেস্টিংস পিছনে ফেলে যাচ্ছে; কত স্মৃতি রইল জড়ানো। তার রাজত্ববিস্তারের নীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে বেগম, তার সাহায্য না পেলে ক্লাইভের স্বপ্ন সত্য হোত না। কিন্তু হেস্টিংসের মত সেও সারাদেশের চোখে আজ বিলাসিনী বারবনিতা—বাংলার শত্রু! ইংরেজ তাকে এই অপবাদ কলঙ্কের পসরা মাথায় তুলে দিয়ে কার্য সিদ্ধি করেছে।

আজ ওর জন্য দুঃখ হয় হেস্টিংসের।

রাত্রি ঘনিয়ে আসছে, ওদের শেষ মিলন রাত্রি। উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে চলেছে রাজচক্র। ওরা দুজনে সেই গতিশীল জগৎ থেকে ছিটকে পড়ল; আজ সেখানে ওদের প্রয়োজন নেই। নিঃশেষ করে নিংড়ে নিয়ে তাদের ব্যর্থ পরিত্যক্তের মত দূরে ফেলে দিয়েছে।

—তোমায় আমায় সারা বাংলা—সারা পৃথিবী কোনদিনই ক্ষমার চোখে দেখবে না। তারা জানবে না ইংরেজসাম্রাজ্যবাদের নীতির কঠিন পেষণে আমরা আত্মবলি দিয়েছি। ইংরেজ জাত তাদের মাথা উঁচু রাখবার জন্যই—আমার, তোমার উপর সমস্ত অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা সাধুতার জন্য বাহবা নেবে পৃথিবীর মানুষের কাছে।

—কিন্তু কেউ কি সেই প্রকৃত কথা বলবে না সাহেব? জীবনে ভালবাসার স্বাদ পাইনি! ব্যর্থ প্রেম তোমাকে ঘিরে ফুটে উঠেছিল।

কাঁদছে বেগম, জীবনের শেষ পাওয়াটুকুকে আজ হারাবার ব্যথায় কাঁদে বেগম। বনের মাথায় নিবিড় তমসা নেমেছে। দুজন দুজনের চোখের তারায় অতীতের হারানো দিনগুলো খুঁজে ফেরে।

রাতের বাতাস হাহাকার তোলে দিক দিগন্তে। বলে ওঠে হেষ্টিংস,

—তোমার জন্য কোম্পানির কাছে শেষ আবেদন জানিয়ে গেলাম।

তার চোখে আজ দূর কুয়াশাচ্ছন্ন স্বজন বান্ধবহীন দেশের ছবি ভেসে ওঠে ; ভণ্ড ইংরেজ আজ সেখানে সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে—হেষ্টিংস লুণ্ঠনকারী ; হেষ্টিংস দস্যু—নরঘাতক। ওরা ক্লাইভকে এই অপবাদ দিয়েছিল, তাকেও দেবার প্রস্তুতি চলেছে ; কিন্তু জানে না তারা সাম্রাজ্যবিস্তার করতে গেলে কেউ ফুলের সাজ পরে এগোয় না। সাম্রাজ্যের মুনাফার লোভ ওদের না থাকলে এমনি দুমুখো নীতি অবলম্বন করত না।

সেই বন্ধুবান্ধবহীন দেশে ফিরতে হবে তাকে ; পিছনে ফেলে যাবে শ্যাম ছায়াঘন পাখিডাকা আলোমাখা দেশ, আপনকরা কোন নর্মসখীকে আর সে দেখতেও পাবে না। জীবন এত কঠিন—তা আজ অনুভব করে হেষ্টিংস।

ব্যাকুলভাবে নিজেকে প্রকাশ করে গেছে হেষ্টিংস ; আবেদন জানিয়েছে কোম্পানির কাছে—হৃতভাগিনী বেগমকে তোমরা আশ্রয় দিও। তার কথা বিবেচনা ক'রো।

She too became the victim of your policy, and of the resentments which succeeded. Something too she owed to the source of her misfortunes to the belief of the personal gratitude which she might entertain for the public attention which I have shown to her. Yet she exposed as she was to a treatment which a ruffian would have shuddered at committing and which no recollection of the past enmities shall compel me to believe ; even for a moment, proceeded from any commission of authority, she still maintained the decorum of her character ; nor even then, nor before, nor since that period, has the malice of calumny ever dared to breathe on her reputation.

.. I must in honest truth repeat, that your commands laid the first foundation of her misfortunes, to your equity she has now recourse through me for their alleviation, that she may pass

the remainder of her life in a state which may at least efface the remembrance of the years of her affection I and to your humanity she and an unseen multitude of the most helpless of her sex cry for subsistence."

হেস্টিংসের এই আবেদনে কর্ণপাত করেননি ডিরেক্টররা। ইংরেজের কাছে মণিবেগমের আজ প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সে আজ দেশের, সমাজের শত্রু। মবারক, রেজা খাঁও কোম্পানির হুকুমে বাধা দেয় নি।

দীর্ঘ জীবনের স্মৃতিজড়িত জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবার 'পেশকাশ' এসেছে মণিবেগমের উপর; প্রাসাদে আর তার স্থান নেই।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বেগম; চোখের কোলে জমেছে কালি। সুগৌর বর্ণ আজ কালিমালিপ্ত হয়ে উঠেছে; চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে; জীবন যৌবন আজ তাকে বঞ্চনা করেছে নিষ্ঠুরভাবে।

তওফাওয়ালী এইখানে ঢুকেছিল বেগম হয়ে; সিরাজের দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে আছে এর বাতাসে, মীরজাফর কুষ্ঠরোগে প্রাণত্যাগ করেছে এই প্রাসাদেই; তার সন্তান গেছে বসন্ত রোগে; মৃত্যু—অভিশাপ এখানের আকাশে-বাতাসে। সব আলো নিভে আসছে।

মণিবেগমও মরেনি কেন?

আজ তার সামনে সব পথ তমসাচ্ছন্ন। প্রবল প্রতাপ, প্রতিপত্তি, বৈভব আজ কোথায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। সান্ধ্য আঁধারে একা অন্তহীন নদীকূলে বসে আছে—পারঘাটের মাঝি নৌকা নিয়ে উধাও হয়েছে কোনদিকে।

—বেগমসাহেবা!

অশ্রুসিক্ত চোখ তুলল বেগম, প্রহরী জানায়—আজ সন্ধ্যাতেই প্রাসাদ ছেড়ে দিতে হবে, কোম্পানির হুকুম।

—হ্যাঁ! জানে বেগম। আজ এ হুকুমের নড়চড় হবে না।

শূন্য হাতে নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে বেগম; হঠাৎ সিরাজের সেই ছবির পাশেই মীরজাফরের ছবিটা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে। কাঁদছে বেগম। বোবা কান্না আজ নির্জন মর্মর প্রাসাদে গুমরে ওঠে অব্যক্ত আর্তনাদে। কাঁদছে নিষ্ফল আক্রোশে শত সহস্র আত্মা।

ইয়ার জঙ্গ, ইতাবর, মায়া, রোশন কাঁদে জাফরাগঞ্জের হর্ম্যতলে। নন্দকুমারের সদাজাগ্রত দৃষ্টি আজও ভোলেনি বেগম।

—তোমরা, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।

বিকৃত কণ্ঠে কাঁদছে বেগম; বাংলার মসনদ কক্ষে সেজের বাতিগুলো কাঁপছে থরথর করে। আকাশে কাঁদছে সানাইএ পুরিয়ার করুণ রাগিণী—যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জীভূত কান্নাঝরা এ সুর।

নির্জন মসজিদের বাইরে স্তব্ধ প্রশান্তি নেমে এসেছে, করুণ মূর্ছনায় কাঁপছে সুরটা। কামনাহীন স্নিগ্ধ আকুতি মাখানো সে সুর। বীণকার বাজিয়ে চলেছে তন্ময় হয়ে। সন্ধ্যা শেষে আগত রাত্রির প্রথম যাম, দিনের কামনা মিশে গেছে রাত্রির কান্নায়। প্রণাম হয়ে ঝরে পড়ে কোন মহাদেবতার পদতলে সেই সুরঝঙ্কার।

কান্নার শব্দে উঠল বীণকার,···এগিয়ে আসছে মূর্তিটা; আবছা আলোর শিখায় ওকে দেখে চমকে ওঠে ওয়াজিদ।

—বেগমসাহেবা!

সারা দেহে এসেছে মলিন বিষণ্ণতা; পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে ফুটে ওঠে ম্লান আভা; অশ্রু-সিক্ত দুই চোখ। এ অন্য কোন মণি—একে যেন আপন বলে মনে হয়। অতীতের সেই বিষাদময়ী মূর্তি।

—আর বেগমসাহেবা নই বীণকার; সব হারিয়ে আজ পথে নেমে এসেছি।

এ যেন বিচিত্র এক নাটক; ওর দিকে চেয়ে থাকে বীণকার।

—তোমার মসজিদের এক কোণে আমায় ঠাঁই দাও; জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া আজ পিছনে ফেলে এসেছি—তুমি আমায় পথ দেখাও।

কাঁদছে মণি; জীবনের পরম সত্য আজ ফুটে উঠেছে তার সামনে।

অশ্রু সজল কণ্ঠে বলে চলেছে মণি—বহু পাপ আমার, এক জীবনের চোখের জলে মুছে যাবে না।

ওর কান্নায় বাধা দেয় না দরবেশ; ও কাঁদুক; হাসি-কান্না ঘেরা জগৎ, আলোর পিছনেই থাকে অতলান্ত অন্ধকার।

বীণকার মূর্ছনা তোলে বীণে—বিনিদ্র রাতের জাগর প্রহরে কাঁদে মণি। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী ওই ওয়াজিদ। চোখের সামনে দেখেছে কত উত্থান পতন; রক্তক্ষয়ী সংঘাত।

কিন্তু সব নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে কালের কষ্টিপাথরের বুক থেকে। সুরটা ঊর্ধ্বাকাশে উঠে চলেছে ম্লান জ্যোতির্ময় একটি শিখার মত।

মবারকও বেগমকে বাধা দেয় নি। সমস্ত ধনসম্পদ পরিত্যাগ করে বেগম সামান্যা নারীর মত দিন যাপন করছে; রেজা খাঁ আজ শাসনব্যবস্থা তুলে নিয়েছে, বাংলার ইতিহাসে ঝড় এসেছে থেমে।

বাংলার সংঘাত থামছে; নবাবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পায় রেজা খাঁ, নবাবের দিন ফুরিয়ে আসছে। ইংরেজের হাত সব কিছু গ্রাস করে নেবে।

হেষ্টিংসের অত্যাচার বাংলা ভোলে নি। শিউরে ওঠে রংপুর, দিনাজপুরের হাজার হাজার মানুষ রাতের অন্ধকারে; সেই নৃশংস অত্যাচারের কথা তারা ভোলে নি। ভোলেনি বেগম—তার জীবন যৌবন ব্যর্থ হয়ে গেছে ওই বিদেশার রূপাগ্নিতে! বাংলার শত্রু, দেশের শত্রু—মানুষের শত্রু সেই ইংরেজ।

সাগর পার থেকে ভেসে আসে আকাশে-বাতাসে কার তেজদৃপ্ত কণ্ঠস্বর; জনসমাকীর্ণ ওয়েস্ট মিনিস্টার হলে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস; বার্কের কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে—

"I impeach him in the name of the Commons' House of Parliament, whose trust he has betrayed. I impeach him in the name of the English nation, whose ancient honour he has sullied. I impeach him in the name of the people of India, whose rights he has trodden under foot, and whose country he has turned into a desert. Lastly, in the name of human nature itself, in the name of both the sexes, in the name of every age, in the name of every rank, I impeach the common enemy and oppressor of all."

সন্ধ্যা নেমে আসছে মুর্শিদাবাদের আকাশে; শিউরে উঠেছে কোম্পানির কর্মচারী; বিচারের দিন এসেছে আজ। রেজা খাঁ রক্তরাগরঞ্জিত আকাশ-সীমার দিকে চেয়ে আছে; গঙ্গার স্রোতে বয়ে চলেছে নিরুদ্দেশের পথে উধাও পাল তোলা নৌকা।

মহারাজের মৃত্যু ব্যর্থ হয় নি। সত্য আজ দিনের আলোয় প্রকাশ পেয়েছে। মহারাজের আত্মা শান্তি লাভ করুক। দুনিয়ার দিনকারের বিচারে কোথাও ফাঁকি নেই; মীরজাফর—মীরণ—মীরকাশিমের আত্মা আজ জেগে উঠেছে; জেগে উঠেছে হাজারো অপরিচিত মৃতের দল—চেয়ে রয়েছে দূর পশ্চিমের দিকে।

—হে বিচারক; ওর মুখোশ খুলে দাও, বিচার কর। সত্যের জয় হোক।

প্রজাপতি ফিরে গেছে ফুলের দেশে, ভ্রমরের গুঞ্জন থেমেছে মতিঝিলের পদ্মবনে, জীর্ণ মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসে মুয়েজ্জিনের কণ্ঠস্বর। শেষ কেয়ামতের ডাক এসেছে, মণি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। হেস্টিংসের বিচার শুরু হয়েছে। কিন্তু তার?

তার অপরাধের শেষ নেই, মীরজাফরের বুক ভেঙ্গে দিয়েছে, মহারাজ নন্দকুমারকে ওদের হাতে তুলে দিয়েছিল সে। অথচ ওই ব্রাহ্মণই চরম বিপদের দিনে তাকে সাহায্য করেছিল, সত্য ধর্মকে সে নিঃশেষে হত্যা করেছে। রোশন! মোহব্বতের জ্বলন্ত পূত পবিত্র শিখা—তাকে অন্ধকার কারাগারে নির্মম ভাবে খুন করেছে মণিবেগম।

সত্য প্রেম ধর্মকে সে চরম লাঞ্ছিত করেছে, তবু আজও বেঁচে আছে সে! কই, মীরজাফরের মত দুহাত তার কুষ্ঠ ব্যাধিতে বিষাক্ত এখনও হয় নি। তবে কি এখনও তার শাস্তি বাকি আছে? অনুতাপের আগুনে জ্বলছে তার সারা মন।

গুরুদাস আজও ভোলেনি, জাগর জীবনে সে প্রহরীর মত চেয়ে আছে। সন্ধ্যার ম্লান প্রকম্প দীপশিখার সামনে আজও অম্লান হয়ে আছে পিতার আরাধ্য সেই বিষ্ণুমূর্তি। মধুর হাসি আজ মধুরতর হয়ে উঠেছে, মনে পড়ে তার উদাত্ত কণ্ঠের প্রণাম মন্ত্র।

—ত্বমাদি দেবঃ পুরুষ পুরাণ—
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

—হে অনন্তরূপী মহাদেবতা—তুমি বিশ্বের পরম পুরুষ।

কালবিধৃত পৃথিবীর কক্ষপথে হেস্টিংস, মণিবেগমও মানুষের স্মৃতিপটে আঁকা থাকবে। মহারাজ নন্দকুমার সেই স্মরণাকাশের একটি পবিত্র জ্যোতির্ময় জ্যোতিষ্ক, বাংলার দুঃখ তমসাচ্ছন্ন মানসে সত্যের স্নিগ্ধালোকে চিরভাস্বর।

মণিবেগম আজও কাঁদে! জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের উত্তর কোণের জীর্ণ সমাধি স্তূপ থেকে আজও সন্ধ্যায় মুয়েজ্জিনের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয় মাটির অতল থেকে সেই ব্যর্থ কান্নার সুর।

বীণকার ওয়াজিদ লাখো অপরিচিতের ভিড়ে কোথায় নিঃশেষে হারিয়ে গেছে।

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্তৃক মুদ্রিত।